কার্ল মার্কস
ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড

১০

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

সম্পাদনা: প্রফুল্ল রায়

К. Маркс и Ф. Энгельс
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ
Том 10
На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

М $\frac{10101-620}{014(01)-82}$ 545-82

0101010000

সূচি

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র (১)

১৮৯২ সালের ইংরেজি সংস্করণের বিশেষ ভূমিকা

বর্তমানের এই ছোট পুস্তিকাটি মূলত একটি বৃহত্তর রচনার অংশ। ১৮৭৫ সালের কাছাকাছি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত, কিন্তু অবৈতনিক অধ্যাপক (privatdocent) হয়ে. ড্যুরিং সহসা এবং খানিকটা সরবে সমাজতন্ত্রে তাঁর দীক্ষাগ্রহণের কথা ঘোষণা করেন ও জার্মান জনসাধারণের হাতে একটা বিস্তারিত সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বই শুধু নয়, সমাজ পুনর্গঠনের গোটা একটা ব্যবহারিক ছকও হাজির করেন। বলাই বাহুল্য, উনি তাঁর পূর্ববর্তীদের সঙ্গে কলহ করেছেন; সর্বোপরি তাঁর পুরো ঝাল ঝেড়ে সম্মানিত করেছেন মার্কসকে।

ঘটনাটা ঘটে প্রায় সেই সময় যখন জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টির দুটি অংশ, আইজেনাখপন্থী ও লাসালপন্থীরা (২) সবে মিলিত হয়েছে এবং তাতে করে পার্টি প্রভূত শক্তি বৃদ্ধি করেছে তাই নয়, অধিকন্তু এই সমগ্র শক্তিটা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে নিয়োগের ক্ষমতাও অর্জন করেছে। জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টি দ্রুত একটা শক্তি হয়ে উঠছিল। কিন্তু শক্তি হয়ে ওঠার প্রথম শর্তই ছিল, এই নবার্জিত ঐক্যকে বিপন্ন করা চলবে না। ডঃ ড্যুরিং কিন্তু প্রকাশ্যেই তাঁর চারিপাশে একটি জোট পাকাতে শুরু করেন, একটি ভবিষ্যৎ পৃথক পার্টির তা বীজ। সুতরাং প্রয়োজন হয় দ্বন্দ্বাহবান গ্রহণ করে লড়ে যাওয়া, চাই বা না চাই।

কাজটা অতি দুষ্কর না হলেও স্পষ্টতই এক দীর্ঘ ঝামেলার ব্যাপার। একথা সুবিদিত যে, আমরা জার্মানরা হলাম সাংঘাতিক রকমের গুরুভার Gründlichkeit-এর ভক্ত—তাকে র‍্যাডিকেল প্রগাঢ়ত্ব অথবা প্রগাঢ় র‍্যাডিকেলত্ব যা খুশি বলুন। আমাদের কেউ যখন তাঁর বিবেচনানুসারে যা

নতুন মনে হচ্ছে এমন একটি মতবাদ বিবৃত করতে চান, তখন সর্বাগ্রে সেটিকে একটি সর্বাঙ্গীণ তন্ত্রে পরিপ্রসারিত করতে হবে তাঁকে। তাঁর প্রমাণ করে দিতে হবে যে, ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম সূত্রটি থেকে বিশ্বের মৌলিক নিয়মগুলি সবই আর কিছুই না, অনাদি কাল থেকে শুধু এই নবাবিষ্কৃত পরমোৎকৃষ্ট তত্ত্বটিতে পৌঁছনোর জন্যই বিদ্যমান। এবং এদিক থেকে ডঃ ড্যুরিং রীতিমতো জাতীয় মানোত্তীর্ণ। একছিটে কম নয়, একেবারে সুসম্পূর্ণ একটা 'দর্শনতন্ত্র'—মনোজাগতিক, নৈতিক, প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক দর্শন; সুসম্পূর্ণ একটা 'অর্থশাস্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থা'; এবং পরিশেষে 'অর্থশাস্ত্রের বিচারমূলক ইতিহাস'—অক্টাভো সাইজের তিনটি মোটা মোটা খণ্ড, ওজন ও বিষয়বস্তুর গুরুভার, সাধারণভাবে পূর্বতন সমস্ত দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে মার্কসের বিরুদ্ধে তিন অক্ষৌহিণী যুক্তি, মোটকথা একটা পরিপূর্ণ 'বিজ্ঞান বিপ্লবের' প্রচেষ্টা, এরই মোকাবিলা আমাকে করতে হত। আলোচনা করতে হত সম্ভাব্য সবকিছু প্রসঙ্গে: স্থান কালের ধারণা থেকে দ্বিধাতুমান (৩) পর্যন্ত; বস্তু ও গতির চিরন্তনতা থেকে শুরু করে নৈতিক ভাবনার মরণশীল প্রকৃতি; ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে ভবিষ্যৎ সমাজে তরুণদের শিক্ষা—সব। যাই হোক, আমার প্রতিপক্ষের প্রণালীবদ্ধ সর্বাঙ্গীণতার ফলে এই অতি বিভিন্ন সব প্রসঙ্গে মার্কস ও আমার যা মতামত সেগুলিকে ড্যুরিং-এর বিপরীতে, এবং এযাবৎ যা করা হয়েছে তার চেয়ে আরো সুসংবদ্ধ আকারে একটা সুযোগ পাওয়া গেল। অন্যথায় অকৃতার্থ এ কর্তব্যগ্রহণে সেই ছিল আমার প্রধান কারণ।

আমার জবাব প্রথমে প্রকাশিত হয় সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রধান মুখপত্র লাইপজিগ *Vorwärts* (৪) পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ হিশেবে এবং পরে 'Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft' ('শ্রী ইয়ে. ড্যুরিং-এর বিজ্ঞান বিপ্লব') নামক পুস্তকাকারে, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় জুরিখে ১৮৮৬ সালে।

সুহৃদ্বর এবং অধুনা ফরাসী প্রতিনিধি-সভায় লিল্ প্রতিনিধি পল লাফার্গের অনুরোধে এ বইয়ের তিনটি পরিচ্ছেদ একটি পুস্তিকাকারে সাজিয়ে দিই। তিনি তা অনুবাদ করে ১৮৮০ সালে 'Socialisme utopique et

Socialisme scientifique' ('ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র') নামে প্রকাশ করেন। এই ফরাসী পাঠের উপর ভিত্তি করে একটি পোলীয় ও একটি স্পেনীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ সালে আমাদের জার্মান বন্ধুরা পুস্তিকাটিকে মূল ভাষায় প্রকাশ করেন। পরে এই জার্মান পাঠ থেকে ইতালীয়, রুশ, ডেনিশ, ওলন্দাজ, রুমানীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাই বর্তমান ইংরেজি সংস্করণটি ধরলে পুস্তিকাটি দশটি ভাষায় প্রচারিত। আর কোনো সমাজতান্ত্রিক পুস্তক, এমনকি আমাদের ১৮৪৮ সালের 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' বা মার্কসের 'পুঁজি' বইটিও এত ঘনঘন অনুবাদ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। জার্মানিতে এ বইটির চারটি সংস্করণের উত্তীর্ণ হয়েছে, সর্বসমেত ২০,০০০ কপি।

'মার্ক' (৫), এই সংযোজনী লেখা হয়েছিল জার্মানিতে ভূমিসম্পত্তির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞান জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। এটা তখন আরো বেশি প্রয়োজনীয় কারণ সে পার্টিতে শহুরে মজুরদের অঙ্গীভবন তখন বেশ সম্পূর্ণতার দিকে, পালা এসেছে ক্ষেতমজুর ও চাষীদের। অনুবাদে এ সংযোজনী রেখে দেওয়া হয়েছে, কেননা সমস্ত টিউটোনিক জাতির পক্ষে যা একই সেই ভূমি-ব্যবস্থার আদি ধরনটা এবং তার অবক্ষয়ের ইতিহাস জার্মানির চেয়েও ইংলন্ডে কম সুবিদিত। লেখাটি মূলে যা ছিল তাই রেখে দিয়েছি, মাক্সিম কভালেভ্স্কি সম্প্রতি যে প্রকল্প দিয়েছেন তার কথা উল্লেখ করা হয় নি; এই প্রকল্প অনুসারে মার্ক-এর সভ্যদের মধ্যে আবাদী ও চারণভূমির ভাগাভাগি হয়ে যাবার আগে এগুলির চাষ হত যৌথ হিশেবে বেশ কয়েক পুরুষের এক একটি বৃহৎ পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক গোষ্ঠী দ্বারা (অদ্যাবধি বর্তমান দক্ষিণ স্লাভোনীয় জাদ্রুগা তার দৃষ্টান্ত), ভাগাভাগি হয় পরে, যখন গোষ্ঠী বৃদ্ধি পেয়ে যৌথ হিশেবে পরিচালনার পক্ষে বড়ো বেশি বৃহৎ হয়ে দাঁড়ায়। কভালেভ্স্কির বক্তব্য হয়ত ঠিকই, কিন্তু বিষয়টা এখনো sub judice*।

* Sub judice — বিচারসাপেক্ষ। — সম্পাঃ

এ বইয়ে ব্যবহৃত অর্থনৈতিক পরিভাষার মধ্যে যেগুলি নতুন সেগুলি মার্কসের 'পুঁজি' বইটির ইংরেজি সংস্করণ অনুযায়ী। সেই অর্থনৈতিক পর্যায়কে আমরা 'পণ্যোৎপাদন' বলছি যেখানে সামগ্রী উৎপাদন করা হচ্ছে কেবল উৎপাদকের ভোগের জন্য শুধু নয়, বিনিময়ের জন্যও; অর্থাৎ ব্যবহার-মূল্য হিশেবে নয়, **পণ্য হিশেবে**। বিনিময়ের জন্য উৎপাদনের প্রথম সূত্রপাত থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত এই পর্যায়টা প্রসারিত; তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে কেবলমাত্র পুঁজিবাদী উৎপাদনেই, অর্থাৎ সেই অবস্থায়, যখন উৎপাদন-উপায়ের মালিক পুঁজিপতি মজুরি দিয়ে নিয়োগ করে শ্রমিকদের, শ্রমশক্তি ছাড়া যারা উৎপাদনের সর্ববিধ উপায় থেকে বঞ্চিত তাদের, এবং সামগ্রীর বিক্রয়-মূল্য থেকে তার উৎপাদনী ব্যয়ের ওপর যেটা উদ্বৃত্ত হয় সেটি পকেটস্থ করে। মধ্য যুগ থেকে শুরু করে শিল্পোৎপাদনের ইতিহাসকে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করি: ১) হস্তশিল্প, ক্ষুদে ক্ষুদে ওস্তাদ কারুশিল্পী ও জনকয়েক ঠিকা মজুর ও সাকরেদ, প্রত্যেক শ্রমিক সেখানে পুরো সামগ্রীটাই তৈরি করে; ২) হস্তশিল্প কারখানা (manufacture), যেখানে অধিকতর সংখ্যক শ্রমিক একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে একত্র হয়ে সম্পূর্ণ সামগ্রীটা উৎপাদন করে শ্রমবিভাগ নীতিতে, প্রত্যেক শ্রমিক করে শুধু এক একটা আংশিক কাজ যাতে সামগ্রীটা সম্পূর্ণ হয় শুধু পর পর সবার হাত ফেরতা হয়ে যাবার পর; ৩) আধুনিক যন্ত্রশিল্প, যেখানে মাল তৈরি হয় শক্তি-চালিত যন্ত্র দ্বারা আর শ্রমিকের কাজ শুধু যন্ত্রের ক্রিয়ার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ।

আমি বেশ জানি যে, এ বইয়ের বিষয়বস্তুতে ব্রিটিশ পাঠক সাধারণের একটা বড়ো অংশের আপত্তি হবে। কিন্তু আমরা, মূল ইউরোপ ভূখণ্ডের অধিবাসীরা যদি ব্রিটিশ 'শালীনতা' রূপ কুসংস্কারের বিন্দুমাত্র ধারও ধারতাম, তাহলে আমাদের অবস্থা যা আছে তা আরো শোচনীয় হত। আমরা যাকে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' বলি, এ বইয়ে তাকেই সমর্থন করা হয়েছে আর 'বস্তুবাদ' শব্দটাই ব্রিটিশ পাঠকদের বিপুল অধিকাংশের কানে বড়ো বেঁধে। 'অজ্ঞেয়বাদ' (৬) তবু সহনীয়, কিন্তু বস্তুবাদ একেবারেই অমার্জনীয়।

অথচ সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে আধুনিক সমস্ত বস্তুবাদেরই আদি ভূমি হল ইংলণ্ড।

'বস্তুবাদ গ্রেট ব্রিটেনের আত্মজ সন্তান। ব্রিটিশ স্কলাস্টিক (৭) দুন্‌স স্কোট তো আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন: বস্তুর পক্ষে ভাবনা কি অসম্ভব?

'এই অঘটন-ঘটনের জন্য তিনি আশ্রয় নেন ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তায় অর্থাৎ তিনি ধর্মতত্ত্বকে (৮) লাগান বস্তুবাদের প্রচারে। তদুপরি তিনি ছিলেন নামবাদী (৯)। নামবাদ, বস্তুবাদের প্রাথমিক এই রূপ প্রধানত দেখা যায় ইংরেজ বস্তুবাদীদের মধ্যে।

'ইংরেজি বস্তুবাদের আসল জনক হলেন বেকন। তাঁর কাছে প্রকৃতিবিজ্ঞানই হল একমাত্র সত্য দর্শন এবং ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করা পদার্থবিদ্যা হল প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রধান ভাগ। আনাক্সেইগরস এবং তাঁর homoioméreia (১০), ডিমোক্রিটস এবং তাঁর পরমাণুর কথা তিনি প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন তাঁর প্রামাণ্য হিশেবে। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয় অভ্রান্ত ও সর্বজ্ঞানের উৎস। সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়-দত্ত তথ্যকে যুক্তিসম্মত প্রণালীতে বিচার করাই হল বিজ্ঞানের কাজ। অনুমান, বিশ্লেষণ, তুলনা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা হল এই ধরনের যুক্তিসম্মত প্রণালীর প্রধান অঙ্গ। বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হল গতি, যান্ত্রিক ও গাণিতিক গতিই শুধু নয়, প্রধানত একটা আবেগ (impulse), একটা সজীব প্রেরণা, একটা টান, অথবা ইয়াকব বোমে-র কথা অনুসারে—বস্তুর একটা বেদনা (Qual*)।

'বস্তুবাদের প্রথম স্রষ্টা বেকনের মধ্যে একটা সর্বাঙ্গীণ বিকাশের বীজ তখনো অন্তর্নিহিত। একদিকে ইন্দ্রিয়গত কাব্যময় ঝলকে পরিবৃত বস্তু যেন মানবের সমগ্র সত্তাকে আকৃষ্ট করছে মোহিনী হাসি হেসে। অন্যদিকে সূত্রোক্তি রূপে নিবদ্ধ মতবাদ ধর্মতত্ত্ব থেকে আমদানি করা অসঙ্গতিতে পল্লবিত।

---

* Qual — দার্শনিক কথার খেলা। Qual কথার আক্ষরিক অর্থ যন্ত্রণা, একটা বেদনা যা কোনো ধরনের কর্মে ঠেলে দেয়। এই জার্মান শব্দটির মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদী বোমে ল্যাটিন qualitas-এর (গুণ) কিছুটা অর্থও আরোপ করেছেন। বাইরে থেকে দেওয়া যন্ত্রণার বিপরীতে তাঁর Qual হল বেদনার্ত বস্তু, সম্পর্ক বা ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ থেকে উদ্ভূত ও সঙ্গে সঙ্গে সেই বিকাশকে অগ্রসর করার মতো এক সক্রিয় কারিকা। (ইংরেজি সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।) — সম্পাঃ

'পরবর্তী বিকাশে বস্তুবাদ হয়ে ওঠে একপেশে। বেকনীয় বস্তুবাদকে যিনি গুছিয়ে তোলেন তিনি হব্‌স। ইন্দ্রিয়ভিত্তিক জ্ঞান তার কাব্য-মায়া হারিয়ে গাণিতিকের বিমূর্ত অভিজ্ঞতার করায়ত্ত হল; বিজ্ঞানের রাণী বলে ঘোষণা করা হল জ্যামিতিকে। বস্তুবাদ আশ্রয় নিল মানবদ্বেষে। প্রতিদ্বন্দ্বী মানবদ্বেষী দেহহীন অধ্যাত্মবাদকে যদি তারই স্বভূমিতে পরাস্ত করতে হয়, তাহলে বস্তুবাদকেও তার দেহ দমন করে যোগী হতে হয়। এইভাবে ইন্দ্রিয়গত সত্তা থেকে তা পরিণত হল বুদ্ধিগত সত্তায়; কিন্তু এ ভাবেও, বুদ্ধির যা বৈশিষ্ট্য সেই অনুসারে, ফলাফলের তোয়াক্কা না করে সবকটি সঙ্গতিকেই তা বিকশিত করে তোলে।

'বেকনের অনুবর্তক হব্‌স এই যুক্তি দেন: সমস্ত মানবিক জ্ঞান যদি পাই ইন্দ্রিয় থেকে তাহলে আমাদের ধ্যান-ধারণা ও ভাবনাগুলি বাস্তব জগতের ইন্দ্রিয়গত রূপ বর্জিত ছায়ামূর্তি ছাড়া কিছু নয়। দর্শন শুধু এই ছায়ামূর্তিদের নামকরণ করতে পারে। একই নাম প্রযুক্ত হতে পারে একাধিক ছায়ামূর্তিতে। এমনকি নামেরও নাম থাকতে পারে। স্ববিরোধ হবে যদি আমরা একদিকে বলি যে, সমস্ত ধারণার উদ্ভব ইন্দ্রিয়ের জগৎ থেকে এবং অন্যদিকে বলি, সেকথাটার অতিরিক্ত কিছু, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত যে সত্তাগুলি সকলেই এক একটি একক, সেগুলি ছাড়াও একক নয়, সাধারণ চরিত্রের সত্তা বর্তমান। দেহহীন বস্তুর মতোই দেহহীন সত্তাও আজগুবি। দেহ, বস্তু, সত্তা হল একই বাস্তবের বিভিন্ন নাম। **চিন্তাশীল বস্তু থেকে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব।** জগতে যে পরিবর্তন চলেছে তা সবের অধঃস্তর হল এই বস্তু। অসীম কথাটা অর্থহীন যদি না বলা হয় যে, অবিরাম যোগ দিয়ে যাবার ক্ষমতা আমাদের মনঃশক্তির আছে। কেবল বস্তুময় জগৎই আমাদের অনুভবগম্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানা আমাদের সম্ভব নয়। একমাত্র আমার নিজস্ব অস্তিত্বই নিশ্চিত। মানবিক প্রতিটি আবেগই হল একটা যান্ত্রিক গতি যার একটা শুরু ও একটা শেষ আছে। যাকে আমরা কল্যাণ বলি তা হল চিত্তাবেগের (impulse) লক্ষ্য। প্রকৃতির মতো মানুষও একই নিয়মের অধীন। ক্ষমতা ও মুক্তি একই কথা।

'হব্‌স বেকনকে গুছিয়ে তুলেছেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের জগৎ থেকে সমস্ত

মানবিক জ্ঞানের উদ্ভব, বেকনের এই মূলনীতির কোনো প্রমাণ দাখিল করেন নি। সে প্রমাণ দেন লক্ তাঁর 'মানবিক বোধ বিষয়ে নিবন্ধ'-এ।

'বেকনীয় বস্তুবাদের আস্তিক্যবাদী (১১) কুসংস্কার চূর্ণ করেছিলেন হব্‌স। লকের ইন্দ্রিয়বাদের (১২) মধ্যে যে ধর্মতত্ত্বের ঝোঁক তখনো থেকে গিয়েছিল তাকে একইভাবে চূর্ণ করেন কলিন্স, ডডওয়েল, কাউয়ার্ড, হার্টলি, প্রিস্ট্‌লি, ইত্যাদি। অন্তত ব্যবহারিক বস্তুবাদীদের পক্ষে ধর্ম থেকে অব্যাহতি পাবার সহজ পদ্ধতি হল ডীইজম (১৩)।'*

আধুনিক বস্তুবাদের ব্রিটিশ উৎস বিষয়ে এই হল মার্কসের লেখা। ইংরেজদের পূর্বপুরুষদের মার্কস যে প্রশংসা করেছিলেন সেটা যদি আজকাল তাদের তেমন রুচিকর না লাগে তবে আক্ষেপেরই কথা। কিন্তু অস্বীকার করার জো নেই যে, বেকন, হব্‌স ও লক্‌ই হলেন ফরাসী বস্তুবাদীদের সেই চমৎকার ধারাটির জনক যা, ফরাসীদের ওপর ইংরেজ ও জার্মানরা স্থল ও নৌযুদ্ধে যত জয়লাভই করুক না কেন, অষ্টাদশ শতাব্দীকে পরিণত করেছে প্রধানত এক ফরাসী শতাব্দীতে এবং সেটা পরিণামের সেই ফরাসী বিপ্লবেরও আগে যার ফলশ্রুতিতে ইংলণ্ড ও জার্মানির আমরা, বাইরের লোকেরা, এখনো অভ্যস্ত হবার জন্য চেষ্টিত।

একথা অনস্বীকার্য। এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিদগ্ধ যে বিদেশীরা ইংলণ্ডে এসে বাসা পাততেন, তাঁদের প্রত্যেককেই যে জিনিসটা অবাক করেছে সেটাকে তাঁরা 'ভদ্র' ইংরেজ মধ্য শ্রেণীর ধর্মীয় গোঁড়ামি ও নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য করতে তখন বাধ্য হতেন। আমরা সেসময় সকলেই ছিলাম হয় বস্তুবাদী নয় অন্ততপক্ষে অতি অগ্রণী স্বাধীন-চিন্তক, এবং ইংলণ্ডের প্রায় সমস্ত শিক্ষিত লোকেই যে যতোরকম অসম্ভাব্য অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করবেন, বাকল্যান্ড ও মানটেলের মতো ভূতাত্ত্বিকরাও তাঁদের বিজ্ঞানের

---

* Marx und Engels, 'Die heilige Familie', Frankfurt a. M., 1845, S. 201-204. (এঙ্গেলসের টীকা।)

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই বইটির পুরো নাম: 'Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und Konsorten' ('পবিত্র পরিবার বা বিচারমূলক সমালোচনার সমালোচনা। ব্রুনো বাউয়ের কোম্পানির বিরুদ্ধে')। — সম্পাঃ

তথ্যকে বিকৃত করে বাইবেলের বিশ্বসৃষ্টির অতিকথার সঙ্গে খুব বেশি সংঘর্ষের মধ্যে যেতে চাইবেন না, তা আমাদের কাছে অকল্পনীয় লেগেছিল। অন্যপক্ষে, ধর্মীয় প্রসঙ্গে যাঁরা স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগে সাহসী এমন লোকের সন্ধান পেতে হলে যেতে হত অবিদ্বানদের মধ্যে, তখন যাদের বলা হত 'মহা অধৌত' সেই তাদের মধ্যে, শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ করে ওয়েনপন্থী সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে।

কিন্তু অতঃপর ইংলন্ড 'সুসভ্য' হয়েছে। ১৮৫১ সালের প্রদর্শনী (১৪) থেকে দ্বীপবদ্ধ ইংরেজি বিচ্ছিন্নতার অন্ত্যেষ্টি ঘণ্টা বাজে। ধীরে ধীরে ইংলন্ডের আন্তর্জাতীয়করণ হয়েছে খাদ্যে, আচার-আচরণে, ভাবনায়; এতটা পরিমাণে হয়েছে যে ইচ্ছে হয় ইউরোপ ভূখন্ডের অন্যান্য অভ্যাস এখানে যেমন চালু হয়েছে তেমনি কিছু ইংরেজি আচার-ব্যবহারও ইউরোপ ভূখন্ডে সমান চালু হোক। যাই হোক, স্যালাড-তেলের প্রবর্তন ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে (১৮৫১ সালের আগে তা কেবল অভিজাতদের কাছেই সুবিদিত ছিল) ধর্ম বিষয়ে ইউরোপীয় ভূখন্ডসুলভ সংশয়বাদেরও একটা মারাত্মক প্রসার ঘটেছে; এবং তা এতদূর গড়িয়েছে যে, ইংলন্ডের রাষ্ট্রীয় চার্চের (১৫) মতো ঠিক অতোটা 'আসল জিনিস' বলে এখনো গণ্য না হলেও অজ্ঞেয়বাদ শালীনতার দিক থেকে প্রায় ব্যাপটিস্ট (১৬) মতবাদের সমতুল্য এবং নিশ্চিতই 'স্যালভেশন আর্মির' (১৭) চেয়ে উচ্চে। না ভেবে পারি না যে, এই অবস্থায় নাস্তিকতার এ প্রসারে যাঁরা আন্তরিকভাবেই ক্ষুব্ধ ও তার নিন্দক, তাঁরা এই জেনে সান্ত্বনা পেতে পারেন যে, এই সব 'হালফিল চালু ধারণাগুলো' বিদেশ থেকে আমদানি নয়, দৈনন্দিন ব্যবহারের বহু সামগ্রীর মতো 'মেড-ইন-জার্মানি' নয়, বরং নিঃসন্দেহেই তা সাবেকী বিলাতী, এবং উত্তরপুরুষেরা এখন যতটা সাহস করে না দু'শ' বছর আগে তার চেয়েও অনেক দূর এগিয়েছিলেন তাঁদের ব্রিটিশ আদিপুরুষেরা।

বস্তুতপক্ষে, ল্যাঙ্কাশায়ারের একটা কথা ব্যবহার করলে অজ্ঞেয়বাদ 'সসঙ্কোচ' বস্তুবাদ ছাড়া আর কী? প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞেয়বাদীর ধারণা আগাগোড়া বস্তুবাদী। সমগ্র প্রাকৃতিক জগৎ নিয়মে শাসিত, বাইরে থেকে তার ক্রিয়ায় কোনো হস্তক্ষেপের কথা একেবারে ওঠে না। কিন্তু, অজ্ঞেয়বাদী যোগ করে, জ্ঞাত বিশ্বের অতিরিক্ত কোনো পরম সত্তার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন অথবা

খণ্ডনের কোনো উপায় আমাদের নেই। এ কথা হয়ত বা খাটত সেকালে যখন সেই মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানীর 'Mécanique céleste'* গ্রন্থে স্রষ্টার উল্লেখ নেই কেন, নেপোলিয়নের এই প্রশ্নে লাপ্লাস সগর্বে জবাব দেন: 'Je n'avais pas besoin de cette hypothèse'**। কিন্তু বর্তমানে, বিশ্বের বিবর্তনী ধারণায় স্রষ্টা বা নিয়ন্তার কোনো স্থানই নেই; বিদ্যমান সমগ্র বিশ্ব থেকে বহির্ভূত এক পরম সত্তার কথা বলা স্ববিরোধসূচক, এবং আমার মনে হয়, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রতি একটা অকারণ অপমান।

অপিচ, আমাদের অজ্ঞেয়বাদী মানেন যে, জ্ঞানের ভিত্তি হল ইন্দ্রিয়-দত্ত সংবাদ। কিন্তু তিনি যোগ করেন, ইন্দ্রিয়ের মারফত যে বস্তুর বোধ হচ্ছে তার সঠিক প্রতিচ্ছবিই যে ইন্দ্রিয় আমাদের দিয়েছে তা জানলাম কী করে? অতঃপর তিনি আমাদের জানিয়ে দেন, বস্তু বা তার গুণের কথা তিনি যখন বলেন তখন তিনি আসলে এসব বস্তু বা গুণের কথা বলছেন না, নিশ্চিত করে তার কিছু জানা সম্ভব নয়, স্বীয় ইন্দ্রিয়ের ওপর তারা যে ছাপ ফেলেছে শুধু তারই কথা বলছেন। এধরনের কথাকে কেবল যুক্তি বিস্তার করে হারানো বোধ হয় সত্যিই শক্ত। কিন্তু যুক্তি বিস্তারের আগে হল ক্রিয়া। 'In Anfang war dieThat'.*** এবং মানবিক অতিবুদ্ধি এ সমস্যা আবিষ্কার করার আগেই মানবিক কর্মে তার সমাধান হয়ে গেছে। পুডিং-এর যাচাই তার ভক্ষণে। এই সব বস্তুর অনুভূত গুণাগুণ অনুসারে বস্তুটা আমাদের নিজেদের কাজে লাগালেই আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলির সঠিকতা বা বেঠিকতার একটা নির্ভুল যাচাই হয়ে যায়। আমাদের এই অনুভূতিগুলি যদি ভুল হত, তাহলে সে বস্তুর ব্যবহারোপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের হিসাবও ভুল হতে বাধ্য এবং সব চেষ্টা বিফল হত। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধ করতে যদি আমরা সক্ষম হই, যদি দেখা যায় যে, বস্তুটা সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তার সঙ্গে সে বস্তু মিলছে, তাকে যে উদ্দেশ্যে লাগাতে

* P. S. Laplace, 'Traité de mécanique céleste', Vol. I-V. Paris, 1799-1825. — সম্পাঃ

** 'এ প্রকল্পের কোনো আবশ্যক আমার ছিল না।' — সম্পাঃ

*** 'আদিতে ছিল কর্ম।' — গ্যেটের 'ফাউস্ট' থেকে। — সম্পাঃ

চাইছি তা হাসিল হচ্ছে, তাহলেই পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে যায় যে, সে বস্তু এবং তার গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি **ততটা পর্যন্ত** মিলে যাচ্ছে আমাদের বহিঃস্থিত বাস্তবের সঙ্গে। যদি বা বিফলতার সম্মুখীন হই, তাহলে সে বিফলতার কারণ বার করতে সাধারণত দেরি হয় না; দেখা যায়, যে অনুভূতির ভিত্তিতে আমরা কাজ করেছি সেটা হয় অসম্পূর্ণ ও ভাসাভাসা, নয় অন্যান্য অনুভূতির ফলাফলের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত যা আবশ্যক নয়—একে আমরা বলি যুক্তির ত্রুটি। ইন্দ্রিয়গুলিকে ঠিকমতো পরিশীলিত ও ব্যবহৃত করতে, এবং সঠিকভাবে গৃহীত ও সঠিকভাবে ব্যবহৃত অনুভূতি দ্বারা নির্দিষ্ট আওতার মধ্যে কর্মকে সীমাবদ্ধ রাখতে যতক্ষণ আমরা সচেষ্ট, ততক্ষণ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, আমাদের কর্মের ফলাফল থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে অনুভূত বস্তুর বিষয়গত প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের অনুভূতির মিল রয়েছে। এযাবৎ একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় নি যাতে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, বৈজ্ঞানিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি দ্বারা আমাদের মনে বহির্জগৎ সম্পর্কে যে ধারণা উপজিত হচ্ছে তা তৎপ্রকৃতিগতভাবেই বাস্তব থেকে বিভিন্ন, কিংবা বহির্জগৎ ও সে বিষয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত গরমিল বর্তমান।

কিন্তু তখন আসেন নয়া-কাণ্টপন্থী অজ্ঞেয়বাদীরা এবং বলেন: হাঁ, একটা বস্তুর গুণাগুণ বোধ আমাদের সঠিক হতে পারে কিন্তু কোনো ইন্দ্রিয়গত বা মনোগত প্রকরণেই প্রকৃত-বস্তুটাকে (thing-in-itself) আমরা ধরতে পারি না। এই 'প্রকৃত-বস্তু' আমাদের জ্ঞানসীমার বাইরে। এর উত্তরে হেগেল বহু পূর্বেই বলেছিলেন: একটা বস্তুর সমস্ত গুণই যদি জানা যায় তাহলে আসল বস্তুটাকেই জানা হল; বাকি যা রইল সেটা এই সত্য ছাড়া কিছুই নয় যে, বস্তুটা আমাদের বাইরে বর্তমান; এবং ইন্দ্রিয় মারফত এই সত্যটি শেখা হলেই 'প্রকৃত-বস্তুটির', কাণ্টের বিখ্যাত অজ্ঞেয় Ding an sich-এর চূড়ান্ত অবশেষটিও জানা হয়ে যায়। এর সঙ্গে যোগ দেওয়া যেতে পারে যে, কাণ্টের কালে প্রাকৃতিক বস্তু বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ছিল এতই টুকরো টুকরো যে, প্রত্যেকটা বস্তুর যেটুকু আমরা জানতাম তার পরেও একটা রহস্যময় 'প্রকৃত-বস্তুর' সন্দেহ তার স্বাভাবিক। কিন্তু একের পর এক এই সব অধরা বস্তুগুলোকে ধরা হয়েছে, বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং আরো বড়ো কথা,

পুনরুৎপন্ন করা হয়েছে বিজ্ঞানের অতিকায় প্রগতির কল্যাণে; আর যেটাকে আমরা উৎপন্ন করতে পারি সেটাকে নিশ্চয় অজ্ঞেয় বলে গণ্য করা যায় না। এ শতকের প্রথমার্ধে জৈব বস্তুগুলি ছিল রসায়নের কাছে এই ধরনের রহস্য-বস্তু; এখন জৈব প্রক্রিয়া ব্যতিরেকেই রাসায়নিক মৌলিক উপাদান থেকে একের পর এক তাদের বানাতে আমরা শিখেছি। আধুনিক রসায়নবিদরা ঘোষণা করেন, যে-বস্তুই হোক না কেন তার রাসায়নিক সংবিন্যাস জানতে পারলেই মৌলিক উপাদান থেকে তাকে তৈরি করা যায়। উচ্চ পর্যায়ের জৈব বস্তুর, এ্যালবুমিন-বস্তুর সংবিন্যাস এখনো আমরা জানতে পারি নি; কিন্তু কয়েক শতাব্দীর পরেও তার জ্ঞান অর্জিত হবে না এবং তার সাহায্যে কৃত্রিম এ্যালবুমিন তৈরি করতে পারব না, এর কোনো যুক্তি নেই। যদি তা পারি, তাহলে সেই সঙ্গে জৈব জীবনও আমরা সৃষ্টি করতে পারব, কেননা এ্যালবুমিন-বস্তুর অস্তিত্বের স্বাভাবিক ধরন হল জীবন—তার নিম্নতম থেকে উচ্চতম রূপ পর্যন্ত।

এই সব আনুষ্ঠানিক মানসিক কুণ্ঠা পেশ করার পরেই কিন্তু আমাদের অজ্ঞেয়বাদীর কথা ও কাজ একেবারে এক ঝানু বস্তুবাদীর মতো, যা তাঁর আসল স্বরূপ। অজ্ঞেয়বাদী হয়ত বলবেন: **আমরা** যতটা জেনেছি তাতে পদার্থ ও গতিকে, অথবা বর্তমানে তার যা নাম তেজকে (energy) সৃষ্টিও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না, কিন্তু কোনো না কোনো সময়ে যে তার সৃষ্টি হয় নি এমন প্রমাণ আমাদের নেই। কিন্তু কোনো একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁর এই স্বীকৃতি তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে গেলেই তিনি বাদীর বক্তব্যাধিকার খারিজ করে দেবেন। In abstracto (বিমূর্ত ক্ষেত্রে) অধ্যাত্মবাদ (১৮) মানলেও in concreto (প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে) তা তিনি মোটেই মানতে রাজী নন। বলবেন: যতদূর আমরা জানি ও জানতে পারি তাতে বিশ্বের কোনো স্রষ্টা বা নিয়ন্তা নেই; আমাদের সঙ্গে যতটা সম্পর্ক তাতে পদার্থ বা তেজ সৃষ্টিও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না; আমাদের ক্ষেত্রে ভাবনা হল তেজের একটা ধরন, মস্তিষ্কের একটা ক্রিয়া; যা কিছু আমরা জানি তা এই যে, বাস্তব জগৎ অমোঘ নিয়ম দ্বারা শাসিত, ইত্যাদি। অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক মানুষ, যে ক্ষেত্রে তিনি কোনো কিছু **জানেন,** সে ক্ষেত্রে তিনি বস্তুবাদী; কিন্তু তাঁর বিজ্ঞানের বাইরে যে বিষয়ে তিনি কিছুই

জানেন না, সে অজ্ঞতাকে তিনি গ্রীকে অনুবাদ করে বলেন agnosticism বা অজ্ঞেয়বাদ।

যাই হোক, একটা জিনিস মনে হয় পরিষ্কার: আমি যদি অজ্ঞেয়বাদী হতাম, তাহলেও এই ছোট বইখানিতে ইতিহাসের যে ধারণা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেটাকে 'ঐতিহাসিক অজ্ঞেয়বাদ' বলে বর্ণনা করা যে যেত না তা স্পষ্ট। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা হাসাহাসি করতেন, অজ্ঞেয়বাদীরা সরোষে প্রশ্ন করতেন, আমি কি তাঁদের নিয়ে তামাসা শুরু করেছি? তাই আশা করি ব্রিটিশ শালীনতাবোধও অতিমাত্রায় স্তম্ভিত হবে না যদি ইংরেজি তথা অপরাপর বহু ভাষায় 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' কথাটি আমি ব্যবহার করি ইতিহাস ধারার এমন একটা ধারণা বোঝাবার জন্য, যাতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার মূল কারণ ও মহতী চালিকা-শক্তির সন্ধান করা হয় সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির পরিবর্তনের মধ্যে, তৎকারণে বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভাগের মধ্যে এবং এই সব শ্রেণীর পারস্পরিক সংগ্রামের মধ্যে।

এ প্রশ্রয় বোধ হয় আরো পাওয়া সম্ভব যদি দেখানো যায় যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ব্রিটিশ শালীনতার পক্ষেও সুবিধাজনক হতে পারে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে ইংলন্ডে বসবাস করতে গিয়ে বিদগ্ধ বিদেশীদের যেটা বিস্মিত করত সেটাকে তাঁরা ইংরেজ শালীন মধ্য শ্রেণীর ধর্মীয় গোঁড়ামি আর নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য করতে বাধ্য হতেন। আমি এবার প্রমাণ করতে চাই যে, বিদগ্ধ বিদেশীর কাছে সেসময় শালীন ইংরেজ মধ্য শ্রেণী ঠিক যতটা নির্বোধ বলে মনে হত ততটা নির্বোধ তারা ছিল না। তাদের ধর্মীয় প্রবণতার ব্যাখ্যা আছে।

ইউরোপ যখন মধ্য যুগ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন শহরের উদীয়মান মধ্য শ্রেণী ছিল তার বিপ্লবী অংশ। মধ্যযুগীয় সামন্ত সংগঠনের মধ্যে তারা একটা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নিয়েছিল, কিন্তু সে প্রতিষ্ঠাও তার বর্ধমান ক্ষমতার তুলনায় অতি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে; মধ্য শ্রেণীর, **বুর্জোয়ার** বিকাশের সঙ্গে সামন্ত ব্যবস্থার সংরক্ষণ খাপ খাচ্ছিল না; সুতরাং সামন্ত ব্যবস্থার পতন হতে হল।

কিন্তু সামন্ততন্ত্রের বিরাট আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল রোমক ক্যাথলিক চার্চ। অভ্যন্তরীণ যুদ্ধাদি সত্ত্বেও তা সমগ্র সামন্ততান্ত্রিক প্রতীচ্য ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বিরাট রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং তা ছিল যেমন ধর্মগত বিভেদ-দীর্ণ গ্রীক দেশগুলির বিরোধী, তেমনি মুসলিম দেশগুলির বিরোধী। সামন্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে এ চার্চ স্বর্গীয় আশীর্বাণীর জ্যোতির্ভূষিত করে। সামন্ত কায়দায় এ চার্চ নিজের সোপানতন্ত্র গড়ে তোলে এবং শেষত, এ চার্চ নিজেই ছিল প্রবলতম এক সামন্ত অধিপতি, ক্যাথলিক জগতের পুরো এক তৃতীয়াংশ জমি ছিল এর দখলে। দেশে দেশে এবং সবিস্তারে অনৈশ্বরিক সামন্ততন্ত্রকে সফলভাবে আক্রমণ করার আগে তার এই পবিত্র কেন্দ্রীয় সংগঠনটিকে ধ্বংস করার দরকার ছিল।

তাছাড়া মধ্য শ্রেণীর অভ্যুদয়ের সমান্তরালে শুরু হয় বিজ্ঞানের বিপুল পুনরুজ্জীবন; ফের শুরু হয় জ্যোতির্বিজ্ঞান, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবৃত্তের চর্চা। শিল্পোৎপাদন বিকাশের জন্য বুর্জোয়ার দরকার ছিল একটা বিজ্ঞান, যা প্রাকৃতিক বস্তুর দৈহিক গুণাগুণ এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া-পদ্ধতি নিরূপিত করবে। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান হয়ে ছিল গির্জার বিনীত সেবাদাসী, ধর্মবিশ্বাসের আরোপিত সীমা তাকে লঙ্ঘন করতে দেওয়া হত না, সেই কারণে তা আদৌ বিজ্ঞানই ছিল না। বিজ্ঞান বিদ্রোহ করল গির্জার বিরুদ্ধে; বিজ্ঞান ছাড়া বুর্জোয়ার চলছিল না, তাই সে বিদ্রোহে যোগ দিতে হল তাকে।

প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সঙ্গে উদীয়মান মধ্য শ্রেণী যে কারণে সংঘাতে আসতে বাধ্য, তার শুধু দুটি ক্ষেত্র এই যে ছুঁয়ে গেলাম। তা সত্ত্বেও এটা দেখানোর পক্ষে তা যথেষ্ট যে, প্রথমত, ক্যাথলিক চার্চের দাবির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর; এবং দ্বিতীয়ত, সেসময় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিটি সংগ্রামকেই নিতে হত ধর্মীয় ছদ্মবেশ, পরিচালিত করতে হত সর্বাগ্রে চার্চের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরের ব্যবসায়ীরা কলরবের সূত্রপাত করলেও প্রবল সাড়া পাওয়া নিশ্চিত ছিল এবং পাওয়া যায় ব্যাপক গ্রামবাসীদের মধ্যে, চাষীদের মধ্যে — আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে যাদের সংগ্রাম করতে হত নিতান্ত প্রাণধারণের জন্যই।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় বুর্জোয়ার দীর্ঘ সংগ্রাম পরিণতি পায় তিনটি বড়ো বড়ো নির্ধারক লড়াইয়ের মধ্যে।

প্রথমটিকে বলা হয় জার্মানির প্রটেস্টান্ট ধর্ম-সংস্কার (১৯)। চার্চের বিরুদ্ধে লুথার যে রণধ্বনি তোলেন তাতে সাড়া দেয় দুটি রাজনৈতিক চরিত্রের অভ্যুত্থান: প্রথমে ফ্রান্‌ট্‌স ফন জিকিঙ্গেনের নেতৃত্বে নিম্ন অভিজাতদের অভ্যুত্থান (১৫২৩), পরে—১৫২৫ সালের বিরাট কৃষকযুদ্ধ। দুটিই পরাজিত হয় প্রধানত যে-দলগুলির সবচেয়ে বেশি স্বার্থ, শহরের সেই বার্গারদের (সামন্ত অধিকার বহির্ভূত নাগরিক) অনিশ্চিতমতির ফলে, এ অনিশ্চিতমতির কারণ নিয়ে আলোচনা এখানে সম্ভব হচ্ছে না। সেই সময় থেকে স্থানীয় রাজন্য আর কেন্দ্রীয় শক্তির মধ্যে লড়াইয়ে সে সংগ্রামের অধঃপতন ঘটে এবং তার পরিণাম, ইউরোপের রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় জাতিগুলির ভেতর থেকে দুশ' বছরের জন্য জার্মানির মুছে যাওয়া। লুথারীয় রিফর্মেশন থেকে সৃষ্টি হল এক নতুন ধর্মমত, স্বৈরশক্তি রাজতন্ত্রেরই উপযোগী একটা ধর্ম। উত্তর-পূর্ব জার্মানির কৃষকেরা লুথারবাদ গ্রহণ করতে না করতেই স্বাধীন লোক থেকে তারা পরিণত হল ভূমিদাসে।

কিন্তু লুথার যেখানে পারেন নি, সেখানে জিতলেন কালভাঁ। কালভাঁ-র ধর্মমত ছিল তাঁর কালের সবচেয়ে সাহসী বুর্জোয়াদের উপযোগী। প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক জগতে সাফল্য অসাফল্য মানুষের কর্ম বা বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার সাধ্যাতীত পরিস্থিতির ওপর, এই ঘটনাটার এক ধর্মীয় অভিব্যক্তি হল তাঁর ঐশ্বরিক নির্বন্ধ (predestination) মতবাদ। নির্ধারিত হচ্ছে কারো সংকল্পে নয়, কারো কর্মে নয়, উচ্চতর অজানা অর্থনৈতিক শক্তির কৃপায়; এটা সবিশেষ সত্য ছিল অর্থনৈতিক বিপ্লবের সেই এক যুগে যখন সমস্ত পুরনো বাণিজ্য পথ ও কেন্দ্রের জায়গায় আসছে নতুন পথ, নতুন কেন্দ্র, যখন ভারত ও আমেরিকা উন্মুক্ত হয়েছে দুনিয়ার কাছে, এবং যখন বিশ্বাসের পবিত্রতম অর্থনৈতিক প্রতীক, সোনা ও রুপোর দামও টলতে শুরু করেছে, ভেঙে পড়ছে। কালভাঁ-র গির্জা-গঠনতন্ত্র পুরোপুরি গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক। এবং ঈশ্বরের রাজত্ব যেখানে প্রজাতান্ত্রিক করে দেওয়া হয়েছে সেখানে ইহজগতের রাজত্ব কি থাকতে পারে রাজরাজড়া, বিশপ আর সামন্ত-প্রভুর অধীনে? জার্মান লুথারবাদ যে

ক্ষেত্রে রাজন্যদের হাতে বশংবদ হাতিয়ার হয়ে রইল, সে ক্ষেত্রে কালভাঁবাদ হল্যান্ডে প্রতিষ্ঠা করল একটি প্রজাতন্ত্র এবং ইংলন্ডে সর্বোপরি স্কট্‌ল্যান্ডে গড়ে তুলল সক্রিয় প্রজাতান্ত্রিক পার্টি।

কালভাঁবাদের মধ্যে দ্বিতীয় মহান বুর্জোয়া অভ্যুত্থান পেল তার তৈরি সংগ্রামী মতবাদ। এ অভ্যুত্থান ঘটে ইংলন্ডে। শহরের মধ্য শ্রেণী তাকে শুরু করে আর গ্রামাঞ্চলের মধ্য কৃষকরা (yeomanry) তা লড়ে শেষ করে। মজার ব্যাপার এই যে মহান তিনটি বুর্জোয়া অভ্যুত্থানেই লড়াইয়ের সৈন্যবাহিনী জোগায় কৃষকসম্প্রদায়, অথচ জয়লাভ হবার পরেই সে জয়লাভের অর্থনৈতিক ফলাফলে অতিনিশ্চিত যারা ধ্বংস হতে বাধ্য তারা হল এই কৃষকেরাই। ক্রমওয়েলের একশ' বছর পরে ইংলন্ডের মধ্য কৃষককুল প্রায় অদৃশ্য হয়। মোটের ওপর মধ্য কৃষককুল ও শহরের প্লেবিয়ান অংশ না থাকলে একা বুর্জোয়ারা কখনোই চরম পরিণতি পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেত না এবং প্রাণদণ্ডের মঞ্চে কখনোই এনে দাঁড় করাত না প্রথম চার্লসকে। বুর্জোয়ার যে সমস্ত বিজয় তখন অর্জনযোগ্য হয়ে উঠেছে শুধু সেইগুলো লাভ করতে হলেও বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় আরো বহুদূর পর্যন্ত — ঠিক ১৭৯৩ সালের ফ্রান্স এবং ১৮৪৮ সালের জার্মানির মতো। বস্তুত এ যেন বুর্জোয়া সমাজের বিবর্তনের একটা নিয়ম বলেই মনে হয়।

বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের এই আধিক্যের পর অবশ্যই আসে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া এবং যে সীমা পর্যন্ত সে প্রতিক্রিয়ার বজায় থাকা সম্ভব তাও সে ছাড়িয়ে যায়। একাদিক্রমে এদিক-ওদিক দোলার পর অবশেষে পাওয়া গেল নতুন ভারকেন্দ্র এবং তা থেকে শুরু হল একটা নতুন সূচনা। ইংলন্ডের ইতিহাসের যে সমারোহী যুগটা ভদ্রসম্প্রদায়ের কাছে 'মহা বিদ্রোহ' নামে পরিচিত সেই যুগ ও তার পরবর্তী সংগ্রামগুলির অবসান হয় অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ এক ঘটনায়, উদারনৈতিক ঐতিহাসিকেরা যার নাম দিয়েছেন 'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব' (২০)।

নতুন সূচনাটি হল উদীয়মান মধ্য শ্রেণী ও ভূতপূর্ব সামন্ত-জমিদারদের মধ্যে আপস। এখনকার মতোই এ জমিদারদের অভিজাত বলা হলেও বহু আগে থেকেই তারা সেই পথ নিয়েছিল যাতে তারা হয়ে ওঠে বহু পরবর্তী যুগের ফ্রান্সের লুই ফিলিপের মতো 'রাজ্যের প্রথম বুর্জোয়া'। ইংলন্ডের

পক্ষে সৌভাগ্যবশত সাদা ও লাল গোলাপের যুদ্ধের (২১) সময় বনেদী সামন্ত-ব্যারনেরা পরস্পরকে খতম করে। তাদের উত্তরাধিকারীরা অধিকাংশই প্রাচীন বংশোদ্ভূত হলেও প্রত্যক্ষ বংশধারা থেকে এতই দূরে যে, তারা একটা নতুন সম্প্রদায় হয়ে ওঠে, তাদের অভ্যাস ও মনোবৃত্তি সামন্ততান্ত্রিকের চেয়ে অনেক বেশি বুর্জোয়া। টাকার দাম তারা বেশ বুঝত এবং অবিলম্বেই শত শত ক্ষুদে চাষীকে উচ্ছেদ করে সে জায়গায় ভেড়া রেখে তারা খাজনা বেশি তুলতে শুরু করে। অষ্টম হেনরি গির্জার জমির হরির লুট করে পাইকারি হারে নতুন নতুন বুর্জোয়া জমিদার সৃষ্টি করেন; অসংখ্য মহালের বাজেয়াপ্ত ও একেবারে ভুঁইফোঁড় বা অপেক্ষাকৃত-ভুঁইফোঁড়দের কাছে তা ফের বিলি, গোটা সপ্তদশ শতাব্দী ধরে যা চলে, তাতেও একই ফল হয়। সুতরাং, সপ্তম হেনরির সময় থেকে ইংরেজ 'অভিজাতরা' শিল্প উৎপাদনের বিকাশে বাধা দেবার বদলে উল্টে সরাসরি তাই থেকেই মুনাফা তোলার চেষ্টা করেছে; এবং চিরকালই বড়ো বড়ো জমিদারদের এমন একটা অংশ ছিল যারা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে অর্থপতি ও শিল্পজীবী বুর্জোয়াদের মাতব্বরদের সঙ্গে সহযোগিতায় ইচ্ছুক। ১৬৮৯ সালের আপস তাই সহজেই সাধিত হয়। 'সম্পত্তি ও চাকুরির' রাজনৈতিক লুট রইল বড়ো বড়ো ভূস্বামী বংশের জন্য এই শর্তে যে, অর্থপতি, কারখানাজীবী ও বাণিজ্যিক মধ্য শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ যথেষ্ট দেখা হবে। আর এই সব অর্থনৈতিক স্বার্থই ছিল তখন দেশের সাধারণ পলিসি নির্দেশ করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী। খুঁটিনাটি ব্যাপারে ঝগড়া হয়ত হত, কিন্তু মোটের ওপর অভিজাত গোষ্ঠীতন্ত্র খুব ভালোই জানত যে, তার নিজস্ব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনিবার্যরূপে জড়িয়ে আছে শিল্পজীবী ও বাণিজ্যিক মধ্য শ্রেণীর উন্নতির সঙ্গে।

সেই সময় থেকে ইংলণ্ডের শাসক শ্রেণীগুলির একটি বিনীত কিন্তু তথাপি স্বীকৃত অংশ হল বুর্জোয়ারা। অন্যান্য শাসক শ্রেণীর সঙ্গে এদেরও সমান স্বার্থ ছিল দেশের বিপুল মেহনতীজনকে বশে রাখা। বণিক বা কারখানা--মালিক নিজেই হল তার কেরানী, তার মজুর, তার বাড়ির চাকরবাকরদের কাছে প্রভু, বা কিছু আগে পর্যন্তও যা বলা হত, 'স্বভাবতই ঊর্ধ্বতন'। তাদের কাছ থেকে যথাসাধ্য বেশি ও যথাসাধ্য ভালো কাজ আদায়

করাই তার স্বার্থ; সে উদ্দেশ্যে ঠিকমতো বাধ্যতার শিক্ষায় তাদের তালিম দেওয়ার কথা। নিজেই সে ছিল ধর্মভীরু; ধর্মের পতাকা নিয়েই সে রাজা ও লর্ডদের বিরুদ্ধে লড়ে জিতেছে; স্বভাবতই অধস্তনদের মনের ওপর প্রভাব ফেলে, তাদেরকে ঈশ্বর প্রসাদে স্থাপিত প্রভুটির আদেশাধীন করে তোলার দিক থেকে এ ধর্ম যে সুবিধা দান করছে তা আবিষ্কার করতে তার দেরি হয় নি। সংক্ষেপে 'ছোট লোকদের', দেশের বিপুল উৎপাদক জনগণকে দাবিয়ে রাখার কাজে ইংরেজ বুর্জোয়াকে এবার অংশ নিতে হচ্ছে এবং সে উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত অন্যতম একটা উপায় হল ধর্মের প্রভাব।

আর একটা ঘটনাও ছিল যাতে বুর্জোয়াদের ধর্মীয় প্রবণতা বেড়েছে। সেটা হল ইংলন্ডে বস্তুবাদের উদয়। এই নতুন মতবাদ মধ্য শ্রেণীর ধর্মানুভূতিতেই শুধু ঘা দেয় নি; বুর্জোয়া সমেত বিপুল অশিক্ষিত জনগণের যাতে বেশ চলে যায় সেই ধর্মের বিপরীতে এ মতবাদ নিজেকে জাহির করল কেবল দর্শন বলে, যা বিশ্বের পন্ডিত ও বিদগ্ধ জনেরই যোগ্য। হব্‌সের হাতে বস্তুবাদ মঞ্চে আসে রাজকীয় বিশেষাধিকার ও সর্বশক্তিমত্তার সমর্থক হিশেবে। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে তা আহ্বান করে সেই puer robustus sed malitiosus* অর্থাৎ জনগণকে দমন করতে। একইভাবে হব্‌সের পরবর্তীদের — বলিংব্রক, শ্যাফ্‌ট্‌সবেরি ইত্যাদির নতুন বস্তুবাদী deistic ধারাটা থেকে যায় একটা অভিজাত, esoteric** মতবাদ হিশেবে এবং সেইহেতু মধ্য শ্রেণীর কাছে তা ঘৃণ্য হয়, তার ধর্মীয় ধৃষ্টোক্তি ও বুর্জোয়া বিরোধী রাজনৈতিক যোগাযোগ উভয় কারণেই। এইভাবে, অভিজাতদের deism ও বস্তুবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল মধ্য শ্রেণীর প্রধান শক্তি যোগাতে থাকল সেই সব প্রটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়েরাই যারা রণপতাকা ও সংগ্রামী বাহিনী জুগিয়েছিল স্টুয়ার্টদের বিরুদ্ধে, 'মহান উদারনৈতিক পার্টির' মেরুদন্ড আজো পর্যন্ত তারাই।

ইতিমধ্যে ইংলন্ড থেকে বস্তুবাদ চলে যায় ফ্রান্সে, সেখানে আর একটি বস্তুবাদী দার্শনিক ধারার, কার্থেজিয়ানদের (২২) একটি শাখার সংস্পর্শে সে আসে ও তার সঙ্গে মিশে যায়। ফ্রান্সেও প্রথম দিকে বস্তুবাদ থাকে একটা

* তাগড়াই কিন্তু হিংস্র ছোকরা। — সম্পাঃ

** মন্ত্রগুপ্ত, শুধু দীক্ষিতের অধিগম্য। — সম্পাঃ

একান্তভাবে অভিজাত মতবাদ হিশেবে। কিন্তু অচিরেই তার বিপ্লবী চরিত্র আত্মপ্রকাশ করল। ফরাসী বস্তুবাদীরা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই সমালোচনা সীমাবদ্ধ রাখল না; তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা কিছু সামনে পড়ল সবেতেই প্রসারিত করল তাদের সমালোচনা; তাদের মতবাদের সার্বজনীন প্রয়োগযোগ্যতার দাবি প্রমাণের জন্য সংক্ষিপ্ততম পন্থা অবলম্বন করে সাহসের সঙ্গে তা জ্ঞানের সবকটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করল এক অতিকায় রচনায়, 'Encyclopédie'-য় যা থেকে তাদের নাম। এইভাবে খোলাখুলি বস্তুবাদ বা deism, এই দুই ধারার কোনো না কোনো একটা রূপে বস্তুবাদ হয়ে দাঁড়াল ফ্রান্সের সমগ্র সংস্কৃতিবান যুবসমাজের মতবাদ; এতটা পরিমাণে হল যে, মহান বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন ইংরেজ রাজতন্ত্রীদের সৃষ্ট মতবাদটা থেকেই এল ফরাসী প্রজাতন্ত্রী ও সন্ত্রাসবাদীদের তাত্ত্বিক ধ্বজা, এবং 'মানবিক ও নাগরিক অধিকার ঘোষণাপত্রের' (২৩) বয়ান।

মহান ফরাসী বিপ্লব হল বুর্জোয়াদের তৃতীয় অভ্যুত্থান, কিন্তু এই প্রথম বিপ্লব যা ধর্মের আলখাল্লাটা একেবারে ছুঁড়ে ফেলে এবং লড়াই চালায় অনাবরণ রাজনৈতিক ধারায়। এদিক থেকেও এটা প্রথম যে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের একপক্ষের, অর্থাৎ অভিজাতদের বিনাশ এবং অন্যপক্ষের, বুর্জোয়ার পরিপূর্ণ জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত সত্যি করেই সে লড়াই চালিয়ে যাওয়া হয়। ইংলণ্ডে প্রাক্-বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর প্রতিষ্ঠানাদির ধারাবাহিকতা এবং জমিদার ও পুঁজিপতিদের মধ্যেকার আপসের প্রকাশ হয় আদালতী নজিরের ধারাবাহিকতায় এবং আইনের সামন্ততান্ত্রিক রূপগুলির ধর্মীয় সংরক্ষণে। ফ্রান্সে অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে একটা পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটায় বিপ্লব; সামন্ততন্ত্রের শেষ জেরটুকুও তা সাফ করে Code Civil-এর (২৪) মাধ্যমে আধুনিক পুঁজিবাদী পরিস্থিতির উপযোগী করে চমৎকার খাপ খাইয়ে নেয় প্রাচীন রোমক আইন-সংহিতাকে—মার্কস যাকে বলেছিলেন পণ্যোৎপাদন, সেই অর্থনৈতিক পর্যায়ের অনুসারী আইনী সম্পর্কের একটি প্রায় নিখুঁত প্রকাশ ছিল তাতে,—এমন চমৎকার খাপ খাইয়ে নেয় যে, এই ফরাসী বিপ্লবী বিধি-সংহিতাটি আজো পর্যন্ত অন্য সব দেশের সম্পত্তি-আইন সংস্কারের আদর্শস্বরূপ, ইংলণ্ডও বাদ নয়। অবশ্য, ইংরেজি আইন যদিও পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রকাশ করে চলেছে সেই এক বর্বর

সামন্ততান্ত্রিক ভাষায় যার সঙ্গে উদ্দিষ্ট বস্তুর ততটাই সাদৃশ্য যতটা সাদৃশ্য ইংরেজি বানানের সঙ্গে ইংরেজি উচ্চারণের — vous écrivez Londres et vous prononcez Constantinople* বলেছিলেন জনৈক ফরাসী — তবু একথা ভোলা ঠিক নয় যে, সেই একই ইংরেজি আইনই একমাত্র আইন যা প্রাচীন জার্মান ব্যক্তি-স্বাধীনতা, স্থানীয় স্বশাসন এবং আদালত ছাড়া অন্য সমস্ত হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তির সেরা অংশটিকে যুগে যুগে রক্ষা করে এসেছে এবং প্রেরণ করেছে আমেরিকা ও উপনিবেশে — নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের যুগে ইউরোপ ভূখন্ড থেকে এ জিনিসটা লোপ পায় এবং এখনো পর্যন্ত কোথাও তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় নি।

আমাদের ব্রিটিশ বুর্জোয়ার কথায় ফেরা যাক। ফরাসী বিপ্লবের ফলে তার একটা চমৎকার সুযোগ হল ইউরোপ ভূখন্ডের রাজতন্ত্রগুলির সাহায্যে ফরাসী নৌবাণিজ্য ধ্বংস, ফরাসী উপনিবেশ অধিকার এবং জলপথে ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ দাবিটাকেও চূর্ণ করার। ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ বুর্জোয়া যে লড়েছিল তার একটা কারণ এই। আর একটা কারণ, এ বিপ্লবের ধরণ-ধারণটা তার রুচিতে বড়ো বেশি বেধেছিল। তার 'জঘন্য' সন্ত্রাসটাই শুধু নয়, বুর্জোয়া শাসনকে চরমে নিয়ে যাবার চেষ্টাটাই। তাদের যে অভিজাতরা ব্রিটিশ বুর্জোয়াকে নিজেদের আদব-কায়দা শিখিয়ে তুলেছে, ফ্যাশন উদ্ভাবন করে দিয়েছে তার জন্য, যারা অফিসার যুগিয়েছে সেই সৈন্যবাহিনীতে, যা শৃঙ্খলা রক্ষা করেছে স্বদেশে, এবং সেই নৌবাহিনীতে, যা জয় করে দিয়েছে ঔপনিবেশিক সম্পত্তি এবং বিদেশের নতুন নতুন বাজার — তাদের বাদ দিয়ে ব্রিটিশ বুর্জোয়ার চলে কী করে? বুর্জোয়াদের একটা প্রগতিশীল সংখ্যালঘু অংশ অবশ্য ছিল, আপসের ফলে এ সংখ্যালঘুর স্বার্থ তত বেশি দেখা হচ্ছিল না। প্রধানত অপেক্ষাকৃত কম সম্পন্ন মধ্য শ্রেণীর তৈরি এই অংশটার সহানুভূতি ছিল বিপ্লবের প্রতি, কিন্তু পার্লামেণ্টে তার ক্ষমতা ছিল না।

এভাবে বস্তুবাদ যতই হয়ে ওঠে ফরাসী বিপ্লবের মতবাদ, ততই ধর্মভীরু ইংরেজ বুর্জোয়া আরো বেশি আঁকড়ে ধরে ধর্ম। জনগণের ধর্মচেতনা লোপ

---

* লেখেন লন্ডন কিন্তু উচ্চারণ করেন কনস্টানটিনোপল। — সম্পাঃ

পেলে তার ফল কী দাঁড়ায় তা কি প্যারিস সন্ত্রাসের কালে প্রমাণ হয় নি? বস্তুবাদ যতই ফ্রান্স থেকে আশেপাশের দেশে ছড়িয়ে শক্তি সঞ্চয় করছিল অনুরূপ মতধারা থেকে, বিশেষ করে জার্মান দর্শন থেকে, সাধারণভাবে স্বাধীন চিন্তা ও বস্তুবাদ যতই ইউরোপ ভূখণ্ডে বস্তুতপক্ষে বিদগ্ধ ব্যক্তির অনিবার্য গুণস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, ততই গোঁ ধরে ইংরেজ মধ্য শ্রেণী আঁকড়ে রইল তার বহুবিধ ধর্মবিশ্বাসকে। এসব ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে পারস্পরিক তফাৎ যতই থাকুক তাদের সবকটিই হল পরিষ্কার রকমের ধর্মীয়, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস।

বিপ্লব যখন ফ্রান্সে বুর্জোয়ার রাজনৈতিক বিজয় নিশ্চিত করছিল, সেই সময় ইংলণ্ডে ওয়াট, আর্করাইট, কার্টরাইট প্রভৃতিরা সূচিত করেন এক শিল্প বিপ্লবের, অর্থনৈতিক শক্তির ভারকেন্দ্র তাতে পুরোপুরি সরে যায়। ভূমিজীবী অভিজাতদের চেয়ে বুর্জোয়ার সম্পদ বেড়ে উঠতে লাগল অতি দ্রুতগতিতে। খাস বুর্জোয়ার মধ্যেই অর্থপতি অভিজাত, ব্যাংকার প্রভৃতিদের ক্রমেই পেছনে ঠেলে এগিয়ে এল কারখানা-মালিকেরা। ১৬৮৯ সালের আপস এযাবৎ ক্রমশ বুর্জোয়ার অনুকূলে পরিবর্তিত হয়ে এলেও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পারস্পরিক অবস্থানের সঙ্গে তা আর খাপ খাচ্ছিল না। পক্ষগুলির চরিত্রেও বদল হয়েছে; ১৮৩০ সালের বুর্জোয়ারা আগের শতকের বুর্জোয়ার চেয়ে ভয়ানক পৃথক। অভিজাতদের হাতে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা তখনো থেকে গিয়েছিল এবং নতুন শিল্পজীবী বুর্জোয়ার দাবি-দাওয়া প্রতিরোধে যা ব্যবহৃত হচ্ছিল, তা নতুন অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হয়ে দাঁড়ায়। অভিজাতদের সঙ্গে একটা নতুন লড়াইয়ের প্রয়োজন পড়ল; তার পরিণতি হতে পারত কেবলমাত্র নতুন অর্থনৈতিক শক্তির জয়লাভে। প্রথমে, ১৮৩০ সালের ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে, সমস্ত প্রতিরোধ সত্ত্বেও সংসদ-সংস্কারের (২৫) কাজ সমাপ্ত হয়। এতে পার্লামেণ্টে বুর্জোয়ারা পেল একটা শক্তিশালী ও সর্বজনস্বীকৃত প্রতিষ্ঠা। তারপর শস্য আইন বরবাদ (২৬), এতে ভূমিজীবী অভিজাতদের ওপর বুর্জোয়ার, বিশেষ করে তার সবচেয়ে সক্রিয় অংশ — কারখানা-মালিকদের প্রাধান্য চিরকালের মতো নির্দিষ্ট হয়ে গেল। বুর্জোয়ার এই সবচেয়ে বড়ো জয়; একান্ত নিজের স্বার্থে অর্জিত বিজয় হিশেবে এই আবার কিন্তু তার শেষ বিজয়। পরে যা কিছু সে জিতেছে তা

ভাগ করে নিতে হয়েছে নতুন একটা সামাজিক শক্তির সঙ্গে, এ শক্তি ছিল প্রথমে তার সহায়, কিন্তু অচিরেই হয়ে দাঁড়াল তার প্রতিদ্বন্দ্বী।

শিল্প বিপ্লবে বৃহৎ কারখানা-মালিক পুঁজিপতিদের একটা শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল তাদের চেয়ে অনেক সংখ্যাবহুল কারখানা-কর্মীদের একটা শ্রেণী। যে অনুপাতে শিল্প বিপ্লব উৎপাদনের একটা শাখার পর আর একটা শাখা অধিকার করতে থাকে সেই অনুপাতে এ শ্রেণী ক্রমশ সংখ্যায় বেড়ে ওঠে এবং সেই অনুপাতেই হয়ে ওঠে শক্তিশালী। ১৮২৪ সালেই এ শক্তির প্রমাণ সে দেয়—শ্রমিকদের সমিতি গঠনের নিষেধ-আইন নাকচ করতে অনিচ্ছুক পার্লামেণ্টকে বাধ্য করে (২৭)। সংস্কার আন্দোলনের সময় শ্রমিকেরা ছিল সংস্কার-দলের (Reform party) র‍্যাডিকেল অংশ; ১৮৩২ সালের আইনে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করায় তারা জনগণের চার্টার বা সনদে (২৮) নিজেদের দাবি-দাওয়া নির্দিষ্ট করে শস্য আইনবিরোধী শক্তিশালী লীগের (২৯) বিপরীতে নিজেদের সংগঠিত করে এক স্বাধীন চার্টিস্ট পার্টিতে, আধুনিক কালে এ-ই প্রথম শ্রমিক পার্টি।

তারপর শুরু হয় ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে ইউরোপ ভূখণ্ডের বিপ্লবগুলি। এতে শ্রমিকজন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা নেয় এবং, অন্তত প্যারিসে, তারা যেসব দাবি-দাওয়া উপস্থিত করে পুঁজিবাদী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা ছিল নিশ্চিতই অননুমোদনীয়। তারপর শুরু হয় সাধারণ প্রতিক্রিয়া। প্রথমে, ১৮৪৮ সালে ১০ এপ্রিল চার্টিস্টদের পরাজয় (৩০), তারপর সেই বছরেই জুনে প্যারিস শ্রমিকদের অভ্যুত্থান দমন, তারপর ইতালি, হাঙ্গেরি, দক্ষিণ জার্মানিতে ১৮৪৯ সালের বিপর্যয়, পরিশেষে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর প্যারিসের ওপর লুই বোনাপার্টের জয় (৩১)। অন্তত কিছু কালের জন্য শ্রমিক দাবি-দাওয়ার জুজুটাকে দমন করা গেল, কিন্তু কী মূল্য দিয়ে! সাধারণ লোককে ধর্মভীরু করে রাখার প্রয়োজনীয়তা যদি ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা আগেই বুঝে থাকে, তবে এত সব অভিজ্ঞতার পর সে প্রয়োজনীয়তা তারা আরো কত বেশিই না টের পাচ্ছে! ইউরোপ ভূখণ্ডের ভাই-বন্ধুদের বিদ্রূপের পরোয়া না করে তারা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বাইবেল প্রচারের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে চলেছে; নিজেদের স্বদেশী

ধর্মযন্ত্রে তুষ্ট না হয়ে তারা আবেদন জানিয়েছে ধর্মব্যবসার বৃহত্তম সংগঠক 'জোনাথান ভাইয়ের' (৩২) কাছে এবং আমেরিকা থেকে আমদানি করেছে রিভাইভ্যালিজ্‌ম্ (৩৩), মুডি, স্যাঙ্কি প্রভৃতিদের; এবং পরিশেষে 'স্যালভেশন আর্মির' বিপজ্জনক সাহায্যও গ্রহণ করেছে—এরা আদি খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ফিরিয়ে আনছে, সেরা অংশ হিশেবে আবেদন করছে গরিবদের কাছে, পুঁজিবাদের সঙ্গে লড়ছে ধর্মের মধ্য দিয়ে এবং এইভাবে আদি খ্রীষ্টীয় শ্রেণী-বৈরের একটা বীজ লালন করে তুলছে, যে সম্পন্ন লোকেরা আজ এর জন্য নগদ টাকা ধরে দিচ্ছে তাদের কাছে যা হয়ত একদিন মুশকিল বাধাবে।

মনে হয় এ যেন ঐতিহাসিক বিকাশের একটা নিয়ম যে, মধ্য যুগে সামন্ত-অভিজাতরা যেভাবে একান্তরূপে নিজেদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রেখেছিল, কোনো ইউরোপীয় দেশেই বুর্জোয়ারা সেভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা রাখতে পারবে না—অন্তত বেশ কিছু দিনের জন্য। এমনকি সামন্ততন্ত্র যেখানে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই ফ্রান্সেও বুর্জোয়ারা সমগ্রভাবে সরকারের পুরো দখল পেয়েছে কেবল অতি স্বল্পকালের জন্য। ১৮৩০-১৮৪৮ সালে লুই ফিলিপের রাজত্বকালে বুর্জোয়াদের একটা ক্ষুদ্র অংশই রাজ্য চালায়; যোগ্যতার কড়া শর্তের ফলে তাদের বড়ো অংশটাই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে, ১৮৪৮-১৮৫১ সালের মধ্যে, সমগ্র বুর্জোয়াই শাসন চালায়, কিন্তু কেবল তিন বছরের জন্য; তাদের অক্ষমতায় এল দ্বিতীয় সাম্রাজ্য। মাত্র এখন, তৃতীয় প্রজাতন্ত্রেই বুর্জোয়ারা সমগ্রভাবে সরকারের কর্ণধার হয়ে আছে কুড়ি বছরেরও বেশি কাল, এবং ইতিমধ্যেই তাদের অবক্ষয়ের শুভলক্ষণ ফুটে উঠছে। বুর্জোয়াদের একটা স্থায়ী শাসন সম্ভব হয়েছে কেবল আমেরিকার মতো দেশে, যেখানে সামন্ততন্ত্র অজানা এবং সমাজ প্রথম থেকেই শুরু হয় বুর্জোয়া ভিত্তিতে। এবং এমনকি ফ্রান্স ও আমেরিকাতেও বুর্জোয়ার উত্তরাধিকারী শ্রমিক জনগণ ইতিমধ্যেই দ্বারে করাঘাত শুরু করেছে।

ইংলণ্ডে বুর্জোয়াদের কখনোই একক ক্ষমতা ছিল না। ১৮৩২ সালের বিজয়ের পরেও ভূমিজীবী অভিজাতদের হাতে রেখে দেওয়া হয় প্রধান প্রধান সরকারী পদের প্রায় পূর্ণ দখল। ধনী মধ্য শ্রেণী যে রূপ বিনয়ে

এটা মেনে নেয় তা আমার কাছে দুর্বোধ্য ছিল ততদিন পর্যন্ত যতদিন না উদারনীতিক বৃহৎ কারখানা-মালিক মিঃ ডবলিউ. এ. ফর্স্টার প্রকাশ্য ভাষণে ব্র্যাডফোর্ডের যুবসম্প্রদায়ের কাছে আবেদন করেন দুনিয়ায় চলতে হলে ফরাসী শিখতে হবে, এবং নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিশেবে তাঁকে যখন এমন একটা মহলে চলাফেরা করতে হত যেখানে ফরাসী ভাষা অন্তত ইংরেজি ভাষার মতোই জরুরী, তখন তাঁকে কী আহাম্মকই না লাগত। আসলে তখনকার ইংরেজ মধ্য শ্রেণী ছিল সাধারণত একেবারে অশিক্ষিত ভুঁইফোঁড়, অভিজাতদের তারা উচ্চতর সেই সব সরকারী পদ না দিয়ে পারত না যেখানে ব্যবসায়ী চতুরতায় পোক্ত একটা নিতান্ত গণ্ডিবদ্ধ সংকীর্ণতা ও গণ্ডিবদ্ধ অহমিকা ছাড়াও অন্য যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল।* এমনকি এখনো মধ্য শ্রেণীর শিক্ষা বিষয়ে সংবাদপত্রের অন্তহীন বিতর্ক থেকে দেখা যায়, ইংরেজ মধ্য শ্রেণী এখনো নিজেকে সেরা শিক্ষার

---

* এমনকি ব্যবসার ক্ষেত্রেও জাতীয় শোভিনিজমের অহমিকা এক অতি কুপরামর্শ। হাল আমল পর্যন্ত গড়পড়তা ইংরেজ কারখানা-মালিক মনে করত নিজ ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলা ইংরেজের পক্ষে মর্যাদাহানিকর, বিদেশের 'বেচারা ভূতেরা' ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করে তার হাত থেকেই মাল নিয়ে বিদেশে বিক্রি করার ঝামেলা নিচ্ছে, এতে তার আর কিছু নয় বরং খানিকটা গর্বই হত। এটা তার কখনো নজরে আসে নি যে, এই বিদেশীরা, প্রধানত জার্মানরা, এইভাবে ব্রিটিশ বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানির একটা বড়ো অংশের ওপর দখল পেয়েছে এবং ইংরেজদের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে প্রায় একমাত্র কেবল উপনিবেশে, চীনে, যুক্তরাষ্ট্রে ও দক্ষিণ আমেরিকায়। এও সে খেয়াল করে নি যে, এই জার্মানদের সঙ্গে বিদেশে অন্যান্য জার্মানরা ব্যবসা ক'রে ক্রমশ সারা দুনিয়ায় বাণিজ্যিক উপনিবেশের একটা পুরো জাল গড়ে তুলছে। কিন্তু জার্মানি যখন প্রায় চল্লিশ বছর আগে সত্যি করেই রপ্তানির জন্য মাল তৈরি করতে লাগল, তখন শস্য-চালানী দেশ থেকে প্রথম শ্রেণীর কারখানা-মালিক দেশরূপে অত অল্প সময়ের মধ্যে তার রূপান্তরে এই বাণিজ্যিক জালটা তার চমৎকার কাজে লেগেছিল। তারপর, প্রায় দশ বছর আগে, ব্রিটিশ কারখানা-মালিকরা ভয় পেয়ে তার রাষ্ট্রদূত ও কন্সালদের প্রশ্ন করে, কেন তাদের খরিদ্দাররা টিকছে না। সকলে একবাক্যে জবাব দেয়: ১) আপনারা খরিদ্দারদের ভাষা শেখেন না, ভাবেন তাদেরই উচিত আপনাদের ভাষায় কথা বলা; ২) খরিদ্দারদের চাহিদা অভ্যাস রুচি ইত্যাদির সঙ্গেও মানিয়ে চলতে চান না, আশা করেন আপনাদের ইংরেজি চাহিদা অভ্যাস রুচি অনুসারেই সে চলবে। (এঙ্গেলসের টীকা।)

যোগ্য বলে মনে করছে না, কিছু কম-সমের দিকেই তার চোখ। সুতরাং, শস্য আইন বাতিল করার পরেও এ যেন স্বাভাবিক যে, কবডেন, ব্রাইট, ফর্স্টার প্রভৃতি যে লোকেরা জিতল তারা দেশের সরকারী শাসনের অংশ থেকে বঞ্চিত রইল পরবর্তী কুড়ি বছর পর্যন্ত, যতদিন না নতুন একটা সংসদীয় সংস্কারে (৩৪) ক্যাবিনেটের দ্বার উন্মুক্ত হয় তাদের জন্য। ইংরেজ বুর্জোয়ারা আজো পর্যন্ত তাদের সামাজিক হীনতাবোধে এত বেশি আচ্ছন্ন যে, সমস্ত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তারা যোগ্যরূপে জাতির প্রতিনিধিত্বের জন্য স্বীয় খরচায় এবং জাতির খরচায় এক দল শোভাবর্ধক নিষ্কর্মার প্রতিপালন করে চলেছে; এবং নিজেদের দ্বারাই তৈরি করা এই নির্বাচিত ও সুবিধাভোগী মহলে নিজেদের কেউ যখন প্রবেশাধিকারের যোগ্য বিবেচিত হয়, তখন ভয়ানক সম্মানিত বোধ করে তারা।

সুতরাং, শিল্পজীবী ও বাণিজ্যিক মধ্য শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে ভূমিজীবী অভিজাতদের সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করতে পারার আগেই মঞ্চে আবির্ভূত হল আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী, শ্রমিক শ্রেণী। চার্টিস্ট আন্দোলন ও ইউরোপ ভূখণ্ডের বিপ্লবগুলির পরেকার প্রতিক্রিয়া, তথা ১৮৪৮-১৮৬৬ সালের ব্রিটিশ বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে (স্থূলভাবে বলা হয় একমাত্র অবাধ বাণিজ্যই তার কারণ, তার চেয়েও কিন্তু অনেক বড়ো কারণ রেলপথ, সামুদ্রিক পোত, ও সাধারণভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুল বিস্তার) শ্রমিক শ্রেণীকে ফের উদারনৈতিক দলের অধীনে যেতে হয়—প্রাক্-চার্টিস্ট যুগের মতো তারা হয় এ দলের র‍্যাডিকেল অংশ। তাদের ভোটাধিকারের দাবি কিন্তু ক্রমশই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে; উদারনীতিকদের হুইগ নেতারা যে ক্ষেত্রে 'ভয় পায়' সে ক্ষেত্রে ডিজরেলি তাঁর শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ দিয়ে টোরিদের (৩৫) পক্ষে অনুকূল মুহূর্তটিকে ব্যবহার করে আসনের পুনর্বণ্টন সহ প্রবর্তন করান 'বরো'-গুলিতে ঘর-পিছু ভোট (household suffrage in the boroughs)। অতঃপর প্রবর্তিত হয় ব্যালট (৩৬); তারপর ১৮৮৪ সালে কাউণ্টিগুলিতেও ঘর-পিছু ভোটাধিকারের প্রসার এবং আসনের আরো একটা নববণ্টন যাতে নির্বাচনী এলাকাগুলি কিছুটা সমান সমান হয়ে আসে। এই সব ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর নির্বাচনী ক্ষমতা এতটা বেড়ে যায় যে, অন্তত দেড়শ' থেকে দুইশ'টি নির্বাচনী এলাকায় এ শ্রেণীর লোকেরাই

এবার হয় অধিকাংশ ভোটদাতা। কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান শেখানোর একটা খাসা ইস্কুল হল পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থা; লর্ড জন ম্যানার্স ঠাট্টা করে যাদের বলেছিলেন 'আমাদের সাবেকি অভিজাত' তাদের দিকে মধ্য শ্রেণী যদি তাকায় সভয়সম্ভ্রমে, তাহলে শ্রমিক শ্রেণীও শ্রদ্ধা সম্মান করে তাকাত মধ্য শ্রেণীর দিকে, যাদের অভিহিত করা হত তাদের 'শ্রেয়তর' বলে। বস্তুতপক্ষে, বছর পনের আগে ব্রিটিশ মজুর ছিল আদর্শ মজুর, মনিবের প্রতিষ্ঠার প্রতি তার সশ্রদ্ধ সম্মান এবং নিজের জন্য অধিকার দাবি করতে তার সংযমী বিনয় দেখে আমাদের **ক্যাথিডার-সোশ্যালিস্ট** (৩৭) গোষ্ঠীর জার্মান অর্থনীতিবিদরা তাদের স্বদেশী মজুরদের দুরারোগ্য কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী প্রবণতার ক্ষেত্রে একটা সান্ত্বনা পেয়েছিল।

কিন্তু ইংরেজ মধ্য শ্রেণী ভালো ব্যবসায়ী বলে জার্মান অধ্যাপকদের চেয়ে দূরদর্শী। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তারা ক্ষমতা ভাগ করে যে নিয়েছিল তা অনিচ্ছা সহকারে। চার্টিস্ট আন্দোলনের বছরগুলিতে তারা শিখেছে সেই puer robustus sed malitiosus, অর্থাৎ জনগণের সামর্থ্য কেমন। সেই সময় থেকে জনগণের চার্টারের সেরা ভাগটা তারা যুক্তরাজ্যের সংবিধানে সন্নিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। এখনই সবচেয়ে বেশি করে জনগণকে শৃঙ্খলায় রাখতে হবে নৈতিক উপায়ে, এবং জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তারের কার্যকরী সমস্ত নৈতিক উপায়ের মধ্যে প্রথম ও প্রধান উপায় ছিল এবং রয়েই গেল ধর্ম। এই কারণেই স্কুল বোর্ডগুলিতে পাদ্রীদের সংখ্যাধিক্য, এই কারণে পূজোর্চনা (৩৮) থেকে 'স্যালভেশন আর্মি' পর্যন্ত সর্ববিধ পুনরুদয়বাদের (revivalism) সমর্থনে বুর্জোয়াদের ক্রমবর্ধমান আত্ম-করারোপ।

ইউরোপীয় ভূখণ্ডবাসী বুর্জোয়ার স্বাধীন চিন্তা ও ধর্মীয় শিথিলতার ওপর এবার জিত হল ব্রিটিশ শালীনতার। ফ্রান্স ও জার্মানির শ্রমিকেরা বিদ্রোহভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। সমাজতন্ত্রে তারা একেবারে সংক্রামিত এবং যে উপায়ে স্বীয় প্রাধান্য অর্জন করতে হবে, তার বৈধতা নিয়ে তারা, সঠিক কারণেই, বিশেষ ভাবিত ছিল না। এখানকার puer robustus দিন দিন বেশি malitiosus হয়ে উঠছে। বড়াই করে জ্বলন্ত চুরুটটা নিয়ে ডেকের ওপর আসার পর সমুদ্রপীড়ার প্রকোপে ছোকরা যাত্রী যেমন সেটিকে গোপনে ত্যাগ করে,

তেমনিভাবে শেষ পন্থা হিশেবে ফরাসী ও জার্মান বুর্জোয়ার পক্ষে তাদের স্বাধীন চিন্তা নিঃশব্দে পরিত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর রইল না; বাইরের ব্যবহারে একের পর এক ধার্মিক হয়ে উঠতে লাগল ঈশ্বরবিদ্বেষীরা, চার্চ এবং তার শাস্ত্রবচন ও অনুষ্ঠানাদির বিষয়ে কথা কইতে লাগল সম্মান করে, যেটুকু না করলে নয় সেসব মেনেও নিতে লাগল। ফরাসী বুর্জোয়ারা শুক্রবার শুক্রবার **হবিষ্যি** শুরু করল আর রবিবার রবিবার জার্মান বুর্জোয়ারা গির্জায় নির্দিষ্ট আসনটিতে বসে শুনতে লাগল দীর্ঘ প্রটেস্টাণ্ট সার্মন। বস্তুবাদ নিয়ে তারা বিপদে পড়েছে। 'Die Religion muss dem Volk erhalten werden' — 'ধর্মকে জীইয়ে রাখতে হবে জনগণের জন্য' — সমূহ সর্বনাশ থেকে সমাজের পরিত্রাণের এই হল একমাত্র ও সর্বশেষ উপায়। দুর্ভাগ্যবশত, চিরকালের মতো ধর্মকে চূর্ণ করার জন্য যথাসাধ্য করার আগে এটি তারা আবিষ্কার করতে পারে নি। এবার বিদ্রূপ করে ব্রিটিশ বুর্জোয়ার বলার পালা: 'আহাম্মকের দল, একথা তো দু'শ' বছর আগেই আমি তোমাদের বলতে পারতাম!'

আমার কিন্তু আশঙ্কা, ব্রিটিশদের ধর্মীয় নিরেটত্ব অথবা ইউরোপ ভূখণ্ডের বুর্জোয়াদের post festum* দীক্ষাগ্রহণ কিছুতেই বর্ধমান প্রলেতারীয় তরঙ্গকে ঠেকাতে পারবে না। ঐতিহ্যের একটা মস্ত পিছুটানের শক্তি আছে, ইতিহাসের সে vis inertiae**, কিন্তু নিতান্ত নিষ্ক্রিয় বলে তা ভেঙে পড়তে বাধ্য এবং এই কারণে পুঁজিবাদী সমাজের চিরস্থায়ী রক্ষাকবচ ধর্ম হবে না। আমাদের আইনী, দার্শনিক ও ধর্মীয় ধারণাগুলি যদি হয় একটা নির্দিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কপাতের মোটামুটি সুদূর কতকগুলো শাখা, তাহলে এই সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া সহ্য করে এসব শাখা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে না। এবং অলৌকিক দৈব-প্রজ্ঞায় বিশ্বাস না করলে আমাদের মানতেই হবে যে, পতনোন্মুখ সমাজকে ঠেকা দিয়ে রাখার শক্তি কোনো ধর্মীয় প্রবচনের নেই।

বস্তুতপক্ষে ইংলণ্ডেও শ্রমিক শ্রেণী ফের সচল হয়ে উঠেছে। সন্দেহ নেই যে, তারা নানাবিধ ঐতিহ্যে শৃঙ্খলিত। বুর্জোয়া ঐতিহ্য, যথা এই

* পার্বণ পেরিয়ে যাবার পর, অর্থাৎ বিলম্বে। — সম্পাঃ

** জাড্যের শক্তি। — সম্পাঃ

ব্যাপক-প্রচলিত বিশ্বাস যে, শুধু রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক, মাত্র এই দুটি পার্টিই থাকা সম্ভব এবং শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্তি অর্জন করতে হবে মহান উদারনৈতিক পার্টির সাহায্যে ও তারই মাধ্যমে। শ্রমিকদের ঐতিহ্য, যা স্বাধীন সংগ্রামের প্রথম খসড়া প্রচেষ্টা থেকে তারা পেয়েছে, যথা যারা একটা নিয়মিত শিক্ষানবিশীর মধ্য দিয়ে আসে নি এমন সমস্ত আবেদনকারীকে সাবেকি বহু ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বাদ দিয়ে রাখা; তার অর্থ দাঁড়াবে এই সব ইউনিয়ন কর্তৃক নিজেদের হাতেই নিজেদের বেইমান বাহিনী গঠন করা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণী এগুচ্ছে, ভ্রাতৃপ্রতিম ক্যাথিডার-সোশ্যালিস্টদের কাছে এমনকি অধ্যাপক ব্রেনটানোকেও যা রিপোর্ট করতে হয়েছে সখেদে। এগুচ্ছে, ইংলণ্ডের সবকিছুর মতোই, ধীরে ধীরে পা মেপে মেপে, কোথাও দ্বিধা, কোথাও মোটের ওপর অসফল অনিশ্চিত প্রচেষ্টায়; এগুচ্ছে মাঝে মাঝে 'সমাজতন্ত্র' এই নামটার প্রতি এক অতিসতর্ক অবিশ্বাস নিয়ে, সেই সঙ্গে ক্রমশই তার সারবস্তুটিকে আত্মসাৎ করছে সে; এবং এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিকদের একটার পর একটা স্তরে বিস্তৃত হচ্ছে। লণ্ডন ইস্ট-এণ্ডের (৩৯) অনিপুণ মজুরদের তন্দ্রা ঘুচিয়ে দিয়েছে এ আন্দোলন, এবং আমরা সকলেই জানি, প্রতিদানে এই নতুন শক্তিগুলি কী চমৎকার প্রেরণা জুগিয়েছে শ্রমিক শ্রেণীতে। আন্দোলনের গতি যদি কারো অধৈর্যের সমপর্যায়ে না উঠে থাকে তাহলে একথা যেন তাঁরা না ভোলেন যে, ইংরেজ চরিত্রের সেরা গুণগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে শ্রমিক শ্রেণীই, এবং একটা অগ্রসর পদক্ষেপ যদি ইংলণ্ডে একবার অর্জিত হয় তাহলে পরে তা প্রায় কখনো মোছে না। সাবেকি চার্টিস্টদের ছেলেরা যদি পূর্বকথিত কারণে ঠিক বাপকা বেটা হয়ে উঠতে না পেরে থাকে, তবে নাতিরা পূর্বপুরুষদের মান রাখবে বলে আশা করা যায়।

কিন্তু ইউরোপীয় শ্রমিকদের বিজয় শুধু ইংলণ্ডের ওপরেই নির্ভরশীল নয়। সে বিজয় অর্জিত হতে পারে অন্তত ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির সহযোগে (৪০)। শেষোক্ত দুটি দেশেই শ্রমিক আন্দোলন ইংলণ্ডের চেয়ে বেশ এগিয়ে। জার্মানিতে এমনকি তার সাফল্যের দিন এখন হিসাবের মধ্যেও ধরা যায়। গত পঁচিশ বছরে সেখানে তার যে অগ্রগতি ঘটেছে সেটা অতুলনীয়। ক্রমবর্ধমান গতিতে সে এগুচ্ছে। জার্মান মধ্য শ্রেণী যেখানে

রাজনৈতিক দক্ষতা, শৃঙ্খলা, সাহস, উদ্যোগ, অধ্যবসায়ে শোচনীয় অযোগ্যতা জাহির করেছে, জার্মান শ্রমিক শ্রেণী সে ক্ষেত্রে এই সবকটি যোগ্যতারই প্রভূত প্রমাণ দিয়েছে। প্রায় চারশ' বছর আগে ইউরোপীয় মধ্য শ্রেণীর প্রথম উৎসারের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল জার্মানি; অবস্থা এখন যা, তাতে ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের প্রথম মহান বিজয়ের মঞ্চও হবে জার্মানি, এ কি সম্ভাব্যতার বাইরে?

২০ এপ্রিল, ১৮৯২ **ফ. এঙ্গেলস**

এঙ্গেলসের 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' পুস্তকের ইংরেজি সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত; এ বই লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে, একই সঙ্গে ১৮৯২-১৮৯৩ সালের *Die Neue Zeit* পত্রিকায় জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়

ইংরেজী সংস্করণের পাঠ থেকে বাংলা অনুবাদ

ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

১

একদিকে আজকের সমাজের ভেতরে মালিক ও অ-মালিক, পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-বৈর, এবং অন্যদিকে উৎপাদনে বিদ্যমান নৈরাজ্য — মূলত এরই স্বীকৃতির প্রত্যক্ষ পরিণতি হল আধুনিক সমাজতন্ত্র। কিন্তু তত্ত্বগত আকারে আধুনিক সমাজতন্ত্র কায়ালাভ করে উদিত হয় অষ্টাদশ শতকের মহান ফরাসী দার্শনিকদের বর্ণিত নীতির অধিকতর যুক্তিনিষ্ঠ সম্প্রসারণরূপে। বাস্তব অর্থনৈতিক ঘটনায় যতই গভীরে তার মূল নিহিত থাক না কেন, প্রতিটি নতুন তত্ত্বের মতো আধুনিক সমাজতন্ত্রকেও প্রথমে হাতে পাওয়া পূর্বপ্রস্তুত বুদ্ধিমার্গীয় মালমশলার সঙ্গে সংযুক্ত হতে হয়েছিল।

ফরাসী দেশে যে মহাপুরুষেরা আসন্ন বিপ্লবের জন্য মানুষের মন তৈরি করে গেছেন তাঁরা নিজেরাও ছিলেন চরম বিপ্লবী। বাইরেকার কোনো প্রামাণিকতা তাঁরা স্বীকার করেন নি। ধর্ম, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান — কঠোরতম সমালোচনার লক্ষ্য হয় সবকিছুই; যুক্তির বিচারবেদীর সম্মুখে সবকিছুকেই তার অস্তিত্বের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে নতুবা অন্তর্হিত হতে হবে। সবকিছুর একমাত্র মাপকাঠি হয় যুক্তি। হেগেল বলেন, সেসময় বিশ্ব দাঁড়িয়েছিল তার মাথার ওপর*; প্রথমত এই অর্থে যে, মনুষ্য-মস্তিষ্ক

* ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি এই: 'অধিকারের চিন্তা, অধিকারের ধারণা অবিলম্বেই স্বীকৃতি আদায় করে নিল, এর বিরুদ্ধে অন্যায়ের পুরাতন কাঠামো দাঁড়াতে পারল না। সুতরাং, এই অধিকার বোধের ওপর এবার একটা সংবিধানের প্রতিষ্ঠা হল, এখন থেকে সবকিছুরই ভিত্তি হবে তা। সূর্য যবে থেকে আছে আকাশে এবং তাকে ঘিরে ঘুরছে গ্রহ, ততদিনের মধ্যে এ দৃশ্য দেখা যায় নি যে, মানুষ দাঁড়াল তার মাথার

এবং মস্তিষ্কের চিন্তাপ্রসূত নীতিগুলিই দাবি করে নিজেদেরকেই সর্ববিধ মানবিক কর্ম ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি বলে; কিন্তু ক্রমশ এই ব্যাপকতর অর্থেও যে, যে-বাস্তবের সঙ্গে এই নীতির বিরোধ আছে সে-বাস্তবকে বস্তুতপক্ষে উল্টে দিতে হবে। তদানীন্তন সবধরনের সমাজ ও সরকারকে, প্রতিটি প্রাচীন ঐতিহ্যগত ধারণাকে অযৌক্তিক বলে নিক্ষেপ করা হয় আস্তাকুঁড়ে। বিশ্ব এযাবৎ কেবল কুসংস্কার দ্বারা চালিত হয়ে এসেছে; যাকিছু অতীত তা সবকিছুই কেবল অনুকম্পা ও ঘৃণার যোগ্য। এখন এই প্রথম দেখা দিল দিনের আলো, যুক্তির রাজত্ব; এখন থেকে কুসংস্কার, অবিচার, বিশেষাধিকার, নিপীড়নের জায়গা নেবে শাশ্বত সত্য, শাশ্বত অধিকার, প্রকৃতির ভিত্তি থেকে পাওয়া সাম্য এবং মানবের অলঙ্ঘনীয় অধিকার।

এখন আমরা জানি, যুক্তির এই রাজত্বটা বুর্জোয়ার আদর্শায়িত রাজ্য ছাড়া বেশি কিছু নয়; জানি যে, এই শাশ্বত অধিকার রূপায়িত হয়েছে বুর্জোয়া ন্যায়ে; সাম্য পরিণত হয়েছে আইনের চোখে বুর্জোয়া সমানাধিকারে; বুর্জোয়া সম্পত্তি ঘোষিত হয়েছে মানুষের একটি মৌলিক অধিকার হিশেবে; এবং যুক্তির শাসন, রুসোর 'সামাজিক চুক্তি' (৪২) বাস্তব হয়েছে এবং বাস্তব হওয়াই সম্ভব কেবল একটা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র রূপে। অষ্টাদশ শতকের মহামনীষীদের পক্ষে পূর্বতনদের মতোই স্বীয় যুগের সীমা অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু সামন্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে বুর্জোয়ারা অবশিষ্ট সমাজের প্রতিনিধিত্ব দাবি করছিল তাদের বৈরের পাশাপাশি ছিল শোষক ও শোষিত, নিষ্কর্মা ধনী ও গরিব মজুরদের সাধারণ বৈর। এই পরিস্থিতি

ওপর অর্থাৎ ভাবনার ওপর এবং বাস্তবকে নির্মাণ করতে লাগল তার এই ভাবনা অনুযায়ী। আনাক্সেইগরস প্রথম বলেছিলেন, Nous অর্থাৎ যুক্তির শাসনাধীন দুনিয়া। কিন্তু এখন এই সর্বপ্রথম মানুষ এই স্বীকৃতিতে পেঁছিল যে, মানসিক বাস্তবতার শাসিত হওয়া উচিত ভাবনার দ্বারা। সে এক **অপরূপ অরুণোদয়। সমস্ত চিন্তক সত্তাই এই পবিত্র দিনটির উদ্‌যাপনে অংশ নেয়।** একটা **অপূর্ব আবেগে** তখন আন্দোলিত হয় মানুষ, **যুক্তির উদ্দীপনায় বিশ্ব ছেয়ে যায়,** এ যেন এল বিশ্বের সঙ্গে ঐশ্বরিক নীতির মিলনের দিন।' (হেগেল, 'ইতিহাসের দর্শন', ১৮৪০, ৫৩৫ পৃঃ)। — লোকান্তরিত অধ্যাপক হেগেল কর্তৃক এরূপ অন্তর্ঘাতী ও সাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক প্রচারের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনটা (৪১) অবিলম্বে প্রযোজ্য নয় কি? (এঙ্গেলসের টীকা।)

ছিল বলেই বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা শুধু একটা বিশেষ শ্রেণী নয়, সমগ্র নিপীড়িত মানবের প্রতিনিধিরূপে নিজেদের জাহির করতে সমর্থ হয়। অপিচ। জন্ম থেকেই বুর্জোয়া তার বিপরীত (antithesis) দ্বারা ভারাক্রান্ত: মজুরি-খাটা শ্রমিক ছাড়া পুঁজিপতির অস্তিত্ব অসম্ভব, এবং গিল্ডের মধ্যযুগীয় বার্গার যে পরিমাণে আধুনিক বুর্জোয়ারূপে বিকশিত হয় সে পরিমাণেই গিল্ডের কর্মী (journeyman) এবং গিল্ডের বাইরেকার দিন-মজুরেরা পরিণত হয় প্রলেতারিয়েতে। এবং **অভিজাতদের সঙ্গে সংগ্রামে** বুর্জোয়ারা যুগপৎ সে-কালের বিভিন্ন মেহনতী শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব মোটের ওপর দাবি করতে পারলেও বড়ো বড়ো প্রত্যেকটা বুর্জোয়া আন্দোলনেই স্বাধীন বিস্ফোরণ ঘটেছে সেই শ্রেণীটির যারা বর্তমান প্রলেতারিয়েতের কমবেশি পরিণত পুরোধা। দৃষ্টান্ত: জার্মান রিফর্মেশন ও কৃষক যুদ্ধের কালে আনাব্যাপটিস্টরা (৪৩) ও টমাস ম্যুনৎসার, মহান ইংরেজ বিপ্লবে লেভেলাররা (৪৪), মহান ফরাসী বিপ্লবে বাব্যেফ। তখনো অপরিণত একটা শ্রেণীর এই সব বিপ্লবী অভ্যুত্থানের উপযোগী তাত্ত্বিক প্রতিজ্ঞাও ছিল; ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থার ইউটোপীয় ছবি (৪৫); অষ্টাদশ শতকে সত্যিকার কমিউনিস্টসুলভ তত্ত্ব (মরেলি ও মাব্লি)। সাম্যের দাবিটা আর শুধু রাজনৈতিক অধিকারে সীমাবদ্ধ রইল না, তা প্রসারিত হয়ে গেল ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রেও। শুধু শ্রেণীগত বিশেষাধিকার উচ্ছেদ নয়, শ্রেণীভেদেরই অবসান করতে হবে। জীবনের সবকিছু উপভোগ বর্জন করে যোগীসুলভ একধরনের স্পার্টান কমিউনিজম হল এই নতুন মতবাদের প্রথম রূপ। এর পর এলেন তিনজন মহান ইউটোপীয়: সাঁ-সিমোঁ, তাঁর কাছে প্রলেতারীয় আন্দোলনের পাশাপাশি মধ্য শ্রেণীর আন্দোলনেরও একটা তাৎপর্য ছিল; ফুরিয়ে; এবং ওয়েন—ইনি সেই দেশের লোক যেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন সবচেয়ে বিকশিত, তদুদ্ভূত বৈরের প্রভাবে ইনি ফরাসী বস্তুবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে প্রণালীবদ্ধ রূপে শ্রেণীভেদ দূর করার জন্য তাঁর প্রস্তাব প্রণয়ন করেন।

একটা কথা তিনজনের ক্ষেত্রেই সমান। ঐতিহাসিক বিকাশ ইতিমধ্যে যে প্রলেতারিয়েতের সৃষ্টি করেছে তাদের স্বার্থের প্রতিনিধি হয়ে এঁরা কেউ দেখা দেন নি। একটা বিশেষ শ্রেণীর মুক্তি দিয়ে শুরু না করে ফরাসী

জ্ঞানপ্রচারকদের (৪৬) মতো তাঁরা তৎক্ষণাৎ সমগ্র মানবেরই মুক্তি দাবি করেন। তাঁদের মতোই এ'রাও চান যুক্তি ও শাশ্বত ন্যায়ের রাজত্ব স্থাপন করতে, কিন্তু তাঁরা এই রাজত্বটা যেভাবে দেখেছেন সেটার সঙ্গে ফরাসী জ্ঞানপ্রচারকদের আসমান জমিন তফাৎ। কেননা ফরাসী জ্ঞানপ্রচারকদের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া জগৎটাও আমাদের এই তিন সংস্কারকের কাছে সমান অযৌক্তিক ও অন্যায্য এবং সেই কারণে, সামন্ততন্ত্র তথা সমাজের পূর্বতন স্তরগুলির মতোই সত্বর আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপনীয়। বিশুদ্ধ যুক্তি ও ন্যায় যদি এযাবৎ দুনিয়াকে শাসন না করে থাকে, তবে তার একমাত্র কারণ, মানুষ তা সঠিকভাবে বুঝতে পারে নি। দরকার ছিল শুধু এক প্রতিভাধর ব্যক্তির—এবার তার অভ্যুদয় ঘটেছে, সত্য তার করায়ত্ত। এখন যে তার অভ্যুদয় ঘটল, সত্য যে এখনই পরিষ্কার করে বোঝা গেল, সেটা ঐতিহাসিক বিকাশের গ্রন্থি বেয়ে আসা এক অনিবার্য ব্যাপার নয়, নিতান্তই এক শুভ দৈবঘটনা। পাঁচশ' বছর আগেও তার জন্ম হতে পারত এবং সেক্ষেত্রে মানব-সমাজকে পাঁচশ' বছরের ভ্রান্তি, সংঘর্ষ ও ক্লেশ ভুগতে হত না।

আমরা দেখেছি, বিপ্লবের পুরোগামী, অষ্টাদশ শতকের ফরাসী জ্ঞানপ্রচারকরা বিদ্যমান সবকিছুরই একমাত্র বিচারক বলে আবেদন করেন যুক্তির কাছে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে একটা যুক্তিসিদ্ধ সরকার, যুক্তিসিদ্ধ সমাজ; শাশ্বত যুক্তির যাকিছু পরিপন্থী তা সবকিছুকেই নির্মমভাবে বিলোপ করতে হবে। এও দেখেছি যে, আসলে যে অষ্টাদশ শতকের নাগরিক ঠিক সেই সময়টায় বুর্জোয়া হয়ে উঠছিল, তারই আদর্শায়িত বোধ ছাড়া এ শাশ্বত যুক্তি আর কিছুই নয়। ফরাসী বিপ্লবে এই যুক্তিসিদ্ধ সমাজ ও সরকার বাস্তব হয়। কিন্তু নতুন ব্যবস্থা আগেকার অবস্থার তুলনায় যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ হলেও মোটেই পুরোপুরি যুক্তিসিদ্ধ হয়ে উঠল না। যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ পতন হল। রুসোর 'সামাজিক চুক্তি' বাস্তব রূপ পেয়েছিল 'সন্ত্রাসের শাসনে' (৪৭)। নিজস্ব রাজনৈতিক সামর্থ্যে বুর্জোয়ারা বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল, তারা এ থেকে নিস্তার খুঁজল প্রথমে ডিরেক্টরেটের (৪৮) দুর্নীতিপরায়ণতায় এবং শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নীয় স্বৈরাচারের পক্ষপুটে। প্রতিশ্রুত শাশ্বত শান্তি পরিণত হল এক দিগ্বিজয়ের অবিরাম যুদ্ধে।

যুক্তিভিত্তিক সমাজের হালও এ থেকে ভালো হল না। এক সাধারণ সম্পন্নতা সৃষ্টি হয়ে ধনী দরিদ্রের বিরোধ মিটে যাবার বদলে তা তীব্রতর হয়ে উঠল গিল্ড প্রভৃতি সুবিধার অপসারণে—এগুলির ফলে এ বিরোধ খানিকটা চাপা ছিল,—এবং গির্জার দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিলোপে। সামন্ততান্ত্রিক নিগড় থেকে 'সম্পত্তির স্বাধীনতা' অধুনা সত্যই অর্জিত হল এবং ক্ষুদে পুঁজিপতি ও ক্ষুদে কৃষক মালিকদের পক্ষে তা হয়ে দাঁড়াল বৃহৎ পুঁজিপতি ও জমিদারদের বিপুল প্রতিযোগিতায় নিষ্পিষ্ট হয়ে এই সব মহাপ্রভুদের নিকট নিজ নিজ ক্ষুদে সম্পত্তি বিক্রয়ের স্বাধীনতা এবং এইভাবে, ক্ষুদে পুঁজিপতি ও কৃষক মালিকদের দিক থেকে, তা হল 'সম্পত্তি **থেকে** স্বাধীনতা'। পুঁজিবাদী ভিত্তিতে শিল্পের বিকাশের ফলে মেহনতী জনগণের দারিদ্র্য ও ক্লেশই হল সমাজের অস্তিত্বের শর্ত। নগদ টাকা ক্রমশই হয়ে দাঁড়াল, কার্লাইলের বক্তব্য অনুসারে, মানুষে মানুষে একমাত্র সম্পর্ক (sole nexus)। বছরে বছরে বেড়ে উঠল অপরাধের সংখ্যা। আগে সামন্ত পাপাচার প্রকাশ্য দিবালোকে খোলাখুলিই বিহার করত, এখন তারা উৎপাটিত না হলেও অন্তত পক্ষে পেছনে সরে গিয়েছিল। তার জায়গায় এযাবৎ যা গোপনে অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে সেই বুর্জোয়া পাপ আরো সতেজে পল্লবিত হয়ে উঠতে লাগল। ব্যবসা ক্রমশই হয়ে দাঁড়াল প্রবঞ্চনা। বিপ্লবী সূত্রবাণীর (৪৯) 'ভ্রাতৃত্ব' বাস্তবে রূপায়িত হল প্রতিযোগিতা-সংগ্রামের বুজরুকি ও রেষারেষিতে। বলপ্রয়োগে নিপীড়নের জায়গায় এল দুর্নীতি, সমাজ চালাবার প্রথম কল-কাঠি হিশেবে তরবারির জায়গা নিল সোনা। প্রথম রাত্রির অধিকার সামন্ত ভূস্বামীদের হাত থেকে গেল বুর্জোয়া কারখানা-মালিকের কাছে। গণিকাবৃত্তির বৃদ্ধি ঘটল অভূতপূর্ব রকমের। বিবাহ ব্যাপারটাও আগের মতোই গণিকাবৃত্তির আইনত স্বীকৃত একটা আবরণ হয়েই রইল এবং তদুপরি, তার সঙ্গে যুক্ত হল একটা অঢেল ব্যভিচারের স্রোত। সংক্ষেপে, জ্ঞানপ্রচারকদের চমৎকার সব প্রতিশ্রুতির সঙ্গে তুলনা করলে 'যুক্তির বিজয়' থেকে উদ্ভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি হল এক তীব্র নৈরাশ্যকর প্রহসন। অভাব ছিল শুধু সে নৈরাশ্যকে সূত্রবদ্ধ করার মতো মানুষের এবং তারা দেখা দিল শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে। ১৮০২ সালে বেরুল সাঁ-সিমোঁর 'জেনেভা পত্রাবলি', ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হল ফুরিয়ে-র প্রথম রচনা, যদিও

তাঁর তত্ত্বের বনিয়াদ গড়ে ওঠে ১৭৯৯ সালেই; ১৮০০ সালের ১ জানুয়ারি **রবার্ট ওয়েন নিউ ল্যানার্কের (৫০) পরিচালনা গ্রহণ করলেন।**

এসময়ে কিন্তু উৎপাদনের পুঁজিবাদী ধরন এবং সেই সঙ্গে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের বৈর তখনো অতি অসম্পূর্ণ বিকশিত। বৃহৎ শিল্প সদ্য ইংলণ্ডে শুরু হয়েছে, ফ্রান্সে তা তখনো অজানা। কিন্তু বৃহৎ শিল্প একদিকে বাড়িয়ে তোলে এমন সব সংঘাত যাতে উৎপাদনের ধরনে একটা বিপ্লব, তার পুঁজিবাদী চরিত্রের বিলোপ অনিবার্য হয়ে পড়ে—আর এসব সংঘাত ঘটে কেবল তৎসৃষ্ট শ্রেণীগুলির মধ্যেই নয়, তৎসৃষ্ট উৎপাদন-শক্তি এবং বিনিময় রূপের মধ্যেও। এবং অন্যদিকে, এই অতিকায় উৎপাদন-শক্তির অভ্যন্তরেই তা বিকশিত করে তোলে এ সংঘাতগুলির অবসানের উপায়। সুতরাং, ১৮০০ সাল নাগাদ নতুন সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত সংঘাতগুলি যদি সদ্য আকার নিতে শুরু করে থাকে, তাহলে সে সংঘাত অবসানের উপায়ের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশি প্রযোজ্য। 'সন্ত্রাসের শাসন' কালে প্যারিসের সর্বহারা জনগণ মুহূর্তের জন্য প্রভুত্ব পেয়েছিল এবং তার ফলে বুর্জোয়ার **বিপরীতেই** বুর্জোয়া বিপ্লবকে তারা বিজয়ী করে দিতে পারে। কিন্তু তাই করতে গিয়ে তারা শুধু এই প্রমাণ করে যে, তদানীন্তন অবস্থায় তাদের আধিপত্য টিকে থাকা ছিল কী অসম্ভব। এই সর্বহারা জনগণ থেকে নতুন একটা শ্রেণীর কোষ-কেন্দ্র রূপে তখন সেই প্রথম যারা বিবর্তিত হয়ে উঠেছে সেই প্রলেতারিয়েত তখনো স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মে একেবারেই অক্ষম, তারা দেখা দিয়েছে একটা নিপীড়িত, দুঃখী সম্প্রদায় হিশেবে, আত্ম-সাহায্যে অক্ষম হওয়ায় এই সম্প্রদায়কে যদি সাহায্য পেতে হয় তবে সে সাহায্য আসতে পারে বড়ো জোর বাইরে থেকে, নতুবা উপর থেকে।

এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কবলিত হন সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারাও। পুঁজিবাদী উৎপাদনের অপরিণত অবস্থা ও অপরিণত শ্রেণী পরিস্থিতির সহগামী হল অপরিণত তত্ত্ব। অবিকশিত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে যা তখনো সুপ্ত তেমন সব সামাজিক সমস্যার সমাধান ইউটোপীয়রা বার করতে চাইল মনুষ্য-মস্তিষ্ক থেকে। সমাজে অন্যায় ছাড়া আর কিছু নেই, তা দূরীকরণের দায় যুক্তির। সুতরাং, দরকার হল একটা নতুন ও আরো নিখুঁত সমাজব্যবস্থা আবিষ্কার ক'রে তা বাইরে থেকে প্রচারের জোরে এবং যে ক্ষেত্রে

সম্ভব সে ক্ষেত্রে আদর্শ পরীক্ষা চালিয়ে তা সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। এই নতুন সমাজব্যবস্থাগুলি ইউটোপীয় হতে বাধ্য; যতই সবিস্তারে তাদের পরিপূর্ণ করে রচনা করা হতে লাগল ততই বিশুদ্ধ উৎকল্পনায় ভেসে না গিয়ে তাদের উপায় রইল না।

এই কথাগুলো একবার প্রতিষ্ঠার পর প্রশ্নটার এই দিকটা নিয়ে আর কালক্ষেপের প্রয়োজন নেই—এ এখন সবই অতীতের বিষয়। এই যেসব উৎকল্পনায় আজ আমাদের মাত্র হাসি পায়, তার ওপর সগাম্ভীর্যে ঠোকর মেরে এরূপ 'পাগলামির' তুলনায় নিজেদের নিরাভরণ যুক্তির উৎকর্ষ নিয়ে উল্লাস করার কাজটা আমরা ছেড়ে দিতে পারি সাহিত্যিক চুনো পুঁটিদের। আমাদের কথা ধরলে, আমরা বরং সেই সব মহামহীয়ান ভাবনা ও ভাবনার বীজে আনন্দিত, যা তাঁদের উৎকল্পী আবরণ থেকে সর্বত্রই ফেটে বেরিয়েছে এবং যার প্রতি এই কূপমন্ডূকেরা অন্ধ।

সাঁ-সিমোঁ মহান ফরাসী বিপ্লবের সন্তান, এ বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন তাঁর বয়স তিরিশও নয়। এ বিপ্লবে জয় হয় তৃতীয় সম্প্রদায়ের, অর্থাৎ সুবিধাভোগী **অলস** শ্রেণীগুলি, অভিজাত ও যাজকদের ওপর—জয় হয় উৎপাদন ও ব্যবসায় যারা **খাটছে** জাতির সেই বিপুল জনগণের। কিন্তু তৃতীয় সম্প্রদায়ের বিজয় অচিরেই আত্মপ্রকাশ করল এই সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশের স্বীয় বিজয়রূপে, এ সম্প্রদায়ের সামাজিকভাবে সুবিধাভোগী অংশের অর্থাৎ সম্পত্তি-মালিক বুর্জোয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতালাভরূপে। বিপ্লবের ভেতর বুর্জোয়ারা নিশ্চিতই দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠেছিল—অভিজাতদের ও গির্জার যে জমি বাজেয়াপ্ত ক'রে পরে **বিক্রির** জন্য হাজির করা হয় তার ওপর ফাটকাবাজি করে খানিকটা, এবং খানিকটা সেনাবাহিনীর ঠিকাদারি মারফত জাতিকে ঠকিয়ে। এই জুয়াচোরদের আধিপত্যের ফলেই ডিরেক্টরেটের আমলে ফ্রান্স ধ্বংসের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিল এবং নেপোলিয়ন অজুহাত পান কু'দেতার।

সুতরাং, সাঁ-সিমোঁর কাছে তৃতীয় সম্প্রদায় ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যেকার বৈরটা 'কর্মী' ও 'নিষ্কর্মাদের' মধ্যে একটা বৈর আকারে দেখা দেয়। শুধু সাবেকি সুবিধাভোগী শ্রেণী নয়, উৎপাদন ও বণ্টনে অংশ না নিয়ে যারা তাদের আয়ের ওপর বসে খায় তার সকলেই নিষ্কর্মা। 'কর্মী'ও

শুধু মজুরি-খাটা শ্রমিক নয়, কলওয়ালা, বণিক, ব্যাঙ্কার—সকলেই। নিষ্কর্মারা যে বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের সামর্থ্য হারিয়েছে তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল এবং পাকাপাকি স্থির হয়ে যায় বিপ্লবে। সম্পত্তিহীন শ্রেণীগুলিরও যে সে-সামর্থ্য নেই সেটা সাঁ-সিমোঁর মনে হয়েছিল 'সন্ত্রাসের শাসনের' অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। তাহলে পরিচালনা করবে, নায়কত্ব করবে কে? সাঁ-সিমোঁর মতে তা করবে নতুন একটা ধর্মীয় বন্ধনে মিলিত বিজ্ঞান ও শিল্প, এ ধর্মবন্ধনের নির্বন্ধ হল ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার সেই ঐক্য পুনরুদ্ধার করা যা রিফর্মেশনের সময় থেকে নষ্ট হয়ে গেছে,—অবশ্যই অতীন্দ্রিয়বাদী এবং কড়া রকমের সোপানতান্ত্রিক 'নবখ্রীষ্টবাদ'। বিজ্ঞান অর্থে হল পণ্ডিতবর্গ, এবং শিল্প, সে হল সর্বাগ্রে সক্রিয় বুর্জোয়া, কলওয়ালা, বণিক, ব্যাঙ্কার। সাঁ-সিমোঁর অভিপ্রায় ছিল, এ বুর্জোয়াদের অবশ্যই রূপান্তরিত হতে হবে একধরনের জনকর্মচারীতে, সামাজিক অছিদারে; কিন্তু মজুরদের তুলনায় আধিপত্য ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত একটা অবস্থান তাদের তখনো থাকবে। বিশেষ করে ব্যাঙ্কারদের কাজ হবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ ক'রে সমগ্র সামাজিক উৎপাদন পরিচালিত করা। এ ধারণাটা ঠিক তেমন একটা সময়ের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় যখন ফ্রান্সে বৃহৎ শিল্প এবং সেই সঙ্গে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যেকার গহ্বরটা সবে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু সাঁ-সিমোঁ বিশেষ জোর যেখানে দেন সেটা এই: সর্বাগ্রে এবং সর্বোপরি তাঁর ভাবনা ছিল সেই শ্রেণীর ভাগ্য নিয়ে যারা সবচেয়ে সংখ্যাধিক ও সবচেয়ে গরিব ('la classe la plus nombreuse et la plus pauvre')।

'জেনেভা পত্রাবলিতে'ই সাঁ-সিমোঁ প্রস্তাব তুলেছিলেন:

'সমস্ত লোককেই কাজ করতে হবে'।

ঐ রচনায় তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, সন্ত্রাসের শাসন ছিল সম্পত্তিহীন জনগণের শাসন।

তাদের তিনি বলেছেন, 'দ্যাখো, তোমাদের সাথীরা যখন ফ্রান্সে আধিপত্য করে তখন কী দাঁড়ায়; তারা একটা দুর্ভিক্ষ ঘটায়।'

কিন্তু ফরাসী বিপ্লবকে শ্রেণী-যুদ্ধ হিশেবে, শুধু অভিজাত ও বুর্জোয়াদের মধ্যেকার একটা যুদ্ধ নয়, অভিজাত, বুর্জোয়া ও

সম্পত্তিহীনদের মধ্যেকার একটা যুদ্ধ হিশেবে চিনতে পারা ১৮০২ সালের পক্ষে একটা অতি অর্থগর্ভ আবিষ্কার। ১৮১৬ সালে তিনি ঘোষণা করেন, রাজনীতি হল উৎপাদনের বিজ্ঞান, এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন রাজনীতিকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবে অর্থনীতি। অর্থনৈতিক অবস্থা যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বনিয়াদ, এ জ্ঞান এখানে মাত্র ভ্রূণাকারে দেখা দিয়েছে। তবু এ ক্ষেত্রে তখনই যা বেশ পরিষ্কার করে প্রকাশ পেয়েছে সেটা হল এই ধারণা যে, ভবিষ্যতে মানুষের ওপরকার রাজনৈতিক শাসন পরিবর্তিত হবে বস্তুর ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন-প্রক্রিয়ার পরিচালনায়, অর্থাৎ 'রাষ্ট্রের বিলোপে', যা নিয়ে ইদানীং এত সোরগোল চলেছে। সমকালীনদের তুলনায় একই প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় সাঁ-সিমোঁ দেন ১৮১৪ সালে, মিত্রশক্তিদের প্যারিস প্রবেশের ঠিক পরেই*, এবং ফের ১৮১৫ সালে একশ' দিনের (৫১) যুদ্ধের সময় যখন তিনি ঘোষণা করেন, ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের এবং পরে এই দুই দেশের সঙ্গে জার্মানির মৈত্রীই হল ইউরোপের সমৃদ্ধ বিকাশ ও শান্তির একমাত্র গ্যারাণ্টি। ওয়াটার্লু (৫২) যুদ্ধের বিজয়ীদের সঙ্গে মৈত্রীর কথা ১৮১৫ সালে ফরাসীদের কাছে প্রচার করতে হলে যেমন সাহস তেমনি ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টির প্রয়োজন ছিল।

সাঁ-সিমোঁর মধ্যে যদি পাই একটা এমন পরিপূর্ণ ব্যাপক দৃষ্টি যাতে পরবর্তী সমাজতন্ত্রীদের যেসব ধারণা একান্তভাবে অর্থনৈতিক নয় তার প্রায় সবগুলিই তাঁর মধ্যে ভ্রূণাকারে বর্তমান, তাহলে ফুরিয়ের মধ্যে পাব তদানীন্তন সমাজব্যবস্থার একটা খাঁটি ফরাসী চালের সরস সমালোচনা, কিন্তু তাই বলে মোটেই তা কম গভীর নয়। ফুরিয়ে বুর্জোয়াকে, তাদের বিপ্লবপূর্বের অনুপ্রেরিত পয়গম্বর আর বিপ্লবোত্তর স্বার্থান্বেষী চাটুকারদের ধরেছেন তাদের স্বমুখনিঃসৃত উক্তিগুলি দিয়েই। বুর্জোয়া জগতের বৈষয়িক ও নৈতিক দৈন্য তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন নির্মমভাবে। একমাত্র যুক্তি-শাসিত একটা সমাজ, সার্বজনীন সুখের একটা সভ্যতা, মানুষের অসীম একটা পরিপূর্ণতার যে ঝলকিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূর্বতন জ্ঞানপ্রচারকেরা, এবং তাঁর কালের বুর্জোয়া প্রবক্তারা যেসব রঙীন বুলি

* ১৮১৪ সালের ৩১ মার্চ। — সম্পাঃ

আওড়াতেন, তার মুখোমুখি তিনি দাঁড় করিয়ে দেন বুর্জোয়া জগৎটাকে। দেখিয়ে দেন কীভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে অতি উচ্চ বাগাড়ম্বরের সঙ্গে সঙ্গে যায় অতি শোচনীয় বাস্তব এবং বুলির এই অপদার্থ ভণ্ডুলতাকে তিনি বিধ্বস্ত করেছেন জ্বালাময় ব্যঙ্গে। ফুরিয়ে শুধু সমালোচক নন; তাঁর অচঞ্চল প্রশান্ত স্বভাব তাঁকে করে তুলেছে ব্যঙ্গবিদ, এবং নিঃসন্দেহে সর্বকালের সেরা ব্যঙ্গবিদদের অন্যতম। যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুন্দর করে তিনি বর্ণনা করেছেন বিপ্লবের পতনের পর যে জুয়াচুরি ফাটকাবাজির মহোৎসব শুরু হয়, সে সময়কার ফরাসী বাণিজ্যের মধ্যে এবং তারই বৈশিষ্ট্যসূচক যে দোকানদারি মনোবৃত্তি তখন প্রচলিত, তার কথা। এর চেয়েও তাঁর ওস্তাদি নরনারী সম্পর্কের বুর্জোয়া রূপ এবং বুর্জোয়া সমাজে নারীর যে স্থান, তাঁর সমালোচনায়। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন যে, কোনো একটা সমাজের সাধারণ মুক্তির স্বাভাবিক মাপকাঠি হল সে সমাজে নারী মুক্তির মান। কিন্তু সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বোধের ক্ষেত্রেই ফুরিয়ে মহত্তম। এযাবৎ সমাজের সমগ্র ধারাকে তিনি ভাগ করেছেন বিবর্তনের চারটি পর্যায়ে—বন্যতা, পিতৃতন্ত্র, বর্বরতা, সভ্যতা। শেষেরটি হল আজকের তথাকথিত সভ্য বা বুর্জোয়া সমাজ অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী থেকে যে সমাজব্যবস্থা শুরু হয়েছে। তিনি প্রমাণ করেন,

> 'বর্বরতার যুগে যে পাপের অনুষ্ঠান হত সরলভাবে তাদের সবকটিকেই একটা জটিল দ্ব্যর্থক দুমুখো ভণ্ডামির অস্তিত্বে উন্নীত করা হয়েছে সভ্য যুগে';

সভ্যতার গতি একটা 'পাপ চক্রের' মধ্য দিয়ে, বিরোধের মধ্য দিয়ে, যা সে ক্রমাগত সৃষ্টি করে চলেছে অথচ তার সমাধানে অক্ষম; সুতরাং, যা তার অভিপ্রেত অথবা অভিপ্রেত বলে ভান করে ঠিক তার বিপরীতেই সে ক্রমাগত উপনীত হচ্ছে, ফলে দৃষ্টান্তস্বরূপ,

> 'সভ্যতার আমলে **দারিদ্র্যের সৃষ্টি হচ্ছে অতি প্রাচুর্যের মধ্য থেকেই'**।

দেখা যাচ্ছে, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে ফুরিয়ে ঠিক তাঁর সমকালীন হেগেলের মতোই নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন। একই দ্বান্দ্বিকতার ব্যবহার করে তিনি সীমাহীন মানবিক উন্নয়নের বিরুদ্ধে তর্ক তুলেছেন, বলেছেন, প্রত্যেকটা

ঐতিহাসিক পর্যায়েরই যেমন উত্থান তেমনি অবতরণের যুগ বর্তমান, এবং এই সত্যকে প্রয়োগ করেছেন সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে। পৃথিবীর শেষ পরিণাম ধ্বংস, এই ধারণাটি কাণ্ট যেমন আমদানি করেন প্রকৃতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ফুরিয়েও তেমনি ইতিহাস বিজ্ঞানে চালু করেন মনুষ্য জাতির শেষ ধ্বংসের ধারণা।

ফ্রান্সের মাটির ওপর দিয়ে যখন বিপ্লবের ঝড় বয়ে গিয়েছিল, তখন ইংলণ্ডে চলছিল একটা শান্ততর বিপ্লব, যদিও তাই বলে সেটা কম প্রচণ্ড নয়। বাষ্প এবং নতুন নতুন যন্ত্র-তৈরির সরঞ্জামে হস্তশিল্প কারখানা পরিবর্তিত হচ্ছিল আধুনিক বৃহৎ শিল্পে এবং এইভাবে বিপ্লব ঘটাচ্ছিল বুর্জোয়া সমাজের সমগ্র ভিত্তিমূলেই। কারখানা-পর্বের বিকাশের ঢিমেতেতালা গতি পরিণত হল উৎপাদনের একটা সত্যকার ঝটিকাবর্তে। নিয়ত বর্ধমান ক্ষিপ্রতায় চলল বৃহৎ পুঁজিপতি ও নিবৃত্ত প্রলেতারিয়েতে সমাজের ভাঙন। তাদের মাঝখানে, আগেকার স্থিতিশীল মধ্য শ্রেণীর বদলে কারুশিল্পী ও ক্ষুদে দোকানদারদের একটা টলমলে জনপুঞ্জ, জনসংখ্যার সবচেয়ে অস্থির একটা অংশ, কষ্টে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলল।

উৎপাদনের নয়া পদ্ধতি তখন সবে তার উত্থান পর্বের শুরুতে মাত্র; তখনো পর্যন্ত সেটা উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়মিত একটা পদ্ধতিই বটে, তদানীন্তন অবস্থায় সম্ভবপর একমাত্র পদ্ধতি। তাহলেও, তখনই তা থেকে বিপুল সামাজিক অবিচারের সৃষ্টি হয়ে চলেছে—বড়ো বড়ো শহরের সবচেয়ে নিকৃষ্ট সব মহল্লায় গৃহহীন জনতার ভিড়, চিরাচরিত সমস্ত নৈতিক বাঁধন, পিতৃতান্ত্রিক বাধ্যতা, পারিবারিক সম্পর্কের শৈথিল্য; একটা ভয়ঙ্কর মাত্রার অতি মেহনত, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের বেলায়; গ্রাম থেকে শহরে, কৃষি থেকে আধুনিক শিল্পে, জীবনধারণের স্থির অবস্থা থেকে দিন দিন পরিবর্তমান একটা অনিশ্চিত অবস্থায়, একেবারে নতুন একটা পরিস্থিতির মধ্যে সহসা নিক্ষিপ্ত হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর পরিপূর্ণ হতাশা।

এই সন্ধিক্ষণে সংস্কারক হিশেবে এগিয়ে এলেন ২৯ বছর বয়সের এক কারখানা-মালিক, প্রায় অনির্বচনীয় শিশুসুলভ একটা সারল্য তাঁর চরিত্রে, অথচ সেই সঙ্গেই যে মুষ্টিমেয়রা জন-নায়ক হয়েই জন্মায় তাদের একজন। রবার্ট ওয়েন বস্তুবাদী জ্ঞানপ্রচারকদের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, যথা: মানুষের

চরিত্র হল একদিকে বংশগতি এবং অন্যদিকে মানুষের জীবনকালের, বিশেষ করে তার বিকাশকালের পরিবেশের ফল। তাঁর শ্রেণীর অধিকাংশ লোকেই শিল্প বিপ্লবের মধ্যে দেখেছিল কেবল গোলমাল আর বিশৃঙ্খলা, আর ঘোলা জলে মাছ ধরে দ্রুত প্রভূত অর্থোপার্জনের সুবিধা। রবার্ট ওয়েন দেখলেন তাঁর প্রিয় তত্ত্বকে কাছে লাগিয়ে বিশৃঙ্খলার মধ্যে থেকে শৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ। ম্যাঞ্চেস্টারের একটা কারখানায় পাঁচ শতাধিক লোকের সুপারিনটেণ্ডেন্ট হিশেবে এটা তিনি আগেই সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। ১৮০০ থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত তিনি স্কটল্যান্ডের নিউ ল্যানার্কে পরিচালক-অংশীদার হিশেবে একটি বৃহৎ সূতাকলের কাজ চালান সেই একই পদ্ধতিতে, কিন্তু অধিকতর স্বাধীনতা নিয়ে এবং এতটা সাফল্যের সঙ্গে যে ইউরোপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমে যারা ছিল অতি হরেক রকমের একটা দঙ্গল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি নীতিভ্রষ্ট সব লোক, এবং ধীরে ধীরে যাদের সংখ্যা বেড়ে ওঠে ২৫০০-এ, এমন একটা জনতাকে তিনি রূপান্তরিত করেন এক আদর্শ লোকালয়ে, যেখানে মাতলামি, পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট, মোকদ্দমা, দীন আইন (poor laws), ভিক্ষাদান প্রভৃতি ছিল অজানা। এবং তা করেন নেহাৎ লোকগুলোর জন্য একটা মানুষের যোগ্য পরিস্থিতি রচনা ক'রে এবং বিশেষ করে উঠতি ছেলেমেয়েদের সযত্নে লালন ক'রে। শিশুদের বিশেষ বিদ্যালয়ের তিনিই প্রবর্তক, নিউ ল্যানার্কে প্রথমটি তিনি তা চালু করেন। দুই বছর বয়স থেকে ছেলেরা আসত বিদ্যালয়ে, সেখানে তারা এতই আনন্দে থাকত যে, বাড়ি ফিরিয়ে নেওয়া দায় হত। ওয়েনের প্রতিযোগীরা যে ক্ষেত্রে মজুর খাটাত দিন তের-চোদ্দ ঘণ্টা ক'রে, সে ক্ষেত্রে নিউ ল্যানার্কে কাজের দিন ছিল মাত্র সাড়ে দশ ঘণ্টা। তুলার একটা সংকটে যখন চার মাসের জন্য কাজ বন্ধ থাকে, তখনো তাঁর মজুরেরা পুরো মজুরি পেয়ে এসেছে। এবং এসব সত্ত্বেও কারবারের মূল্য দ্বিগুণের বেশি বাড়ে, শেষ পর্যন্ত তা মোটা মুনাফা জুগিয়েছে মালিকদের।

তা সত্ত্বেও ওয়েনের তৃপ্তি ছিল না। তাঁর মজুরদের জন্য তিনি অস্তিত্বের যে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সেটা তাঁর চোখে তখনো মানুষের যোগ্য নয়।

'লোকগুলো আমার করুণানির্ভর ক্রীতদাস।'

অপেক্ষাকৃত অনুকূল যে পরিস্থিতিতে তাদের তিনি বসিয়েছেন তাতে চরিত্রের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ ও যুক্তিসিদ্ধ বিকাশ তখনো হচ্ছিল না, তাদের যোগ্যতার অবাধ অনুশীলন তো আরো কম।

'অথচ এই আড়াই হাজার অধিবাসীর মেহনতী অংশটা রোজ সমাজের জন্য যে পরিমাণ বাস্তব সম্পদ সৃষ্টি করছে তা করতে অর্ধশতকেরও কম আগে দরকার হত ছয় লক্ষ অধিবাসীর মেহনতী অংশের। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, ছয় লক্ষ লোক যে সম্পদ ভোগ করত, সে থেকে এই আড়াই হাজার লোক যা ভোগ করছে তা বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকা উচিত সেটা গেল কোথায়?'*

জবাবটা পরিষ্কার। তা গেছে তিন লক্ষ পাউন্ডের ছাঁকা মুনাফা ছাড়াও কারখানার স্বত্বাধিকারীদের লগ্নী মূলধনের ওপর ৫% পরিশোধ করতে। আর নিউ ল্যানার্কের পক্ষে যেটা খাটে, তা আরো বেশি খাটে ইংলন্ডের সমস্ত ফ্যাক্টরি সম্পর্কেই।

'অযথার্থরূপে প্রযুক্ত হলেও যন্ত্র কর্তৃক এই নতুন সম্পদ যদি না সৃষ্টি হত, তাহলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এবং সমাজের অভিজাত প্রথাকে সমর্থনের জন্য ইউরোপীয় যুদ্ধগুলি চালান যেত না। অথচ এই নতুন শক্তি শ্রমিক শ্রেণীরই সৃষ্টি।'**

এ নতুন শক্তির ফল ভোগের অধিকার সুতরাং তাদেরই। নবসৃষ্ট অতিকায় উৎপাদন-শক্তি এযাবৎ যা ব্যক্তিবিশেষকে ধনী করা ও জনগণকে গোলাম করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তা থেকে ওয়েন পেলেন সমাজ পুনর্নির্মাণের ভিত্তি; সকলের সাধারণ সম্পত্তি হিশেবে এগুলির নির্বন্ধ হল সকলের সাধারণ মঙ্গলের জন্য চালিত হওয়া।

বলা যেতে পারে, ব্যবসায়িক হিসাবের পরিণতিস্বরূপ এই বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বনিয়াদের ওপরেই ওয়েনের কমিউনিজমের ভিত্তি। আগাগোড়া তাঁর এই ব্যবহারিক চরিত্র বজায় থেকেছে। এইভাবে, ১৮২৩ সালে ওয়েন

* 'মনে ও আচরণে বিপ্লব' শীর্ষক একটি স্মারকলিপি থেকে, ২১ পৃষ্ঠা, এটি রচিত হয় 'ইউরোপের সমস্ত রেড রিপাবলিকান, কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের' উদ্দেশে এবং ১৮৪৮ সালের ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকার এবং 'মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁর দায়িত্বশীল উপদেষ্টাদের' নিকট প্রেরিত হয়। (এঙ্গেলসের টীকা।)

** ঐ, ২২ পৃঃ। (এঙ্গেলসের টীকা।)

কমিউনিস্ট উপনিবেশ স্থাপন করে আয়ার্ল্যাণ্ডের দুর্দশা ত্রাণের প্রস্তাব তোলেন এবং তা প্রতিষ্ঠার খরচা, বাৎসরিক ব্যয় ও সম্ভাব্য আয়ের পুরো হিসাব ছকে দেন। ভবিষ্যতের জন্য সুনির্দিষ্ট তাঁর পরিকল্পনায় খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এমন ব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে, ভিতের নকসা, সামনের পাশের এবং উপর থেকে-দেখা দৃশ্য সব সমেত যে, সমাজ সংস্কারের ওয়েন-পদ্ধতি একবার গ্রহণ করলে তার প্রত্যক্ষ খুঁটিনাটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপত্তি করার প্রায় জো নেই।

কমিউনিজমের অভিমুখে পদক্ষেপ করায় জীবনের মোড় ফিরে গেল ওয়েনের। যতদিন তিনি মাত্র মানবহিতৈষী, ততদিন কেবল ধনসম্পদ, সাধুবাদ, সম্মান ও গৌরবের পুরস্কার মিলেছে তাঁর। তিনি ছিলেন ইউরোপের সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তি। শুধু স্বশ্রেণীর লোকেরাই নয়, রাষ্ট্রনেতারা, এমনকি রাজন্যেরাও তাঁর কথা শুনত সপ্রশংসায়। কিন্তু যখন তিনি তাঁর কমিউনিস্ট তত্ত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন, তখন সে তো আলাদা কথা। ওয়েনের মনে হয়েছিল সমাজ সংস্কারের পথ রোধ করে আছে তিনটি বৃহৎ প্রতিবন্ধক: ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ধর্ম ও বর্তমানের বিবাহ প্রথা। জানতেন, এদের আক্রমণ করলে কী তাঁর ভাগ্যে আছে—অবৈধীকরণ, সরকারী সমাজ থেকে বহিষ্কার, সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠার অবসান। কিন্তু এর কোনোটাই ফলাফলের তোয়াক্কা না করে সে আক্রমণ থেকে তাঁকে বিরত করতে পারে নি; এবং যা ভেবেছিলেন তাই ঘটল। সংবাদপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে নীরবতার চক্রান্ত সমেত সরকারী সমাজ থেকে নির্বাসিত হয়ে, আমেরিকায় তাঁর অসফল কমিউনিস্ট পরীক্ষায় নিজের সমস্ত সম্পদ যা ঢেলেছিলেন সেসব খুইয়ে তিনি ফিরলেন সরাসরি শ্রমিক শ্রেণীর দিকে, তাদের মধ্যেই কাজ করে যান তিরিশ বছর। ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে প্রত্যেকটা সামাজিক আন্দোলন, প্রত্যেকটি সত্যকার অগ্রগতির সঙ্গে রবার্ট ওয়েনের নাম জড়িত। পাঁচ বছর সংগ্রামের পর, ১৮১৯ সালে তিনি ফ্যাক্টরিতে নারী ও শিশুদের কাজের ঘণ্টা সীমাবদ্ধ করার প্রথম আইন জোর করে পাশ করিয়ে নেন। ইংলণ্ডের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন যখন একটা বৃহৎ সাধারণ ট্রেড ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ হয় তারই প্রথম কংগ্রেসে তিনি সভাপতিত্ব করেন (৫৩)। সমাজের পরিপূর্ণ কমিউনিস্ট সংগঠনের আগে উৎক্রমণ ব্যবস্থা হিশেবে তিনি একদিকে

প্রবর্তন করেন খুচরা ব্যবসা ও উৎপাদনের জন্য সমবায়-সমিতি। সেদিন থেকে অন্তত এই ব্যবহারিক প্রমাণ এগুলি দিয়ে এসেছে যে, সমাজের দিক থেকে বণিক ও কলওয়ালারা নিতান্ত অনাবশ্যক। অন্যদিকে তিনি প্রবর্তন করেন মেহনত-নোট মারফত মেহনতের ফল বিনিময়ের জন্য মেহনতী বাজার; এই মেহনত-নোটের একক ধরা হয় এক ঘণ্টার কাজ (৫৪); প্রতিষ্ঠানগুলি নিষ্ফল হতে বাধ্য ছিল, কিন্তু অনেক পরবর্তীকালের প্রুধোঁর বিনিময়-ব্যাঙ্কের (৫৫) প্রকল্পটা আগে থেকেই পুরোপুরি আন্দাজ করা হয় এতে,—শুধু এই তফাৎ যে একেই সমাজের সর্ব অকল্যাণের মহৌষধ বলে জাহির না করে বলা হয়েছে সমাজের অধিকতর একটা আমূল বিপ্লবের দিকে তা এক প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

ইউটোপীয় চিন্তাধারা উনিশ শতকের সমাজতন্ত্রী ধ্যান-ধারণাকে দীর্ঘকাল প্রভাবিত করে এসেছে এবং এখনো কিছু কিছু করছে। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফরাসী ও ইংরেজ সমাজতন্ত্রীরা সকলেই তার প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করে এসেছে। ভেইটলিং-এর কমিউনিজম সমেত আগেকার জার্মান কমিউনিজমও ওই একই পন্থার পথিক। এদের সকলের কাছেই সমাজতন্ত্র হল পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায়ের প্রকাশ; আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র নিজের শক্তিতেই তা বিশ্বজয় করবে। এবং পরম সত্য যেহেতু দেশ কাল ও মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশ নিরপেক্ষ, তাই কখন কোথায় সেটা আবিষ্কৃত হবে সেটা মাত্র দৈবের ঘটনা। তা সত্ত্বেও এক-একটা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতার কাছে পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায় এক একরকম। এবং প্রত্যেকের এই বিশেষ প্রকারের পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায় যেহেতু তার সাবজেকটিভ বোধ, জীবনধারণের অবস্থা, জ্ঞানের বহর ও বুদ্ধিমার্গীয় অনুশীলন দ্বারা নির্ধারিত, সেইহেতু পরম সত্যগুলির সংঘাতের শুধু এইটে ছাড়া অন্য পরিণাম অসম্ভব যে, সেগুলি হবে একান্তরূপে পরস্পর পৃথক। এ থেকে শুধু একধরনের পাঁচমিশালী গড়পড়তা সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই বেরবে না এবং বস্তুতপক্ষে তাই আজো পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী-শ্রমিকদের মন আচ্ছন্ন করে আছে। সেই জন্যই জগাখিচুড়ি বেঁধে চলতে দেওয়া হয় মতামতের বহুবিধ সব প্রকারভেদকে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতাদের এমন সব সমালোচনী বিবৃতি, অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ

সমাজ চিত্রের জগাখিচুড়ি, যাতে বিরোধিতা জাগবে সবচেয়ে কম; বিতর্কের স্রোতে এক-একটা উপাদানের সুনির্দিষ্ট তীক্ষ্ন ধারণগুলো যতই নদীর গোল গোল নুড়ির মতো মসৃণ হয়ে উঠবে, সে জগাখিচুড়িও সেদ্ধ হয়ে উঠবে ততই সহজে। সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞানে পরিণত করতে হলে আগে তাকে স্থাপন করা দরকার বাস্তব ভিত্তির ওপর।

২

ইতিমধ্যেই অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দর্শনের পাশাপাশি এবং তারপরে দেখা দিয়েছে নতুন জার্মান দর্শন, যার পরিণতি হেগেলে। এ দর্শনের সবচেয়ে বড়ো গুণ হল যুক্তির উচ্চতম ধরন হিশেবে দ্বান্দ্বিকতার পুনঃপ্রবর্তন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা সকলেই ছিলেন স্বভাবদ্বান্দ্বিক এবং এঁদের মধ্যেকার সবচেয়ে বিশ্বকোষিক মনীষা আরিস্টটল দ্বান্দ্বিক চিন্তার সবচেয়ে মৌলিক রূপগুলির বিশ্লেষণ আগেই করে গেছেন। অন্যপক্ষে, নবতর দর্শনের মধ্যে যদিও দ্বান্দ্বিকতার চমৎকার প্রবক্তারাও ছিলেন (যথা, দেকার্ত, স্পিনোজা), তবু বিশেষ করে ইংরেজদের প্রভাবে তা ক্রমেই তথাকথিত আধিবিদ্যক (মেটাফিজিকাল) যুক্তিপ্রকরণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে— অষ্টাদশ শতকের ফরাসীরাও তার দ্বারা প্রায় পুরোপুরি আচ্ছন্ন হন, অন্ততপক্ষে তাঁদের যে রচনা বিশেষ করে দার্শনিক সেগুলির ক্ষেত্রে। সংকীর্ণ অর্থে যা দর্শন তার বাইরে ফরাসীরা কিন্তু দ্বান্দ্বিকতার সেরা কীর্তি রচনা করেছেন। দিদরোর 'Le Neveu de Rameau' ('রামোর ভাইপো') এবং রুসোর 'Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes' ('মানুষের মধ্যে অসাম্যের উদ্ভব') স্মরণ করলেই যথেষ্ট। এ দুই চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্য এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক।

সাধারণ নিসর্গ বা মানুষের ইতিহাস কিংবা আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়াকলাপ যখন আমরা লক্ষ্য করি ও তাই নিয়ে ভাবি, তখন সর্বপ্রথমে যে ছবিটা আমাদের চোখে পড়ে, তাতে দেখি সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়ার, অসংখ্য বিনিময় (permutations) ও সংযুক্তির (combinations) অন্তহীন বিজড়ন, যেখানে কিছুই যা ছিল, যেখানে ছিল

এবং যেমন ছিল তা থাকে না, সবকিছুই সরে যায়, বদলায়, উদ্ভূত হয় ও লোপ পায়। সুতরাং, প্রথমে আমরা ছবিটা দেখি সমগ্রভাবে, তার আলাদা আলাদা অংশগুলো তখনো মোটের ওপর থাকে পশ্চাৎপটে; এগুচ্ছে, সংযুক্ত হচ্ছে, সম্পর্কিত হচ্ছে যে বস্তুগুলো তাদের বদলে লক্ষ্য পড়ে বরং গতির ওপর, রূপান্তরের ওপর, সম্পর্কপাতের ওপর। বিশ্বের এই প্রাথমিক, সহজ-সরল কিন্তু মূলত সঠিক বোধটা হল প্রাচীন গ্রীক দর্শনের বোধ এবং তা প্রথম পরিষ্কার করে সূত্রবদ্ধ করেন হেরাক্লিটস: সবকিছুই আছে তবু নেই, কারণ সবকিছুই **প্রবহমান**, নিয়ত পরিবর্তমান, নিয়তই তার উদ্ভব ও অন্তর্ধান। কিন্তু ঘটনাবলির এই ছবির সাধারণ চরিত্র সমগ্রভাবে সঠিক প্রকাশ করলেও যেসব খুঁটিনাটি অংশ দিয়ে এ ছবি তৈরি তার ব্যাখ্যার দিক থেকে এ বোধ অপ্রতুল, এবং যতক্ষণ এই সব খুঁটিনাটি আমরা না বুঝছি ততক্ষণ গোটা ছবিটার পরিষ্কার ধারণা হতে পারে না। এই খুঁটিনাটিগুলো বুঝতে হলে প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করে এনে তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করতে হবে, বিচার করতে হবে তার প্রকৃতি, বিশেষ কারণ, ফলাফল ইত্যাদি। মূলত এ কাজ প্রকৃতিবিজ্ঞানের ও ঐতিহাসিক গবেষণার; এগুলি বিজ্ঞানের এমন শাখা যা ক্ল্যাসিক যুগের গ্রীকেরা সুযুক্তিতেই একটা গৌণ জায়গায় ঠেলে রেখেছিল, কারণ এ বিজ্ঞান যা নিয়ে কাজ করবে তার মালমশলা সংগ্রহ করতে হবে আগে। কিছু পরিমাণ প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক মালমশলা সংগ্রহ করার আগে কোনো বিচারমূলক বিশ্লেষণ, তুলনা, এবং শ্রেণী, ধারা ও প্রজাতিরূপে তার বিন্যাস হতে পারে না। যথাযথ প্রকৃতিবিজ্ঞানের (exact natural sciences) ভিত্তি তাই প্রথম রচিত হয় আলেকজেন্ড্রীয় যুগের (৫৬) গ্রীক এবং পরে, মধ্য যুগে, আরবদের দ্বারা। সত্যকারের প্রকৃতিবিজ্ঞানের সূত্রপাত পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং তদবধি নিয়ত বর্ধমান দ্রুততায় তা এগিয়ে গেছে। আলাদা আলাদা অংশে প্রকৃতির বিশ্লেষণ, সুনির্দিষ্ট বর্গে বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও বস্তুর সন্নিবেশ, বহুবিধ রূপের জৈব বস্তুর অভ্যন্তরীণ শারীরস্থান অধ্যয়ন—গত চারশ' বছরে প্রকৃতি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান যে অতিকায় পদক্ষেপে এগিয়েছে তার মূল শর্ত ছিল এইগুলি। কিন্তু কাজের এই পদ্ধতি থেকে প্রাকৃতিক বস্তু ও প্রক্রিয়াকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা, বিপুল সমগ্রটা থেকে

তাকে সম্পর্কচ্যুত করে দেখার একটা অভ্যাসও আমরা ঐতিহ্য হিশেবে পেয়েছি; তাদের দেখা গতির মধ্যে নয় স্থিতির মধ্যে, মূলত পরিবর্তমান বস্তু হিশেবে নয়, স্থির বস্তু হিশেবে, জীবনের মধ্যে নয়, মরণের মধ্যে। বেকন ও লক্ কর্তৃক এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যখন প্রকৃতিবিজ্ঞান থেকে দর্শনে আনীত হল, তখন তা থেকে দেখা দিল গত শতকের বৈশিষ্ট্যসূচক সংকীর্ণ আধিবিদ্যক ধরনের চিন্তা।

যিনি আধিবিদ্যক (metaphysician) তাঁর কাছে বস্তু ও তাদের মানসিক প্রতিচ্ছবি, ভাবনাদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তাদের বিচার করতে হবে একে একে, পরস্পর থেকে আলাদাভাবে, অনুসন্ধান বস্তু হিশেবে এগুলি স্থির অনড় ও চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট। আধিবিদ্যকের চিন্তা একান্তরূপে দুরপনেয় বিপরীতের (antithesis) ধারায়, তাঁহার বাণী, 'ইতি ইতি বা নেতি নেতি, কারণ ইহার অতিরিক্ত যাহা তাহা আসিতেছে শয়তানের নিকট হইতে।'* তাঁর কাছে একটা বস্তু হয় আছে, নয় নেই। একটা বস্তু একই কালে সেই বস্তু ও অন্য বস্তু হতে পারে না। ইতি ও নেতি পরস্পরকে নাকচ করে; কার্য ও কারণের মধ্যে অনড় বৈপরীত্য বর্তমান। প্রথম দৃষ্টিতে এধরনের চিন্তা আমাদের কাছে ভারি ভাস্বর লাগে, কারণ এ হল তথাকথিত পাকা সাধারণ বুদ্ধির কথা। কিন্তু নিজের চার দেয়ালের ঘরোয়া রাজত্বে পাকা সাধারণ বুদ্ধিটাকে বেশ ভদ্রস্থ দেখালেও যেই সে গবেষণার প্রশস্ত দুনিয়ায় পা বাড়ায়, অমনি অতি আশ্চর্য সব কাণ্ডকারখানার মধ্যে পড়তে হয় তাকে। আধিবিদ্যক ধরনের চিন্তা যদিও কতকগুলি ক্ষেত্রে সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়,—নির্দিষ্ট বিচার্য বস্তুটির প্রকৃতি অনুসারে সে ক্ষেত্রের আয়তন বদলায়,—কিন্তু তাহলেও, আজ হোক, কাল হোক, তা একটা সীমায় পেঁছিয়, যার বাইরে গেলেই তা একপেশে সীমাবদ্ধ বিমূর্ত হয়ে পড়ে, সমাধানহীন বিরোধের মধ্যে পথ হারায়। আলাদা আলাদা বস্তুর বিচারে তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা সে ভুলে যায়, অস্তিত্বের বিচারে ভুলে যায় সে অস্তিত্বের শুরু ও শেষের কথা; স্থিতির বিচারে ভোলে গতি; গাছ দেখে, দেখে না অরণ্য।

---

* 'বাইবেল', ম্যাথু, ৫ অধ্যায়, ৩৭ উপবিভাগ।—সম্পাঃ

যেমন দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে আমরা জানি ও বলতে পারি, একটা প্রাণী জীবিত কি মৃত। কিন্তু খুঁটিয়ে বিচারের পর দেখা যাবে যে, বহু ক্ষেত্রেই প্রশ্নটা অতি জটিল, আইনজ্ঞরা তা ভালোই জানেন। মাতৃগর্ভে কোন যুক্তিসিদ্ধ সীমার পর শিশুকে হত্যা করলে সেটা খুন হবে, তা আবিষ্কার করতে তাঁরা বৃথাই মাথা ঠুকেছেন। মৃত্যুর একটা যথাযথ মুহূর্ত নির্ধারণ করাও সমান অসম্ভব, কেননা শারীরবৃত্তে প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত্যু একটা তাৎক্ষণিক, মুহূর্তের ঘটনা নয়, অতি দীর্ঘায়িত একটা প্রক্রিয়া। একইভাবে, প্রতিটি জৈব সত্তাও প্রতিমুহূর্তেই সেই একই সত্তা আবার সে সত্তা নয়ও; প্রতি মুহূর্তে তা বাইরে থেকে পদার্থ আত্মস্থ করছে এবং অন্য পদার্থ পরিত্যাগ করছে; প্রতি মুহূর্তে তার দেহের কোনো কোষের মৃত্যু হচ্ছে, কোনো কোষের জন্ম হচ্ছে; দীর্ঘ বা স্বল্প কালের মধ্যে তার দেহের পদার্থ সম্পূর্ণ নবায়িত হয়ে উঠছে, তার স্থান নিচ্ছে পদার্থের অন্য পরমাণু, ফলে প্রত্যেকটা জৈব সত্তাই সর্বদাই সেই বটে তবু সে নয়। অপিচ, গভীরতর অনুসন্ধানে দেখা যায় যে বিপরীতের দুই মেরু অর্থাৎ সদর্থক ও নঞর্থক প্রান্তদুটি যে পরিমাণ পরস্পরবিরোধী সেই পরিমাণেই অবিচ্ছেদ্য, এবং **যতকিছু** বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট। একই ভাবেই দেখা যায়, কার্য ও কারণ রূপ বোধগুলি শুধু বিচ্ছিন্ন এক-একটা ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেই তবে খাটে, কিন্তু এই আলাদা আলাদা ঘটনাগুলি যেই সামগ্রিক বিশ্বের সঙ্গে সাধারণ সম্পর্কের মধ্যে বিবেচিত হয়, তখনই তারা পরস্পরের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং তা তালগোল পাকিয়ে যায় যখন সেই বিশ্বজনীন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবি, যেখানে কার্য ও কারণ নিয়ত স্থান পরিবর্তন করে চলেছে, ফলে একটা ক্ষেত্রে ও একটা মুহূর্তে যা কার্য, অন্য ক্ষেত্রে ও অন্য মুহূর্তে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় কারণ, তেমনি আবার কারণও হয়ে দাঁড়ায় কার্য।

আধিবিদ্যক যুক্তির কাঠামোর মধ্যে এই সব প্রক্রিয়া ও ভাবনাধারার কোনোটাই আঁটে না। পক্ষান্তরে, দ্বান্দ্বিকতায় বস্তু ও তার প্রতিভূ, ভাবনা অনুধ্যেয় মূল সম্পর্ক, গ্রন্থিপরম্পরা, গতি, উদ্ভব ও অবসানের মধ্যে, উপরে যেসব প্রক্রিয়ার কথা বলা হল তা তার স্বীয় কর্মপদ্ধতিরই কতকগুলি সমর্থন। দ্বান্দ্বিকতার প্রমাণ হল প্রকৃতি, এবং আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের পক্ষ

নিয়ে বলতেই হবে যে, দিন দিন বর্ধমান অতি মূল্যবান মালমশলা দিয়ে এ প্রমাণ সে দাখিল করে চলেছে এবং দেখিয়েছে যে, শেষ বিচারে, প্রকৃতির ক্রিয়া অধিবিদ্যামূলক নয়, দ্বন্দ্বমূলক; নিয়ত পুনরাবৃত্ত একই বৃত্ত পথে চিরকাল সে চলে না, সত্যকার একটা ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই তার যাত্রা। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় ডারউইনের। প্রকৃতির আধিবিদ্যক বোধের বিরুদ্ধে তিনি প্রচণ্ডতম আঘাত হানেন এইটে প্রমাণ করে যে, সমস্ত জৈব সত্তা, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং স্বয়ং মানুষ কোটি কোটি বছরের এক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। কিন্তু দ্বান্দ্বিকভাবে চিন্তা করতে শিখেছেন এমন প্রকৃতিবিদের সংখ্যা খুবই কম; এবং তাত্ত্বিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধুনা যে অশেষ বিভ্রান্তি বর্তমান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, রচয়িতা ও পাঠক সকলের মধ্যেই যে সমান হতাশা দেখা যাচ্ছে, তার কারণ হল চিন্তার পূর্বাভ্যস্ত ধরনের সঙ্গে আবিষ্কৃত ফলাফলগুলির এই সংঘাত।

তাই বিশ্বের, তার বিবর্তনের, মানবজাতির বিকাশের এবং মনুষ্যমনে এ বিবর্তনের যে প্রতিফলন, তার সঠিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে কেবল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে, যাতে জীবন ও মৃত্যুর, অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী পরিবর্তনের অসংখ্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রতি অবিরাম লক্ষ্য রাখা হয়। নতুন জার্মান দর্শন এই প্রেরণাতেই এগিয়েছে। বিখ্যাত সেই প্রাথমিক অভিঘাত (impulse) একবার পাবার পর নিউটনের যে সৌরমণ্ডলী অবিচল ও চিরস্থায়ী তাকে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার, ঘূর্ণ্যমান বাষ্পস্তূপ (nebulous mass) থেকে সূর্য ও গ্রহাদির সৃষ্টিতে পরিণত করে কাণ্ট তাঁর কর্ম শুরু করেন। তা থেকে তিনি সেই সঙ্গে সিদ্ধান্তে টানেন যে, সৌরমণ্ডলের এই যদি উৎপত্তি হয় তাহলে তার ভবিষ্যৎ মৃত্যুও অনিবার্য। অর্ধ-শতাব্দী পরে তাঁর তত্ত্ব গাণিতিকভাবে নিষ্পন্ন করেন লাপ্লাস, এবং তারও অর্ধ-শতাব্দী পর বর্ণালী যন্ত্র (spectroscope) প্রমাণ করে যে, মহাশূন্যে ঘনীভবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই ধরনের ভাস্বর বাষ্পপুঞ্জ বর্তমান।

নতুন এই জার্মান দর্শন পরিণতি পেল হেগেলের তন্ত্রে। এ তন্ত্রে,—এবং এইটেই তার বড়ো গুণ—এই সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, বুদ্ধিমার্গীয়, সমগ্র বিশ্বই উপস্থাপিত হল একটা প্রক্রিয়ারূপে অর্থাৎ, অবিরত গতি, পরিবর্তন, রূপান্তর ও বিকাশরূপে; এবং এই সমস্ত গতি ও বিকাশ

যাতে একটা অখণ্ড সমগ্র হয়ে উঠছে সেই অন্তর্নিহিত সম্পর্ক সন্ধানের চেষ্টা হল। কাণ্ডজ্ঞানহীন হিংসাকর্মের এক উন্দাম ঘূর্ণাবর্ত, পরিণত দার্শনিক বুদ্ধির কাছে যার প্রতিটি কর্মই সমান নিন্দার্হ এবং যতশীঘ্র ভোলা যায় ততই ভালো, এভাবে প্রতিভাত না হয়ে এ দৃষ্টিভঙ্গির কাছে মনুষ্য ইতিহাস প্রতিভাত হল মানুষেরই বিবর্তনের এক প্রক্রিয়ারূপে। নানান পথের মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়ায় ক্রমপ্রগতি অনুসরণ করা ও বাহ্যত আকস্মিক সব ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তার অভ্যন্তরীণ নিয়মটিকে বার করার কাজ এবার বুদ্ধির।

যে সমস্যা উপস্থিত করা হল তার সমাধান যে হেগেলীয় তন্ত্র দেয় নি, সেকথা এখানে অবান্তর। এবং যুগান্তকারী কীর্তি হল এই যে সমস্যাটিকে তা বিবৃত করেছে। এ সমস্যা এমন যে, কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে তার সমাধান দেওয়া অসম্ভব। সাঁ-সিমোঁর মতো হেগেল যদিও তৎকালের এক অতি বিশ্বকোষিক মনীযা, তথাপি প্রথমত, তাঁর স্বীয় জ্ঞানের অনিবার্য সীমাবদ্ধ প্রসারে এবং তাঁর যুগের জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার সীমাবদ্ধ প্রসার ও গভীরতায় তিনি সীমিত। এই সীমাবদ্ধতার সঙ্গে তৃতীয় একটি সীমার কথাও যোগ করতে হবে। হেগেল ছিলেন ভাববাদী। তাঁর কাছে তাঁর মস্তিষ্কমধ্যস্থ ভাবনাগুলি সত্যকার বস্তু ও প্রক্রিয়ার ন্যূনাধিক বিমূর্ত চিত্র নয়, বরং উল্টো, বিশ্বেরও পূর্বে অনাদি কাল থেকে কোথায় যেন অবস্থিত এক 'ভাবের' (Idea) বাস্তবীভূত চিত্রই হল এই বস্তু ও তার বিবর্তন। এধরনের চিন্তায় সবকিছুই একেবারে উল্টো করে দাঁড় করানো হয় এবং বিশ্বের ভেতরকার বস্তুসমূহের আসল সম্পর্কটাকে একেবারে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। আলাদা আলাদা বহু ঘটনাসমষ্টি সঠিকভাবে ও সপ্রতিভায় হেগেল হৃদয়ঙ্গম করলেও সদ্যবর্ণিত কারণে খুঁটিনাটিতে তাতে অনেক কিছুই রয়ে গেছে যা জোড়াতালি, কৃত্রিম, টেনেবুনে করা, অর্থাৎ ভুল। হেগেলীয় তন্ত্রটা এমনিতে একটা বিপুল গর্ভপাত, তবে এ জাতের গর্ভপাত এই শেষ। বস্তুতপক্ষে একটা অন্তর্নিহিত ও অনপনোদনীয় বিরোধিতায় তা পীড়িত। একদিকে তার মূলকথা হল এই বোধ যে, মানবিক ইতিহাস একটা বিবর্তন প্রক্রিয়া, সুতরাং তার প্রকৃতিবশেই কোনো তথাকথিত পরম সত্য আবিষ্কারই তার বুদ্ধিমার্গীয় শেষ কথা হতে পারে না। অথচ অন্যদিকে নিজেকে এই পরম

সত্যেরই মূলাধার বলে তা দাবি জানায়। প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের এই দর্শনতন্ত্র যা সবকিছুকে বিধৃত করছে ও চিরকালের মতো চূড়ান্ত হয়ে থাকছে,—এটা দ্বান্দ্বিক যুক্তির মূল নিয়মেরই বিরোধী। বহির্বিশ্বের নিয়মিত জ্ঞান যে যুগে যুগে বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারে, একথা এ নিয়মে বস্তুতপক্ষে মোটেই নাকচ হয় না, বরং সেইটাই ধরে নেওয়া হয়।

জার্মান ভাববাদের এই মৌলিক স্ববিরোধের বোধ থেকে অনিবার্যই প্রত্যাবর্তন ঘটল বস্তুবাদে কিন্তু, nota bene, নেহাৎ সেই আধিবিদ্যক, অষ্টাদশ শতকের একান্তরূপের যান্ত্রিক বস্তুবাদে নয়। সাবেকি বস্তুবাদের চোখে সমস্ত অতীত ইতিহাস ছিল অযৌক্তিকতা ও জোর-জুলুমের এক কদাকার স্তূপ; আধুনিক বস্তুবাদ তার ভেতর দেখে মানবসমাজের বিবর্তন প্রক্রিয়া এবং সে বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কারই তার লক্ষ্য। অষ্টাদশ শতকের ফরাসীদের কাছে, এমনকি হেগেলের কাছেও, সমগ্রভাবে প্রকৃতির যা বোধ সেটা এই যে, তা সংকীর্ণ, চিরকালের মতো অপরিবর্তনীয় চক্রে ঘূর্ণমান, গ্রহ-তারা সব চিরন্তন—যা শিখিয়েছিলেন নিউটন, এবং তার জীব-প্রজাতির নড়চড় নেই—যা শিখিয়েছিলেন লিনিয়স। আধুনিক বস্তুবাদ ধারণ করে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধুনাতন আবিষ্কারগুলিকে, তাতে ধরা হয় যে প্রকৃতিরও একটা কালগত ইতিহাস আছে, গ্রহ-তারাগুলিরও জন্মমৃত্যু হচ্ছে যেমন জন্মমৃত্যু হচ্ছে জৈব প্রজাতিগুলির, যারা অনুকূল পরিস্থিতিতে বাস নিয়েছে এই সব গ্রহ-তারাতে। এবং সমগ্রভাবে প্রকৃতি যদি বা পুনরাবৃত্ত চক্রেই আবর্তিত বলে এখনো পর্যন্ত ধরতে হয়, তাহলে এ চক্রের আয়তন বেড়ে যাচ্ছে সীমাহীনরূপে। দুদিক থেকেই আধুনিক বস্তুবাদ মূলত দ্বান্দ্বিক; রাণীর মতো বিজ্ঞানের অবশিষ্ট প্রজাদের ওপর প্রভুত্ব করার দাবিদার কোনো একটা দর্শনের প্রয়োজন তার আর নেই। বিশেষ বিশেষ প্রত্যেকটি বিজ্ঞানই যতই বস্তুর এবং আমাদের বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের বিপুল সামগ্রিকতার মধ্যে নিজ নিজ অবস্থান পরিষ্কার করে নিতে বাধ্য, ততই এই সামগ্রিকতা নিয়ে একটা বিশেষ বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় অবান্তর নতুবা অনাবশ্যক। পূর্বতন সমস্ত দর্শনের মধ্য থেকে যেটুকু টিকে থাকে তা হল চিন্তা ও তার নিয়মের বিজ্ঞান—যুক্তি প্রকরণ (formal logic) ও দ্বন্দ্বতত্ত্ব। বাকি সবকিছুই প্রকৃতি ও ইতিহাসের বাস্তব বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

অবশ্য, প্রকৃতিবিষয়ক বোধে বিপ্লব যদিও হওয়া সম্ভব কেবল তদুপযোগী গবেষণালব্ধ সুনির্দিষ্ট মালমশলার অনুপাতে, তাহলেও বেশ আগেই এমন কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল যাতে ঐতিহাসিক বোধের ক্ষেত্রে একটা চূড়ান্ত পরিবর্তন আসে। ১৮৩১ সালে প্রথম শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটে লিয়োঁ-তে, ১৮৩৮-১৮৪২ সালের মধ্যে প্রথম জাতীয় শ্রমিক আন্দোলন, ইংরেজ চার্টিস্টদের আন্দোলন শীর্ষে আরোহণ করে। একদিকে আধুনিক শিল্প এবং অন্যদিকে বুর্জোয়ার নবার্জিত রাজনৈতিক প্রাধান্য যে অনুপাতে বিকাশ পায় সেই অনুপাতে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম পুরোভাগে আসতে থাকে ইউরোপের অতি অগ্রসর দেশগুলির ইতিহাসে। পুঁজি ও মেহনতের সমস্বার্থ, অবাধ প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ সার্বজনীন সামঞ্জস্য ও সার্বজনীন সমৃদ্ধি—বুর্জোয়া অর্থনীতির এই সব শিক্ষাকে ক্রমেই সজোরে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিতে লাগল ঘটনা। এসব ব্যাপারকে আর উপেক্ষা করা চলে না, যেমন উপেক্ষা করা চলে না তাদের তাত্ত্বিক, যদিও অতি অপরিণত প্রকাশ—ফরাসী ও ইংরেজ সমাজতন্ত্রকে। কিন্তু ইতিহাসের পুরনো ভাববাদী যে ধারণা তখনো অপসৃত হয় নি, তার মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে শ্রেণী-সংগ্রামের কোনো জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান ছিল না অর্থনৈতিক স্বার্থের; উৎপাদন তথা সর্ববিধ অর্থনৈতিক সম্পর্ক তার কাছে কেবল 'সভ্যতার ইতিহাসের' আনুষঙ্গিক গৌণ ঘটনা মাত্র।

নতুন তথ্যগুলির ফলে সমস্ত অতীত ইতিহাসের একটা নতুন বিচার আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। তখন দেখা গেল, আদিম পর্যায়গুলি বাদে **সমস্ত** অতীত ইতিহাসই হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস; সমাজের এই যুধ্যমান শ্রেণীগুলিও সর্বদাই উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতি অর্থাৎ তৎকালীন **অর্থনৈতিক** সম্পর্কের ফল; সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটা থেকেই আসছে আসল বনিয়াদ, যা থেকে শুরু করে আমরা একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের আইনী ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা তার ধর্মীয়, দার্শনিক ও অন্যবিধ ভাবধারার সমগ্র উপরিকাঠামোর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা বার করতে পারি। ইতিহাসকে হেগেল মুক্ত করেছিলেন অধিবিদ্যা থেকে, তাকে তিনি দ্বান্দ্বিক করে তোলেন, কিন্তু তাঁর ইতিহাস-বোধ ছিল মূলত ভাববাদী। এবার কিন্তু ভাববাদ বিতাড়িত হল তার শেষ আশ্রয়, ইতিহাসের দর্শন থেকে, এবার

প্রবর্তিত হল ইতিহাসের একটা বস্তুবাদী ব্যাখ্যান, এযাবৎকাল যা হত সেভাবে মানুষের 'সত্তাকে' তার 'জ্ঞান' দিয়ে ব্যাখ্যা না করে 'জ্ঞানকে' তার 'সত্তা' দিয়ে ব্যাখ্যা করার একটা পদ্ধতি পাওয়া গেল।

সেসময় থেকে সমাজতন্ত্র আর কোনো না কোনো প্রতিভাবান মস্তিষ্কের আকস্মিক আবিষ্কার নয়। তা হল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া এই দুই ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত শ্রেণীর ভেতরকার সংগ্রামের আবশ্যিক পরিণাম। যথাসম্ভব নিখুঁত একটা সমাজের বিধান বানানো আর নয়, তার কাজ হল সেই ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক ঘটনা-পরম্পরা অনুধাবন করা যা থেকে এই শ্রেণীগুলো ও তাদের বৈরের অনিবার্য উদ্ভব ঘটেছে এবং এইভাবে গড়ে-ওঠা অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সে সংঘাত দূরীকরণের উপায় বার করা। কিন্তু ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে আগের কালের সমাজতন্ত্রের ততটাই গরমিল যতটা গরমিল দ্বান্দ্বিকতা ও আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে ফরাসী বস্তুবাদীদের প্রকৃতিবিষয়ক বোধের। আগের কালের সমাজতন্ত্র অবশ্যই উৎপাদনের প্রচলিত পুঁজিবাদী পদ্ধতি ও তার ফলাফলের সমালোচনা করেছে। কিন্তু সেটাকে তা ব্যাখ্যা করতে পারে নি সুতরাং এর ওপর প্রাধান্য লাভ করা ছিল তার অসাধ্য। সম্ভব ছিল শুধু মন্দ বলে এগুলিতে বর্জন করা। পুঁজিবাদের আমলে যা অনিবার্য শ্রমিক শ্রেণীর সেই শোষণকে এই পূর্বতন সমাজতন্ত্র যতই সজোরে ধিক্কার দিতে থাকল ততই একথা পরিষ্কার করে বোঝাতে সে অক্ষম হয়ে উঠল, কিসে সেই শোষণ, কীভাবে তার উদ্ভব। কিন্তু সেজন্য দরকার ছিল (১) পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে তার ঐতিহাসিক সম্পর্কের মধ্যে দেখানো, একটা বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে তার অনিবার্যতা এবং সেইহেতু তার অনিবার্য পতনের কথাও উপস্থিত করা, এবং (২) তার মূল চরিত্র উদ্ঘাটন করা, যা তখনো সংগুপ্ত। এ কাজ নিষ্পন্ন হল **বাড়তি মূল্যের** আবিষ্কারে। দেখানো হল যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তদধীনে শ্রমিক শোষণের ভিত্তি হল দাম-না-দেওয়া শ্রমের আত্মসাৎ; বাজার থেকে পুঁজিপতি যদি শ্রমশক্তিকে পণ্য হিশেবে তার পুরো দাম দিয়েই কেনে, তাহলেও সে যে দাম দিচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য নিষ্কাশিত করে নেয়; এবং শেষ বিশ্লেষণে এই বাড়তি মূল্য থেকেই সেই মূল্য-সমষ্টির সৃষ্টি যা দিয়ে মালিক শ্রেণীগুলির হাতে জমে উঠছে

ক্রমবর্ধমান পুঁজির স্তূপ। পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং পুঁজির উৎপাদন উভয়েরই সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা গেল।

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ এবং বাড়তি মূল্য মারফত পুঁজিবাদী উৎপাদনের রহস্য উদ্ঘাটন, এই দুই বিরাট আবিষ্কারের জন্য আমরা **মার্কসের** কাছে ঋণী। এই আবিষ্কারগুলির ফলে সমাজতন্ত্র হয়ে উঠল বিজ্ঞান। পরের কাজ হল তার সবকিছু খুঁটিনাটি ও সম্পর্কপাত বিস্তারিত করে তোলা।

৩

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধের শুরু এই কথা থেকে যে মনুষ্যজীবনের ভরণ-পোষণের উপায়ের উৎপাদন এবং তৎপরে উৎপাদিত বস্তুর বিনিময় — এই হল সমস্ত সমাজ কাঠামোর ভিত্তি, এবং ইতিহাসে আবির্ভূত প্রতিটি সমাজের ধনবণ্টনের ধরন এবং শ্রেণী ও বর্গে সমাজের বিভাগ নির্ভর করে কী উৎপাদন হল, কীভাবে উৎপাদিত হল এবং কীভাবে উৎপন্নের বিনিময় হল, তার ওপর। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের অন্তিম কারণের সন্ধান করতে হবে মানুষের মস্তিষ্কে নয়, চিরন্তন সত্য ও ন্যায় নির্ণয়ে কোনো ব্যক্তির উন্নততর অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে নয়, উৎপাদন-পদ্ধতি ও বিনিময়ের ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে। তার সন্ধান করতে হবে **দর্শনের** মধ্যে নয়, প্রতি যুগের **অর্থনীতির** মধ্যে। প্রচলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি অযৌক্তিক ও অন্যায়, 'যুক্তি যে হয়ে দাঁড়িয়েছে অ-যুক্তি এবং ন্যায় অ-ন্যায়'*, তা কেবল এই প্রমাণ করে যে, উৎপাদন-পদ্ধতিতে ও বিনিময়ের ধরনে অলক্ষ্যে এমন পরিবর্তন ঘটে গেছে যাতে পূর্বতন অর্থনৈতিক অবস্থার উপযোগী সমাজব্যবস্থাটা আর খাপ খাচ্ছে না। তা থেকে আরো দাঁড়ায় যে, উদ্ঘাটিত বৈষম্য থেকে ত্রাণের উপায়ও এই পরিবর্তিত উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যেই ন্যূনাধিক বিকশিত অবস্থায় থাকতে বাধ্য। মূল সব নীতি থেকে অবরোহ পদ্ধতিতে সে উপায়গুলো **উদ্ভাবনীয়**

* গ্যেটের 'ফাউস্ট', ১ম ভাগ, ৪র্থ দৃশ্য ('ফাউস্টের কক্ষ')। — সম্পাঃ

নয়, সেগুলো **উদ্‌ঘাটন করতে** হবে প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার কঠোর সত্যগুলির মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক সমাজতন্ত্রের অবস্থান তাহলে কী?

একথা এখন সকলেই বেশ মানেন, সমাজের বর্তমান ব্যবস্থা আজকের শাসক শ্রেণী বুর্জোয়ার সৃষ্টি। বুর্জোয়ার বৈশিষ্ট্যসূচক উৎপাদন-পদ্ধতি, মার্কসের সময় থেকে যা উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি বলে পরিচিত তা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে, ব্যক্তি বিশেষ, গোটাগুটি এক-একটা সামাজিক বর্গ ও স্থানীয় সঙ্ঘের জন্য সামন্ততন্ত্র যে বিশেষ সুবিধা দিয়েছে তার সঙ্গে তথা সামন্ততন্ত্রের যা সামাজিক কাঠামো সেই বংশগত অধীনতা সম্পর্কের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। বুর্জোয়ারা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে তার ধ্বংসের ওপর বানাল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা,—অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইনের চোখে সমস্ত পণ্য-মালিকদের সমানাধিকার ইত্যাদি পুঁজিবাদী আশীর্বাদের রাজত্ব। তখন থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি স্বাধীনভাবে বিকাশ পেতে পারল। বাষ্প, যন্ত্র এবং যন্ত্রতৈরির যন্ত্র যখন থেকে পুরনো কারখানাকে আধুনিক শিল্পে রূপান্তরিত করে, তখন থেকে বুর্জোয়াদের পরিচালনায় উৎপাদন-শক্তি এমন দ্রুততায় ও এমন মাত্রায় বেড়েছে যা অশ্রুতপূর্ব। কিন্তু তার নিজের যুগে পুরনো কারখানা, এবং সে কারখানার প্রভাবে অধিকতর বিকশিত হস্তশিল্প যেমন গিল্ডের সামন্ত শৃঙ্খলের সঙ্গে সংঘাতে আসে, ঠিক তেমনি আধুনিক শিল্প তার পরিপূর্ণতর বিকাশে এবার সংঘাতে আসছে সেই সব সীমার সঙ্গে যার মধ্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি তাকে আটকে রাখছে। উৎপাদন-শক্তিকে ব্যবহার করার পুঁজিবাদী পদ্ধতিকে ইতিমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে নতুন উৎপাদন-শক্তি। এবং উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-পদ্ধতির এই সংঘাতটা আদিম পাপ বনাম স্বর্গীয় ন্যায়ের মতো একটা সংঘাত নয়, যার উদ্ভব মানুষের মনে। সত্য ঘটনা হিশেবে, বাস্তবে, আমাদের বাইরে, এমনকি যে লোকগুলি এ সংঘাত সৃষ্টি করেছে তাদের অভিপ্রায় ও কর্মের অপেক্ষা না রেখেই এ সংঘাত বর্তমান। আধুনিক সমাজতন্ত্র আর কিছুই নয়—বাস্তব ক্ষেত্রের এই সংঘাতের প্রতিফলন ভাবনার ক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষভাবে যে শ্রেণী তাতে পীড়িত সর্বাগ্রে সেই শ্রমিক শ্রেণীর মানসে সে সংঘাতের এক আদর্শ প্রতিচ্ছবি।

কী নিয়ে এই সংঘাত?

পুঁজিবাদী উৎপাদনের পূর্বে অর্থাৎ মধ্য যুগে উৎপাদনের উপায় মেহনতীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এই ভিত্তিতে ক্ষুদে শিল্পের ব্যবস্থাই ছিল সাধারণভাবে প্রচলিত; গ্রামাঞ্চলে ভূমিদাস বা স্বাধীন ক্ষুদে চাষীর কৃষিব্যবস্থা, শহরে গিল্ডের হস্তশিল্প। শ্রমের সরঞ্জাম—ভূমি, কৃষিযন্ত্র, কর্মশালা, হাতিয়ারপত্র ছিল এক একজনের একক শ্রমের সরঞ্জাম, শুধু একজন শ্রমিকের ব্যবহারেরই তা উপযোগী এবং সেই কারণে স্বভাবতই তা ছিল ক্ষুদ্র, বামনাকার ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু ঠিক ঠিক এই জন্যই সাধারণত উৎপাদকই ছিল তার মালিক। উৎপাদনের এই বিক্ষিপ্ত, স্বল্প উপায়গুলিকে পুঞ্জীভূত করা, পরিবর্ধিত করা, আধুনিক উৎপাদনের প্রবল হাতিয়ারে পরিণত করা—এইটেই ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন ও তার প্রবক্তা বুর্জোয়াদের ঐতিহাসিক ভূমিকা। 'পুঁজি' গ্রন্থের চতুর্থ অংশে মার্কস বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, কীভাবে সরল সমবায়, কারখানা ও আধুনিক শিল্প, এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে তা ঐতিহাসিকভাবে রূপায়িত হয়ে এসেছে ১৫শ শতক থেকে। তাতে আরো দেখানো হয়েছে যে, উৎপাদনের এই সব ক্ষুদে ক্ষুদে উপায়গুলিকে যুগপৎ ব্যক্তির উৎপাদন-উপায় থেকে একমাত্র সমষ্টিগতভাবে পরিচালনীয় সামাজিক উৎপাদন-উপায়ে পরিণত না করে বুর্জোয়ারা সেগুলোকে শক্তিশালী উৎপাদন-শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারত না। চরকা, তাঁত, কামারের হাতুড়ির জায়গায় এল বয়ন-যন্ত্র, শক্তি-চালিত তাঁত, বাষ্প-চালিত হ্যামার; ব্যক্তিগত কর্মশালার জায়গায় এল ফ্যাক্টরি যাতে শত শত, হাজার হাজার মজুরের সহযোগ প্রয়োজন। একই ভাবে, উৎপাদন ব্যাপারটাই একসারি ব্যক্তিগত কর্ম থেকে পরিবর্তিত হল একসারি সামাজিক কর্মে এবং উৎপন্ন দ্রব্য পরিবর্তিত হল ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্যে। ফ্যাক্টরি থেকে এবার যে সুতা, যে কাপড়, যে ধাতু দ্রব্যাদি বেরিয়ে আসতে লাগল তা হল বহু শ্রমিকের মিলিত উৎপাদন, যা পর পর বহু শ্রমিকের হাত ঘুরে এসে তবে তৈরি হয়েছে। কোনো একটা লোক একথা বলতে পারত না, 'এটা **আমি** তৈরি করেছি; এটা **আমার** মাল।'

কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো একটা সমাজে যেখানে উৎপাদনের মূল ধরনটা হল শ্রমের এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত বিভাগ যা কোনো পূর্বপরিকল্পিত ছকের

ওপর নয় এমনিই ধীরে ধীরে এসে পড়েছে, সেখানে উৎপন্নও **পণ্যের** রূপ নেয়, এ পণ্যের পারস্পরিক বিনিময়ে, বেচা-কেনায় ব্যক্তিগত উৎপাদক তার বহুবিধ চাহিদা মেটাতে পারে। এই ছিল মধ্য যুগের অবস্থা। যেমন, কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করত হস্তশিল্পীর কাছে এবং তার কাছ থেকে কিনত হস্তশিল্পজাত সামগ্রী। ব্যক্তিগত উৎপাদক, পণ্য-উৎপাদকদের এই সমাজে চেপে বসল নতুন উৎপাদন-পদ্ধতি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোনো **নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বিনাই** যা গড়ে উঠেছিল এবং সমগ্র সমাজ যার ওপর চলত সেই পুরনো শ্রম-বিভাগের ভেতর এবার এল একটা **নির্দিষ্ট পরিকল্পনার** ভিত্তিতে শ্রম-বিভাগ, যেমন ফ্যাক্টরিতে; **ব্যক্তিগত** উৎপাদনের পাশাপাশি আবির্ভূত হল **সামাজিক** উৎপাদন। দু-ধরনের উৎপাদনই একই বাজারে বিক্রয় হত, সুতরাং অন্তত মোটের ওপর সমান সমান দামে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত শ্রম-বিভাগের চেয়ে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার সংগঠন প্রবলতর। সমষ্টিবদ্ধ ব্যক্তির সংযুক্ত সামাজিক শক্তি নিয়ে কাজ চালানো ফ্যাক্টরিগুলি ব্যক্তিগত ক্ষুদে উৎপাদকদের চেয়ে পণ্য-উৎপাদন করতে লাগল অনেক শস্তায়। শাখার পর শাখায় হার মানতে লাগল ব্যক্তিগত উৎপাদন। সমাজীকৃত উৎপাদন উৎপাদনের সমস্ত পুরনো পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটাল। কিন্তু সেই সঙ্গে তার বিপ্লবী চরিত্রটা এতই কম পরিজ্ঞাত ছিল যে, তা প্রবর্তিত হয় উল্টে বরং পণ্য-উৎপাদনের বৃদ্ধি ও বিকাশের উপায় হিশেবে। উদ্ভবের সময় তা পণ্য-উৎপাদন ও বিনিময়ের কতকগুলি তৈরি ব্যবস্থা পেয়েছিল এবং তা ব্যাপকভাবে কাজে লাগায়, যথা বণিক-পুঁজি, হস্তশিল্প, মজুরি-শ্রম। সমাজীকৃত উৎপাদন এইভাবে পণ্য-উৎপাদনের একটা নবরূপ হিশেবে প্রবর্তিত হওয়ায় অবধারিতভাবেই তার মধ্যে দখলীকরণের পুরনো রূপগুলো পুরো বজায় থাকে এবং তার উৎপন্নের ক্ষেত্রেও তা প্রযুক্ত হয়।

পণ্য-উৎপাদনের বিবর্তনের মধ্যযুগীয় স্তরে শ্রমোৎপন্ন বস্তুর মালিক কে, সে প্রশ্ন উঠতেও পারে নি। নিজেরই কাঁচামাল—সাধারণত তা তার নিজেরই তৈরি—তাই থেকে ব্যক্তিগত উৎপাদক নিজের হাতিয়ারপত্র দিয়ে, নিজের বা পরিবারের মেহনতে তা উৎপন্ন করত। উৎপন্ন বস্তুটা দখল করার কোনো প্রয়োজন উৎপাদকের ছিল না। অবধারিতভাবেই তা ছিল পুরোপুরি তারই জিনিস। সুতরাং, উৎপন্ন বস্তুর উপর তার মালিকানার ভিত্তি হল

তার নিজ শ্রম। যে ক্ষেত্রে বাইরের সাহায্য ব্যবহৃত হত, সেখানেও সাধারণত তার গুরুত্ব থাকত কম, এবং প্রায়শই মজুরি ছাড়া অন্য জিনিস দিয়ে তা পুষিয়ে দেওয়া হত। গিল্ডের শিক্ষানবিস ও কর্মীরা কাজ করত ভরণ-পোষণ ও মজুরির জন্য ততটা নয়, যতটা শিক্ষার জন্য, নিজেরাই যাতে তারা ওস্তাদ হয়ে উঠতে পারে সেই জন্য। তারপর শুরু হল বড়ো বড়ো কর্মশালা ও কারখানায় উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদকদের পুঞ্জীভবন, প্রকৃতই সমাজীকৃত উৎপাদন-উপায় ও সমাজীকৃত উৎপাদক হিশেবে তাদের রূপান্তর। কিন্তু সমাজীকৃত উৎপাদক এবং উৎপাদন-উপায় ও তাদের উৎপন্ন দ্রব্য এ পরিবর্তনের পরেও ঠিক আগের মতোই বিবেচিত হতে লাগল অর্থাৎ ধরা হতে থাকল ব্যক্তিগত উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্য রূপে। এযাবৎকাল মেহনতী সরঞ্জামের মালিকই উৎপন্ন দ্রব্যের দখল নিয়েছে কেননা সাধারণত এটা তারই উৎপন্ন, অন্যের সাহায্যটা ব্যতিক্রম। এবাব মেহনতী সরঞ্জামের মালিকই উৎপন্ন দ্রব্য দখল করতে থাকল, যদিও এটা এখন তার উৎপন্ন নয়, একান্তরূপে অন্যের মেহনত থেকে উৎপন্ন। এইভাবে, সামাজিকভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের দখল পেল না তারা, যারা সত্যিই উৎপাদনের উপায়কে চালু করেছে, যারা সত্যিই পণ্য-উৎপাদন করেছে, দখল পেল পুঁজিপতিরা। উৎপাদনের উপায় তথা উৎপাদনটাই মূলত সমাজীকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু এমন একটা দখলীকরণ প্রথার তা অধীন রইল যাতে এক এক জনের ব্যক্তিগত উৎপাদন স্বীকৃত এবং সেইহেতু, প্রত্যেকেই ছিল তার নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক এবং তা বাজারে আনত। এই রকমের দখলের অধীন হল উৎপাদন-পদ্ধতি, যদিও এ দখলের যে শর্ত তার উচ্ছেদ করে দিয়েছে তা।* এই স্ববিরোধটাই

* দখলের রূপ একই থাকলেই তার চরিত্রে উপরি-বর্ণিত কারণে উৎপাদনের মতোই সমান একটা বিপ্লব যে ঘটে যায় তা এ প্রসঙ্গে দেখানোর তেমন প্রয়োজন নেই। আমি আমার নিজের উৎপন্ন দখল করছি না অন্যের উৎপন্ন দখল করছি, তা অবশ্যই অতি পৃথক দুটো জিনিস। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভ্রূণাকারে সমগ্র পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি যার মধ্যে নিহিত সেই মজুরি-শ্রম অতিশয় প্রাচীন: আপতিক, বিক্ষিপ্ত রূপে তা বহু শতাব্দী যাবৎ দাস-শ্রমের পাশাপাশি থেকেছে। কিন্তু সে ভ্রূণ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে যথারীতি বিকশিত হতে পারল শুধু তখন, যখন প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক পূর্বশর্তগুলি পাওয়া গেল। (এঙ্গেলসের টীকা।)

নতুন উৎপাদন-পদ্ধতিকে পুঁজিবাদী চরিত্র দান করেছে এবং তার মধ্যেই **আজকের সমগ্র সামাজিক বৈরের বীজ নিহিত।** উৎপাদনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এবং সমস্ত উৎপাদনশীল দেশে এই নতুন উৎপাদন-পদ্ধতির আধিপত্য যতই বাড়ছে, যতই তা ব্যক্তিগত উৎপাদনকে এক নগণ্য হতাবশেষে পরিণত করেছে, **ততই পরিষ্কার করে ফুটে উঠেছে সমাজীকৃত উৎপাদনের সঙ্গে পুঁজিবাদী দখলের অসামঞ্জস্য।**

আগেই বলেছি, প্রথম পুঁজিপতিরা বাজারে অন্যান্য রূপের শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে মজুরি-শ্রমও পায় তৈরি অবস্থায়। কিন্তু সে ছিল ব্যতিরেকমূলক, অনুপূরক, সহায়ক, অস্থায়ী মজুরি-শ্রম। কৃষি-মেহনতি কখনো কখনো বা দিন-মজুর হিশেবে খাটলেও কয়েক একর নিজস্ব জমি তার ছিল, যাই ঘটুক না কেন, তা থেকে দুমুঠো জোগাড় করতে পারত সে। গিল্ডগুলির সংগঠন ছিল এমন যে, আজ যে জোগাড়ে কাল সে হত ওস্তাদ। কিন্তু উৎপাদনের উপায় সমাজীকৃত ও পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ সবকিছু বদলে গেল। ব্যক্তিগত উৎপাদকের উৎপাদন-উপায় তথা উৎপন্ন দ্রব্য ক্রমেই হয়ে উঠল মূল্যহীন; পুঁজিপতির অধীনে মজুরি-শ্রমিক হয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় রইল না। কিছু পূর্বে যা ছিল ব্যতিরেক ও সহায়ক, সেই মজুরি-শ্রম হয়ে দাঁড়াল নিয়ম ও সমস্ত উৎপাদনের ভিত্তি; আগে যা ছিল পরিপূরক তাই অবশিষ্ট রইল শ্রমিকদের একমাত্র কর্ম হিশেবে। যারা ছিল অস্থায়ী মজুরি-শ্রমিক তারা হয়ে দাঁড়াল স্থায়ী মজুরি-শ্রমিক। এই স্থায়ী মজুরি-শ্রমিকের সংখ্যা আরো প্রভূত পরিমাণ বেড়ে ওঠে সেসময় সংঘটিত সামন্ত ব্যবস্থার ভাঙনে, সামন্ত প্রভুদের লশকর বাহিনী ভেঙে দেওয়া, বাস্তু-জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ প্রভৃতিতে। একদিকে পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত উৎপাদনের উপায় এবং অন্যাদিকে শ্রমশক্তি ছাড়া যাদের আর কিছুই নেই সেই উৎপাদকেরা, এ দুয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল। **সমাজীকৃত উৎপাদন ও পুঁজিবাদী দখলের মধ্যেকার বিরোধ আত্মপ্রকাশ করল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার বৈর রূপে।**

আমরা দেখেছি, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি ঢুকে পড়ল পণ্য-উৎপাদক, ব্যক্তিগত উৎপাদকদের একটা সমাজের মধ্যে, যাদের সামাজিক বন্ধন ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়। কিন্তু পণ্য-উৎপাদনের ভিত্তিতে গড়া প্রত্যেকটি

সমাজের এই একটা বৈশিষ্ট্য আছে: উৎপাদকেরা তাদের নিজ সামাজিক অন্তঃসম্পর্কের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। যা পাওয়া গেছে তেমনি ধারা উৎপাদনের উপায় দিয়ে এবং বাকি চাহিদা মেটাতে যা দরকার তার বিনিময়ার্থে প্রত্যেকেই উৎপাদন করে তার নিজের জন্য। কেউ জানে না, তার বিশেষ মালটা বাজারে আসবে কতখানি, কী পরিমাণই বা তার চাহিদা হবে। কেউ জানে না, তার স্বীয় উৎপন্ন দ্রব্যটা সত্যকার চাহিদা মেটাবে কিনা, তার উৎপাদন-খরচ সে পুষিয়ে নিতে পারবে কিনা, এমনকি আদৌ তার পণ্যটা বিক্রি হবে কিনা। সমাজীকৃত উৎপাদনে রাজত্ব করে নৈরাজ্য। কিন্তু অন্যান্য প্রতিটি ধরনের উৎপাদনের মতো পণ্য-উৎপাদনেরও কতকগুলি বিশিষ্ট অন্তর্নিহিত অবিচ্ছেদ্য নিয়ম আছে; এবং নৈরাজ্য সত্ত্বেও, নৈরাজ্যের ভেতরে, নৈরাজ্যের মাধ্যমেই এ সব নিয়ম কাজ করে যায়। এ নিয়মগুলো আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক আত্মসম্পর্কের একমাত্র অবিচল রূপে অর্থাৎ বিনিময়ের ক্ষেত্রে এবং প্রতিযোগিতার বাধ্যতামূলক নিয়ম হিশেবে ব্যক্তিগত উৎপাদকদের প্রভাবিত করে। প্রথম দিকে এ নিয়ম উৎপাদকদেরই জানা থাকে না, তা আবিষ্কার করতে হয় ক্রমে ক্রমে, অভিজ্ঞতার ফলে। এ নিয়ম তাই উৎপাদকদের অপেক্ষা না রেখে, তাদেরই বিরুদ্ধে, তাদের বিশেষ বিশেষ উৎপাদনের অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মরূপে কাজ করে যায়। উৎপন্ন শাসন করে উৎপাদকদের।

মধ্যযুগীয় সমাজে, বিশেষ করে আগেকার শতকগুলিতে উৎপাদনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানো। প্রধানত তা মেটাত শুধু উৎপাদক ও তার পরিবারের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত অধীনতা সম্পর্ক যেখানে ছিল, যেমন গ্রামাঞ্চলে, সেখানে তা সামন্ত প্রভুর প্রয়োজনও মেটাতে সাহায্য করত। সুতরাং, এটা বিনিময়ের ব্যাপার ছিল না, উৎপন্নও সেই কারণে পণ্যের রূপ নেয় নি। কৃষক পরিবারটির যা যা প্রয়োজন—কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র তথা তার জীবিকা নির্বাহের উপায়, প্রায় সব তারাই উৎপন্ন করত। নিজের প্রয়োজন মেটানো এবং সামন্ত প্রভুর নিকট ফসলী খাজনা পরিশোধের অতিরিক্ত যখন সে কিছু উৎপাদন শুরু করল, কেবল তখনই সে উৎপাদন করল পণ্য। সামাজিক বিনিময়ের মধ্যে যা এসেছে এবং বিক্রয়ের জন্য যা ছাড়া হয়েছে সেই উদ্বৃত্তটা হয়ে দাঁড়াল পণ্য।

শহরের হস্তশিল্পীদের প্রথম থেকেই পণ্য উৎপাদন করতে হত সত্য। কিন্তু তারাও তাদের নিজ নিজ প্রয়োজনের বেশির ভাগটাই নিজেরা মেটাত। বাগান আর জমি ছিল তাদের। গবাদি পশুপাল তাদের চরত বারোয়ারী বনে, কাঠ আর জ্বালানিও তারা পেত সেখান থেকে। মেয়েরা শণ, পশম বুনত ইত্যাদি। বিনিময়ের জন্য উৎপাদন, পণ্য-উৎপাদন তখনো মাত্র তার শৈশবে। সুতরাং, বিনিময় ছিল সংকুচিত, বাজার সংকীর্ণ, উৎপাদন-পদ্ধতি সুস্থির; বাইরের দিকে ছিল স্থানীয় বিচ্ছিন্নতা, ভিতর দিক থেকে ছিল স্থানীয় ঐক্য; গ্রামাঞ্চলে মার্ক,* শহরে গিল্ড।

কিন্তু পণ্য-উৎপাদনের প্রসার, বিশেষ করে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এযাবৎ যা ছিল সুপ্ত, পণ্য-উৎপাদনের সেই নিয়মগুলি অধিকতর প্রকাশ্যে প্রবলতররূপে সক্রিয় হয়ে উঠল। পুরনো বন্ধন হয়ে গেল শিথিল, বিচ্ছিন্নতার সাবেকি সীমা ভেঙে পড়ল, উৎপাদকেরা ক্রমেই বেশি বেশি পরিবর্তিত হল আলাদা আলাদা স্বাধীন পণ্য-উৎপাদক রূপে। পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, সাধারণ সামাজিক উৎপাদন রয়েছে এক পরিকল্পনাহীনতা, আকস্মিকতা, নৈরাজ্যের শাসনে এবং এ নৈরাজ্য ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু সমাজীকৃত উৎপাদনের এই নৈরাজ্যকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি প্রধান যে উপায়ে তীব্র করে তোলে, সেটা নৈরাজ্যের ঠিক বিপরীত। সে উপায় হল প্রতিটি আলাদা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে একটা সামাজিক বনিয়াদের ওপর উৎপাদনের ক্রমবর্ধিত সংগঠন। এর সাহায্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি সাবেকি শান্তিপূর্ণ সুস্থির অবস্থার অবসান করল। শিল্পের কোনো একটা শাখায় উৎপাদনের এই পদ্ধতির সংগঠন প্রবর্তিত হলেই তা আর অন্য কোনো উৎপাদন-পদ্ধতিকে সেখানে বরদাস্ত করে না। শ্রমক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল রণক্ষেত্র। বিপুল সব ভৌগোলিক আবিষ্কার (৫৭) এবং তার পেছু পেছু উপনিবেশীকরণের ফলে বাজার বর্ধিত হল বহুগুণ, কারখানা-ব্যবস্থা হিশেবে হস্তশিল্পের রূপান্তর ত্বরান্বিত হল। একটা বিশেষ অঞ্চলের বিভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যেই কেবল যুদ্ধ বাধল তা

---

* শেষের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য (এঙ্গেলসের টীকা)। এঙ্গেলস এখানে তাঁর নিজের রচনা 'মার্ক'-এর নজির দিচ্ছেন। এই সংস্করণে তা অন্তর্ভুক্ত হয় নি। — **সম্পাঃ**

নয়। স্থানীয় সংগ্রাম থেকে আবার সৃষ্টি হল জাতীয় সংঘাত, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বাণিজ্যিক যুদ্ধ (৫৮)। পরিশেষে, আধুনিক শিল্প ও বিশ্ববাজারের উন্মুক্তির ফলে এ সংগ্রাম হয়ে উঠল বিশ্বজনীন, এবং সেই সঙ্গে অভূতপূর্ব রকমের বিষাক্ত। উৎপাদনের স্বাভাবিক বা কৃত্রিম পরিস্থিতির সুবিধা দ্বারাই এখন এক একজন পুঁজিপতির তথা গোটা শিল্প ও দেশের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব নির্ধারিত হতে থাকল। যার হার হয় তাকে নির্মমভাবে ঠেলে ফেলা হয়। এ সেই ডারউইনী ব্যক্তির অস্তিত্বের সংগ্রাম প্রচণ্ড হয়ে স্থানান্তরিত হল প্রকৃতি থেকে সমাজে। পশুর পক্ষে অস্তিত্বের যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক তাই যেন হয়ে দাঁড়ায় মানবিক বিকাশের শেষ কথা। সমাজীকৃত উৎপাদন ও পুঁজিবাদী দখলের বিরোধ এবার প্রকাশ পায় **এক-একটা কারখানায় উৎপাদন সংগঠনের সঙ্গে সাধারণভাবে সমাজের উৎপাদন-নৈরাজ্যের বৈর হিসেবে।**

এই দুই রূপে যে বৈর উদ্ভব থেকেই তার মধ্যে নিহিত, তার ভেতরেই পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির গতি। ফুরিয়ে কর্তৃক পূর্বেই আবিষ্কৃত এ 'পাপ চক্র' থেকে তা কখনো বেরতে পারে না। আর তাঁর যুগে ফুরিয়ে যেটা লক্ষ্য করতে পারেন নি সেটা হল এই যে, এ চক্র ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে উঠছে; গতি হয়ে উঠছে ক্রমেই এক সর্পিলবৃত্ত, এবং কেন্দ্রের সংঘর্ষে গ্রহাদির গতির মতো তার অবসান অনিবার্য। সাধারণ সামাজিক উৎপাদনের মধ্যস্থ নৈরাজ্যের বাধ্যকরণী শক্তিতেই বিপুলসংখ্যক মানুষ পুরোপুরি প্রলেতারিয়েতে পরিণত হচ্ছে; এবং ব্যাপক প্রলেতারীয় জনগণই আবার পরিণামে উৎপাদন-নৈরাজ্যের অবসান ঘটাবে। সামাজিক উৎপাদনে নৈরাজ্যের বাধ্যকরণী শক্তিতেই আধুনিক শিল্পে যন্ত্রের সীমাহীন উন্নয়ন পরিণত হচ্ছে এক আবশ্যিক নিয়মে, এর ফলে প্রত্যেকটি শিল্পজীবী পুঁজিপতিকেই তার যন্ত্রকে ক্রমাগত উন্নত করে তুলতে হবে নইলে ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু যন্ত্রের উন্নয়ন অর্থ মানবিক শ্রমের অংশকে অনাবশ্যক করে তোলা। যন্ত্রের প্রবর্তন ও সংখ্যাবৃদ্ধির অর্থ যদি হয়ে থাকে অল্পসংখ্যক যন্ত্র-কর্মী দিয়ে লক্ষ লক্ষ কায়িক শ্রমিকের স্থানচ্যুতি, তাহলে যন্ত্রের উন্নয়নের অর্থ এবার যন্ত্র-কর্মীদেরই ক্রমাগত অপসারণ। পরিণামে এর অর্থ পুঁজির গড়পড়তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত একদল মজুরি-শ্রমিকের সৃষ্টি যাদের হাতের কাছে

পাওয়া যাবে, ১৮৪৫ সালে* যাকে বলেছিলাম, শিল্পের সেই একটা গোটাগ্নুটি মজ্নুদ বাহিনী গঠন, শিল্প যখন খ্নুব চড়া, তখন তাদের পাওয়া যাবে, অনিবার্য ধ্বংস এলেই আবার যাদের ছাঁটাই করা হবে, প্নুঁজির সঙ্গে অস্তিত্বের সংগ্রামে যারা শ্রমিক শ্রেণীর স্কন্ধে এক নিরন্তর ভারস্বর্নপ, প্নুঁজির স্বার্থানুযায়ী একটা নিচু মানে মজ্নুরি নামিয়ে রাখার মতো এক নিয়ন্ত্রক। এইভাবেই, মার্কসের কথায়, শ্রমিক শ্রেণীর বির্নদ্ধে প্নুঁজির সংগ্রামে যন্ত্রই হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে প্রবল অস্ত্র; শ্রমিকের হাত থেকে অনবরতই তার জীবিকার উপায় ছিনিয়ে নেয় শ্রমের যন্ত্র; শ্রমিকেরই যা স্ন্টি তাই হয়ে দাঁড়ায় তাকে অধীনস্থ করার এক হাতিয়ার।** এইভাবেই শ্রম-যন্ত্রের মিতব্যয় সেই সঙ্গে গোড়া থেকেই হয়ে দাঁড়ায় শ্রমশক্তির অতি বেপরোয়া অপচয়, শ্রম-কর্মের সাধারণ পরিস্থিতির ভিত্তিতেই ল্নুণ্ঠন***; যন্ত্র, শ্রম-সময় সংক্ষেপের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, হয়ে দাঁড়ায় প্নুঁজির ম্ল্যব্ন্দ্ধির জন্য শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রতিটি ম্নুহ্নর্তকে প্নুঁজিপতির হাতে তুলে দেবার অতি মোক্ষম উপায়। এইভাবেই কিছ্নু লোকের কর্মহীনতার প্রাথমিক শর্ত হয় অন্য কিছ্নুর অতি মেহনত এবং সারা বিশ্ব জ্নুড়ে নতুন নতুন খরিদ্দার-সন্ধানী আধ্নুনিক শিল্প স্বদেশীয় জনগণের ভোগসীমাকে নামিয়ে আনে অনশন মাত্রার ন্যূনতমে, তাই করতে গিয়ে স্বদেশের নিজ বাজারকেই তা ধ্বংস করে। 'প্নুঁজি সঞ্চয়ের জোর ও ব্যাপকতার সঙ্গে আপেক্ষিক উদ্ব্নত্ত জনতা, বা শিল্পের মজ্নুদ বাহিনীর ভারসাম্য সর্বদাই রক্ষিত হয় যে নিয়মে, তা প্নুঁজির সঙ্গে মজ্নুরকে যতটা কঠিন করে প্রোথিত করে রাখে তা প্রমিথিউসকে পাহাড়ে প্রোথিত করার ভালকানী কীলকের চেয়েও জোরালো। প্নুঁজি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা সঞ্চয় করে তোলে দৈন্য। এক প্রান্তে ধনসঞ্চয় তাই একই সঙ্গে হল অন্য প্রান্তে দৈন্য, শ্রম-জর্জরতা, দাসত্ব, অজ্ঞতা, পাশবিকতা, মানসিক অধঃপতনের সঞ্চয় অর্থাৎ সেই শ্রেণীর ক্ষেত্রে যারা **তাদেরই স্বীয় উৎপন্নকে** উৎপাদন করছে **প্নুঁজির আকারে।'** (মার্কসের 'প্নুঁজি', প্ঃ ৬৭১।) উৎপাদনের প্নুঁজিবাদী পদ্ধতি থেকে এছাড়া অন্য কোনো

* 'ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা', ১০৯ প্ঃ। — সম্পাঃ

** ক. মার্কস, 'প্নুঁজি', ১ খন্ড। — সম্পাঃ

*** ঐ। — সম্পাঃ

উৎপন্ন-বণ্টন আশা করা আর এ আশা করা সমান কথা যে, ব্যাটারির ইলেকট্রোড যতক্ষণ ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত ততক্ষণ অ্যাসিড মেশা জলকে তা বিশ্লিষ্ট করবে না, তার ধনাত্মক মেরু থেকে অক্সিজেন ও ঋণাত্মক মেরু থেকে হাইড্রোজেন ছাড়তে থাকবে না।

আমরা দেখেছি, আধুনিক শিল্প-যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নশীলতা সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্যের দ্বারা পরিণত হয়েছে এমন একটা বাধ্যতামূলক নিয়মে যাতে একেক জন শিল্পজীবী পুঁজিপতি সর্বদাই তার যন্ত্রকে উন্নত করতে, সর্বদাই সে যন্ত্রের উৎপাদনী ক্ষমতা বাড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়। উৎপাদনক্ষেত্র প্রসারের সম্ভাবনাটাও তার কাছে অনুরূপ একটা বাধ্যতামূলক নিয়মে দাঁড়ায়। আধুনিক শিল্পের বিপুল সম্প্রসারণ-শক্তির কাছে গ্যাসের সম্প্রসারণ-শক্তিকে মনে হয় ছেলেখেলা, এ শক্তি এখন আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় গুণগত ও পরিমাণগত সম্প্রসারণের এমন এক আবশ্যকতা রূপে যা কোনো বাধারই পরোয়া করে না। এ বাধা আসে পরিভোগ থেকে, বিক্রয় থেকে, আধুনিক শিল্প-মালের বাজার থেকে। কিন্তু বাজারের সম্প্রসারণ-ক্ষমতা ব্যাপকতায় ও তীব্রতায় শাসিত হয় প্রধানত অন্য কতকগুলি নিয়মে, যার তেজ অনেক কম। উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে বাজারের সম্প্রসারণ তাল রাখতে পারে না। সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে, এবং উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতিকে চূর্ণবিচূর্ণ না করা পর্যন্ত যেহেতু এই সংঘাত থেকে কোনো সত্যকার সমাধান সম্ভব নয়, তাই সংঘাতগুলো আসতে থাকে পর্যায়ক্রমে। পুঁজিবাদী উৎপাদন জন্ম দিল আর একটি 'পাপ চক্রের'।

বস্তুতপক্ষে, ১৮২৫ সালে যখন প্রথম সাধারণ সংকট দেখা দেয়, তখন থেকে সমগ্র শিল্প ও বাণিজ্যজগৎ, সমস্ত সভ্য জাতি ও তাদের মুখাপেক্ষী ন্যূনাধিক বর্বর জাতিদের উৎপাদন ও বিনিময় প্রতি দশ বছরে একবার করে বিকল হয়ে পড়ে। বাণিজ্য অচল হয়ে যায়, বাজারে অত্যধিক মাল সরবরাহ হয়, মাল জমতে থাকে, যতই তা অবিক্রেয় ততই তা স্তূপাকার, নগদ টাকা অদৃশ্য হয়, ঋণদান থেমে যায়, বন্ধ হয়ে যায় ফ্যাক্টরি আর শ্রমিক জনগণের জীবনধারণের উপায়ের অভাব ঘটে, কেননা জীবনধারণের উপায় তারা উৎপন্ন করেছে অতিমাত্রায়; একের পর এক দেউলিয়া, একের পর এক ক্রোক।

অচলাবস্থা চলে কয়েক বছর ধরে; উৎপাদন-শক্তি ও উৎপন্ন মালের অপচয় ও পাইকারীভাবে তার ধ্বংস চলতে থাকে যতদিন না সঞ্চিত পণ্যস্তূপের মোটের ওপর মূল্যহ্রাস হয়ে শেষ পর্যন্ত তা ঝরে যায়, যতদিন না উৎপাদন ও বিনিময় ধীরে ধীরে আবার চলতে শুরু করে। একটু করে তার গতি বাড়ে। শুরু হয় দুলকি চলন। শিল্পের দুলকি চলন বেড়ে ওঠে ধাবনে এবং ধাবনও পরিণত হয় শিল্প, কারবারী ঋণ ও ফাটকার এক খাঁটি উদ্দাম কদমে ছোটায়, শেষ পর্যন্ত পড়িমড়ি লম্ফঝম্পের পর সেখানে এসেই থামে যেখানে শুরু, অর্থাৎ সংকটের গহ্বরে। এই চলে ফিরে ফিরে। ১৮২৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচবার এই ঘটেছে এবং বর্তমানে (১৮৭৭) ছয়বারের বার তা ঘটছে। এসব সংকটের চরিত্র এতই পরিষ্কার যে ফুরিয়ে crise pléthorique বা রক্তাতিশয্যের সংকট বলে প্রথম সংকটটির যা বর্ণনা দিয়েছেন তাতেই সব সংকটের বর্ণনা হয়েছে।

এসব সংকটে সমাজীকৃত উৎপাদন ও পুঁজিবাদী দখলের বিরোধ এক প্রবল বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। পণ্য-সঞ্চালন কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়। সঞ্চালনের যা মাধ্যম, সেই মুদ্রা হয়ে দাঁড়ায় সঞ্চালনের প্রতিবন্ধক। পণ্য-উৎপাদন ও পণ্য-সঞ্চালনের সমস্ত নিয়মই উল্টে যায়। অর্থনৈতিক সংঘাত পেঁছয় তার শীর্ষ বিন্দুতে। **উৎপাদনের পদ্ধতি বিদ্রোহ করে বিনিময় ধরনের বিরুদ্ধে।**

ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরে উৎপাদনের সমাজীকৃত সংগঠন এত দূর বিকশিত হয়েছে যে, সমাজ উৎপাদনের যে-নৈরাজ্য থাকে তারই পাশাপাশি ও তার ওপর প্রভুত্ব করে, তার সঙ্গে তা আর খাপ খাচ্ছে না। এই ঘটনাটা খোদ পুঁজিপতিদের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে সংকট কালে পুঁজির হিংস্র পুঞ্জীভবনের মাধ্যমে, বহু বৃহৎ এবং বহুতর ক্ষুদ্র পুঁজিপতির ধ্বংসে। উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতির সমগ্র ঠাট ভেঙে পড়ে তারই নিজস্ব সৃষ্টি উৎপাদন-শক্তির চাপে। এই পুঞ্জ পুঞ্জ উৎপাদন-উপায়কে তা আর পুঁজিতে পরিণত করতে সক্ষম হয় না। সেগুলো পড়ে থাকে বেকার হয়ে এবং সেইহেতু শিল্পের মজুদ বাহিনীও থাকে বেকার। উৎপাদনের উপায়, জীবিকা নির্বাহের উপায়, পুঁজির হাতের আওতায় শ্রমিক, উৎপাদনের ও সাধারণ সম্পদের সমস্ত উপকরণই রয়েছে প্রচুর। কিন্তু 'প্রাচুর্য হয়ে দাঁড়ায় অভাব-

অনটনের উৎস' (ফুরিয়ে), কারণ উৎপাদন ও জীবনধারণের উপায়ের পুঁজিতে রূপান্তরের প্রতিবন্ধক হয় এই প্রাচুর্যই। কেননা, পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপায় কাজ চালাতে পারে কেবল তখনই যখন তার প্রাথমিক রূপান্তর ঘটেছে পুঁজিতে, মানুষের শ্রমশক্তি শোষণের উপায়ে। উৎপাদন ও জীবন নির্বাহের উপায়কে পুঁজিতে রূপান্তরিত করার এই আবশ্যিকতা প্রেতের মতো শ্রমিক ও এই সব উপায়ের মধ্যে দণ্ডায়মান। কেবল এইটাই উৎপাদনের বৈষয়িক ও ব্যক্তিগত কারিকার সম্মিলনে বাধা দেয়; কেবলমাত্র তার জন্যই উৎপাদন-উপায়ের সচল থাকা, শ্রমিকের খেটে বেঁচে থাকা বারণ। তাই একদিকে, এই উৎপাদন-শক্তিকে আর বেশি পরিচালনা করার অক্ষমতায় পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি নিজেই অভিযুক্ত; অন্যদিকে, এই সব উৎপাদন-শক্তি ক্রমবর্ধমান তেজে এগিয়ে আসছে বর্তমান বিরোধের অবসানের দিকে, পুঁজি হিশেবে তাদের যে ধর্ম তা বিলোপের দিকে, **সামাজিক উৎপাদন-শক্তি হিশেবে তাদের যে চরিত্র তার ব্যবহারিক স্বীকৃতির দিকে।**

পুঁজি হিশেবে তাদের যে ধর্ম তার বিরুদ্ধে ক্রমপ্রবল উৎপাদন-শক্তির এই বিদ্রোহ, তাদের সামাজিক চরিত্র স্বীকৃত হোক, এই ক্রমবর্ধমান দাবির ফলে খাস পুঁজিপতি শ্রেণীও বাধ্য হয় তাদের ক্রমেই বেশি করে সামাজিক উৎপাদন-শক্তি হিশেবে ধরতে, পুঁজিবাদী পরিস্থিতির মধ্যে তা যতটা সম্ভব সেই পরিমাণে। বড়ো বড়ো পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের ভাঙন মারফত ধ্বংসের সময় যতটা, ঋণ ব্যবস্থায় অসীম স্ফীতি সমেত শিল্পের অতি চাপের পর্বটাতেও ততটাই বিপুল উৎপাদন-উপায়সমূহের সেই ধরনের একটা সমাজীকরণ ঘটাবার প্রবণতা থাকে, যা আমরা বিভিন্ন জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিতে প্রত্যক্ষ করছি। উৎপাদন ও বণ্টনের এই উপায়সমূহের অনেকগুলিই গোড়া থেকেই এতই বিরাট যে, রেলওয়ের মতোই তাতে অন্যবিধ পুঁজিবাদী শোষণের অবকাশ মেলে না। আরো বিকাশের এক পর্যায়ে এই ধরনটাও অপ্রতুল হয়ে দাঁড়ায়। একটা বিশেষ দেশের একটা বিশেষ শিল্প-শাখার সমস্ত বড়ো বড়ো উৎপাদকেরা সংঘবদ্ধ হয় 'ট্রাস্টে', উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা সমিতিতে। উৎপাদ্যের মোট পরিমাণ তারা স্থির করে, নিজেদের মধ্যে তা ভাগাভাগি করে নেয় এবং এইভাবে আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা বিক্রয়মূল্য চাপিয়ে দেয়। কিন্তু কারবারে মন্দা পড়তেই

এই ধরনের ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণত ভেঙে পড়া সম্ভব এবং ঠিক এই কারণেই সমিতিগুলির আরো বেশি পরিমাণ কেন্দ্রীভবনের প্রয়োজন তা জাগায়। এক-একটা শিল্পের সবখানিই পরিণত হয় এক অতিকায় জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিতে; অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার স্থান নেয় এই একটি কোম্পানির অভ্যন্তরীণ একচেটিয়া কারবার। তা ঘটেছে ১৮৯০ সালে ইংলন্ডের অ্যালক্যালি উৎপাদনের ক্ষেত্রে, ৪৮টি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান একীকরণের পর তা এখন একটি কোম্পানির হাতে, ৬০ লক্ষ পাউন্ড মূলধন নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে একটি একক পরিকল্পনার ভিত্তিতে।

ট্রাস্টগুলিতে প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা পরিণত হয় ঠিক তার বিপরীতে — একচেটিয়া কারবারে; এবং পুঁজিবাদী সমাজসুলভ বিনা-পরিকল্পনার উৎপাদন নতিস্বীকার করে আসন্ন সমাজতান্ত্রিক সমাজসুলভ নির্দিষ্ট পরিকল্পনার উৎপাদনের কাছে। অবশ্যই তাতে এখনো পর্যন্ত পুঁজিপতিদেরই সুবিধা ও উপকার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শোষণটা এত জাজ্বল্যমান যে তা ভেঙে পড়তে বাধ্য। ট্রাস্টগুলির উৎপাদন-পরিচালনা, ক্ষুদ্র একদল ডিভিডেণ্ট-লিপ্সু দ্বারা সমাজের এমন নির্লজ্জ শোষণ কোনো জাতিই সহ্য করবে না।

যাই হোক না কেন, ট্রাস্ট থাকুক বা না থাকুক, পুঁজিবাদী সমাজের সরকারী প্রতিনিধি রাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের পরিচালনভার গ্রহণ করতে হবে* নিজের হাতে। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিবর্তনের এই প্রয়োজন

* বলছি **'করতে হবে'** কেননা, উৎপাদন ও বণ্টনের উপায় যখন **সত্য করেই** জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিগুলি কর্তৃক পরিচালনের কাঠামোকে ছাড়িয়ে যাবে, এবং সেইহেতু তাদের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ যখন **অর্থনৈতিকভাবে** অনিবার্য হবে, কেবল তখনই যদি সে-কাজ আজকের এই রাষ্ট্রই করে তাহলেও, — ঘটবে একটা অর্থনৈতিক প্রগতি, সমস্ত উৎপাদন-শক্তির সমাজীকরণের দিকে প্রাথমিক আরো একটা পদক্ষেপ। কিন্তু ইদানীং, বিসমার্ক যখন থেকে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয় মালিকানা চালু করতে লেগেছেন, তখন থেকে একধরনের মেকি সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে, যা থেকে থেকেই একধরনের দাস্যবৃত্তিতে অধঃপতিত হচ্ছে, যা ঘোষণা করে, এমনকি বিসমার্কী ধরন সমেত **যে কোনো** রাষ্ট্রীয় মালিকানাই সমাজতান্ত্রিক। তামাক-শিল্প রাষ্ট্র দখল করলে যদি তা সমাজতান্ত্রিক হয়, তাহলে নিশ্চয়ই নেপোলিয়ন ও মেটেরনিখকে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে গণ্য করতে হবে। বেলজিয়ম রাষ্ট্র যদি নিতান্ত সাধারণ রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে

সর্বাগ্রে দেখা দেয় যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলিতে — ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, রেলে।

আধুনিক উৎপাদন-শক্তির পরিচালনায় বুর্জোয়ারা আর সক্ষম নয়, এই যদি প্রকাশ পায় সংকট থেকে, তবে উৎপাদন ও বণ্টনের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলির জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি, ট্রাস্ট, ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয় সে কাজের জন্য বুর্জোয়ারা কী পরিমাণ অনাবশ্যক। পুঁজিপতির সামাজিক ক্রিয়ার সবকটিই এখন নির্বাহিত হয় বেতনভোগী কর্মচারী দ্বারা। ডিভিডেণ্ট পকেটস্থ করা, কুপন কাটা আর বিভিন্ন পুঁজিপতি যেখানে পরস্পরের পুঁজি হরণ করে সেই স্টক এক্সচেঞ্জে ফাটকা খেলা ছাড়া পুঁজিপতির আর কোনো সামাজিক কর্ম নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি প্রথমে বিতাড়িত করে মজুরদের; এখন তা বিতাড়িত করছে পুঁজিপতিদের, মজুরদের মতোই তাদেরও ঠেলে দিচ্ছে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার স্তরে, যদিও শিল্পের মজুর বাহিনীতে অবিলম্বেই নয়।

কিন্তু জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি ও ট্রাস্টে, অথবা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রূপান্তর, এর কোনোটাতেই উৎপাদন-শক্তির পুঁজিবাদী চরিত্রের অবসান হয় না। জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি ও ট্রাস্টে তা স্বতঃই স্পষ্ট। আর আধুনিক রাষ্ট্রও আবার শ্রমিক তথা ব্যক্তিবিশেষ পুঁজিপতির হামলার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির বাহ্য পরিস্থিতিকে রক্ষা করার জন্য বুর্জোয়া সমাজ কর্তৃক পরিগৃহীত একটা সংগঠন মাত্র। রূপ যাই হোক না কেন,

---

তার প্রধান রেলপথ নিজেই নির্মাণ করে; কোনো অর্থনৈতিক বাধ্যতার ফলে নয়, নিতান্তই যুদ্ধের সময় অনায়াসে হাতে রাখা যাবে বলে, সরকারের পক্ষে ভোটদায়ী গড্ডলিকারূপে রেলকর্মচারীদের গড়ে তোলার জন্য, এবং বিশেষ করে পার্লামেণ্টারী ভোটের তোয়াক্কা না রেখে নিজের জন্য একটা নতুন আয়ের উৎস তৈরির উদ্দেশ্যে যদি বিসমার্ক প্রধান প্রধান প্রুশীয় রেলপথ রাষ্ট্রায়ত্ত করেন, তাহলে কোনো অর্থেই, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে তা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয় না। নইলে, রাজকীয় Seehandlung (৫৯), রাজকীয় চীনামাটি-কারখানা, এমনকি সৈন্যবাহিনীর দর্জি-প্রতিষ্ঠানকেও বলতে হয় সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, এমনকি তৃতীয় ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্মের রাজত্বকালে এক ধূর্ত শৃগাল যা গুরুত্বসহকারে প্রস্তাব করেছিল, রাষ্ট্র কর্তৃক বেশ্যালয়গুলি গ্রহণের সে ব্যাপারটা পর্যন্ত হয় সমাজতান্ত্রিক। (এঙ্গেলসের টীকা।)

আধুনিক রাষ্ট্র হল মূলত একটি পুঁজিবাদী যন্ত্র, পুঁজিপতিদের রাষ্ট্র, সামগ্রিক জাতীয় পুঁজির আদর্শ মূর্তায়ন। উৎপাদন-শক্তিকে যতই সে হাতে নিতে যায়, ততই সে সত্য করেই হয়ে ওঠে জাতীয় পুঁজিপতি, তত বেশি অধিবাসীকে তা শোষণ করতে থাকে। শ্রমিকেরা থেকেই যায় মজুরি-শ্রমিক, প্রলেতারীয়। পুঁজিবাদী সম্পর্কের অবসান হয় না বরং তাকে চূড়ান্ত শীর্ষে তোলা হয়। কিন্তু চূড়ান্ত শীর্ষে ওঠাতেই তা উল্টে পড়ে। উৎপাদন-শক্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানা সংঘাতের সমাধান নয়, কিন্তু সে সমাধানের যা উপকরণ সেই টেকনিকাল শর্ত তার মধ্যেই লুক্কায়িত।

এ সমাধান সম্ভব কেবল আধুনিক উৎপাদন-শক্তির সামাজিক চরিত্রের বাস্তব স্বীকৃতিতে, এবং সেইহেতু, উৎপাদন-উপায়ের সমাজীকৃত চরিত্রের সঙ্গে উৎপাদন, দখল ও বিনিময় পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধানে। সামগ্রিকভাবে সমাজের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্য সমস্ত নিয়ন্ত্রণকে যা ছাপিয়ে উঠেছে সেই উৎপাদন-শক্তিকে প্রকাশ্যে ও সরাসরি সমাজের হাতে নিয়েই কেবল তা সম্ভব। উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক চরিত্রটা আজ উৎপাদকের বিরুদ্ধে সক্রিয়, সমস্ত উৎপাদন ও বিনিময়কে তা থেকে থেকেই বানচাল করে দেয়, অন্ধ বলাশ্রয়ী বিধ্বংসী এক প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই শুধু তার ক্রিয়া। কিন্তু সমাজ কর্তৃক উৎপাদন-শক্তিগুলিকে গ্রহণের পর উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক চরিত্রের ব্যবহার উৎপাদকেরা করবে তার প্রকৃতিটা পুরোপুরি বুঝে, বিঘ্ন ও পর্যায়ক্রমিক ধ্বংসের উৎস না হয়ে তা হবে উৎপাদনের প্রবলতম এক উত্তোলক।

সক্রিয় সামাজিক শক্তিগুলি কাজ করে ঠিক প্রাকৃতিক শক্তির মতোই; যতক্ষণ তাদের না বুঝছি, হিসাবে না মেলাচ্ছি, ততক্ষণ তা অন্ধ, বলাশ্রয়ী, বিধ্বংসী। কিন্তু একবার তাদের যদি বোঝা যায়, একবার যদি তাদের ক্রিয়া, গতিমুখ ও ফলাফল ধরা যায়, তাহলে তাদের ক্রমাগত আমাদের আজ্ঞাবহ করে তোলা, তাদের সাহায্যে আমাদের লক্ষ্যসাধন করাটা নির্ভর করছে আমাদেরই ওপর। আজকের পরাক্রান্ত উৎপাদন-শক্তিগুলির ক্ষেত্রে একথা বিশেষ করেই খাটে। এই সব সক্রিয় সামাজিক উপায়গুলির প্রকৃতি ও চরিত্র বুঝতে আমরা যতক্ষণ গোঁয়ারের মতো অনিচ্ছুক — এ বোধ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি ও তার সমর্থকদের প্রবণতার বিরুদ্ধেই যায় —

ততক্ষণ এ শক্তিগুলি কাজ করে যাবে আমাদের অপেক্ষা না রেখেই, আমাদের বিরুদ্ধে, ততক্ষণ তারা আধিপত্য করে যাবে আমাদের ওপর, পূর্বে যা আমরা বিশদে দেখিয়েছি। কিন্তু একবার যদি তাদের প্রকৃতি বোঝা যায়, তাহলে একত্রে-খাটা উৎপাদকদের হাতে তাদের পরিণত করা যায় দানবপ্রভু থেকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যে। তফাৎটা হল বজ্রস্থ বিদ্যুতের ধ্বংসশক্তির সঙ্গে টেলিগ্রাফ ও ভল্টেইক আর্কের বশীভূত বিদ্যুতের তফাৎ, দাবাগ্নির সঙ্গে মানুষের কাজে লাগানো আগুনের তফাৎ। শেষ পর্যন্ত আজকের উৎপাদন-শক্তিগুলির আসল চরিত্রের এই স্বীকৃতির ফলে উৎপাদনের সামাজিক নৈরাজ্যের স্থান নেয় নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে, সমাজ ও প্রতিটি ব্যক্তির প্রয়োজনানুযায়ী উৎপাদনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। উৎপন্ন দ্রব্য যেখানে প্রথমে উৎপাদককে ও পরে দখলকারীকে দাসত্ববন্ধনে বাঁধে, দখলের সেই পুঁজিবাদী পদ্ধতির জায়গায় তখন আসে দখলের এমন এক পদ্ধতি, আধুনিক উৎপাদন-উপায়ের চরিত্র যার ভিত্তি: একদিকে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া ও বাড়িয়ে তোলার উপায়স্বরূপ প্রত্যক্ষ সামাজিক দখল, এবং অন্যদিকে জীবিকা নির্বাহ ও উপভোগের উপায়স্বরূপ প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত দখল।

পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি জনসংখ্যার বিপুল অধিকাংশকে ক্রমেই পরিপূর্ণ প্রলেতারিয়েতে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তির সৃষ্টি করে যা নিজের ধ্বংস ঠেকাবার জন্যই এ বিপ্লব সাধন করতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যেই যা সমাজীকৃত হয়ে উঠেছে, সেই বিপুল উৎপাদন-উপায়কে ক্রমাগত বেশি করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে বাধ্য করার সঙ্গে সঙ্গে তা নিজেই এ বিপ্লব সাধনের পথ দেখায়। **প্রলেতারিয়েত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ক'রে উৎপাদন-উপায়কে পরিণত করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতেই।**

কিন্তু তা করতে গিয়ে প্রলেতারিয়েত হিশেবে তার আত্মাবসান ঘটে, লুপ্ত হয় সমস্ত শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী-বৈর, রাষ্ট্রের রাষ্ট্র হিশেবে যে অস্তিত্ব তাও বিলুপ্ত হয়। শ্রেণী-বৈরের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের এযাবৎ প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রের, অর্থাৎ pro tempore যা শোষক শ্রেণী, তেমন একটা বিশেষ শ্রেণীর এক সংগঠনের, প্রচলিত উৎপাদন-পরিস্থিতিতে যাতে বাইরে থেকে কোনো ব্যাঘাত না আসে, সেটা নিবারণই তার উদ্দেশ্য, এবং সুতরাং, বিশেষ করে নির্দিষ্ট উৎপাদন-পদ্ধতির (ক্রীতদাসত্ব, ভূমিদাসত্ব, মজুরি-শ্রম) সহগামী

পীড়ন ব্যবস্থার মধ্যে শোষিত শ্রেণীগুলিকে সবলে দাবিয়ে রাখাই তার উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র ছিল সামগ্রিকভাবে সমাজের সরকারী প্রতিনিধি, একটা দৃষ্টিগোচর প্রতিভূ হিশেবে তার কেন্দ্রীভাব। কিন্তু তা শুধু যে পরিমাণে, তা তেমন একটা শ্রেণীর রাষ্ট্র যা তৎকালে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে: প্রাচীন কালে ক্রীতদাসমালিক নাগরিকদের রাষ্ট্র; মধ্য যুগে সামন্ত প্রভুদের; আমাদের কালে বুর্জোয়াদের। রাষ্ট্র যখন অবশেষে সমগ্র সমাজের সত্যকার প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা নিজেকে করে তোলে অনাবশ্যক। অধীনে রাখার মতো কোনো সামাজিক শ্রেণী যেই আর থাকে না, যেই শ্রেণী-শাসন এবং আমাদের বর্তমান উৎপাদন-নৈরাজ্যের ভিত্তিতে অস্তিত্বের জন্য ব্যক্তিগত সংগ্রাম ও তদ্ভূত সংঘর্ষ ও অনাচারের অবসান হয়, অমনি দমন করার মতো কিছুও আর বাকি থাকে না, এবং একটা বিশেষ দমন-শক্তির, একটা রাষ্ট্রের আর প্রয়োজন হয় না। প্রথম যে কাজটার ফলে রাষ্ট্র সত্য করেই নিজেকে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি করে তোলে — সমাজের নামে উৎপাদন-উপায়গুলিকে দখল করা — সেইটাই হল একই কালে রাষ্ট্র হিশেবে তার শেষ স্বাধীন কাজ। সামাজিক সম্পর্কে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্রে অনাবশ্যক হয়ে উঠতে থাকে এবং তারপর নিজে থেকেই তা শুকিয়ে মরে। লোক শাসন করার স্থানে আসে বস্তুর ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ার পরিচালনা। রাষ্ট্রকে 'উচ্ছেদ' করা হয় না, **তা মরে যায়।** 'মুক্ত জনরাষ্ট্র'* কথাটিকে আন্দোলকেরা যে মধ্যে মধ্যে ন্যায্যতই ব্যবহার করে থাকেন, সেদিক থেকে এবং তার অন্তিম বৈজ্ঞানিক অপূর্ণতা, উভয় দিক থেকেই কথাটার মূল্যায়ন পাওয়া যাচ্ছে; এ থেকে, অবিলম্বে রাষ্ট্র উচ্ছেদের জন্য তথাকথিত নৈরাজ্যবাদীদের দাবিটারও ।

পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির ঐতিহাসিক আবির্ভাবকাল থেকেই বিভিন্ন ব্যক্তি তথা বিভিন্ন সম্প্রদায় সমস্ত উৎপাদন-উপায়ের ওপর সামাজিক দখলের স্বপ্ন দেখে এসেছেন ন্যূনাধিক অস্পষ্টভাবে, ভবিষ্যতের আদর্শ হিশেবে। কিন্তু তা সম্ভব হতে পারে, ঐতিহাসিক রূপে আবশ্যিক হয়ে উঠতে পারে শুধু তখনই যখন তার বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ অবস্থা বর্তমান। অপরাপর

* এই সংস্করণের ৯ খণ্ড, ২৮-৩৩, ৩৯-৪১ পৃঃ। — সম্পাঃ

প্রতিটি সামাজিক প্রগতির মতোই তা সম্ভবপর হয় এই জন্য নয় যে, লোকে বুঝতে পারছে, শ্রেণীর অস্তিত্ব ন্যায়, সমানাধিকার ইত্যাদির পরিপন্থী, এ শ্রেণী-বিলোপের ইচ্ছা দ্বারাই কেবল নয়, সম্ভবপর হয় কতকগুলি নতুন অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে। শোষক ও শোষিত শ্রেণী, শাসক ও নিপীড়িত শ্রেণীতে সমাজের বিভাগ ছিল পূর্বতন কালের উৎপাদনের অপরিণত সীমাবদ্ধ বিকাশের অপরিহার্য পরিণাম। সকলের অস্তিত্বের জন্য কোনো ক্রমে যেটুকু দরকার তার চেয়ে কেবল অতি অল্পপরিমাণ উদ্বৃত্ত যতদিন উৎপন্ন হচ্ছে সমগ্র সামাজিক মেহনত দ্বারা, সেইহেতু সমাজ-সদস্যদের বিপুল অধিকাংশের সমস্ত বা প্রায় সমস্ত সময় যতদিন খেয়ে যাচ্ছে মেহনতের পিছনে, — ততদিন অনিবার্যভাবেই এ সমাজ বিভক্ত থাকছে শ্রেণীতে। পুরোপুরি মেহনতের যারা বাঁধা গোলাম, সেই বিপুল অধিকাংশের পাশাপাশি উদিত হয় প্রত্যক্ষ উৎপাদনী শ্রম থেকে মুক্ত একটা শ্রেণী, যারা সমাজের সাধারণ বিষয়গুলির দেখাশোনা করে, যেমন শ্রম-পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় কর্ম, আইন, বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদি। সুতরাং, শ্রম-বিভাগের নিয়মটাই আছে শ্রেণী-বিভাগের মূলে। কিন্তু তাতে করে বলাৎকার ও লুণ্ঠন, বুজরুকি ও জুয়াচুরি দ্বারা এই শ্রেণী-বিভাগ সম্পাদন আটকায় না। শাসক শ্রেণী একবার আধিপত্য পাবার পর শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিনিময়ে তার ক্ষমতা সংহত করা, নিজেদের সামাজিক নেতৃত্বটাকে জনগণের তীব্রতর শোষণে পরিণত করা তার আটকায় না।

কিন্তু এই যুক্তিতে শ্রেণী-বিভাগের যদি একটা বিশেষ ঐতিহাসিক ন্যায্যতা থেকে থাকে, তবে তা শুধু একটা বিশেষ পর্বের জন্য, কেবল একটা নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতির আমলে। তার ভিত্তি ছিল উৎপাদনের অপ্রতুলতা। আধুনিক উৎপাদন-শক্তির পূর্ণ বিকাশের ফলে তা ভেসে যাবে। এবং বস্তুত, সমাজের শ্রেণী-বিলোপে ঐতিহাসিক বিকাশের এমন একটা মাত্রা ধরে নেওয়া হয়, যেখানে অমুক অমুক বিশেষ শাসক শ্রেণী কেবল নয়, যে কোনো রকম শাসক শ্রেণীরই এবং সেইহেতু, শ্রেণীভেদের অস্তিত্বই হয়ে উঠেছে এক অপ্রচলিত কাল-ব্যতিক্রম। সুতরাং, তা ধরে নেয় উৎপাদনের এমন একটা পর্যায়ে বিকাশ, যেখানে সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণী কর্তৃক উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের দখল এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রভুত্ব,

সংস্কৃতির একাধিপত্য ও বুদ্ধিমার্গীয় নেতৃত্ব শুধু যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে তাই নয়, অর্থনীতি, রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে বিকাশের প্রতিবন্ধক। এ সীমায় এখন আমরা পেঁছেছি। বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিমার্গীয় দেউলিয়াপনা স্বয়ং বুর্জোয়াদের কাছেও আর গোপন নয়। তাদের অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার আবির্ভাব ঘটছে নিয়মিতভাবে প্রতি দশ বছর অন্তর। প্রতিটি সংকটেই সমাজ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠছে তারই উৎপাদন-শক্তি ও উৎপন্নের চাপে—তাকে সে আর ব্যবহার করতে পারছে না, অসহায়ের মতো সে এই অদ্ভুত স্ববিরোধের সম্মুখীন যে, উৎপাদকদের ভোগ্য কিছুই নেই কেননা পরিভোগী কেউ নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি যে নিগড় চাপিয়েছিল তা ফেটে বেরচ্ছে উৎপাদন-উপায়ের সম্প্রসারণী শক্তি। উৎপাদন-শক্তির অবিরাম, নিয়ত ত্বরান্বিত বিকাশ এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনেরই কার্যত সীমাহীন বৃদ্ধির একমাত্র পূর্বশর্ত হল এই সব নিগড় থেকে উৎপাদন-উপায়ের মুক্তি। শুধু তাই নয়। উৎপাদন-উপায়ের ওপর সামাজিক দখলের ফলে শুধু যে উৎপাদনের বর্তমান কৃত্রিম বাধাগুলি দূর হয়ে যায় তাই নয়, দূর হয় উৎপাদন-শক্তি ও উৎপন্নের সেই প্রত্যক্ষ অপচয় ও সর্বনাশ, যা বর্তমানে উৎপাদনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ এবং সংকটকালে যা সর্বোচ্চে ওঠে। অধিকন্তু, আজকের শাসক শ্রেণী ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কান্ডজ্ঞানহীন অমিতাচারের অবসান ক'রে তা উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্নের একটা বড়ো অংশকে উন্মুক্ত করে দেয় সাধারণ সমাজের জন্য। সমাজীকৃত উৎপাদন দ্বারা সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য বৈষয়িকভাবে পর্যাপ্ত এবং দিন দিন পরিপূর্ণতর একটা অস্তিত্বই শুধু নয়, সকলের কায়িক ও মানসিক বৃত্তির অবাধ বিকাশ ও প্রয়োগের নিশ্চিতি-দেওয়া একটা অস্তিত্ব অর্জনের যে সম্ভাবনা, তা এই প্রথম এলেও **এসে গেছে।***

---

* পুঁজিবাদী চাপের তলেও আধুনিক উৎপাদন-উপায়ের বিপুল সম্প্রসারণী শক্তির একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে গোটাকতক সংখ্যা থেকে। মিঃ গিফেনের মতে, গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যান্ডের মোট সম্পদের পরিমাণ পূর্ণসংখ্যায়:

১৮১৪ সাল—২,২০,০০,০০,০০০ পাউন্ড

১৮৬৫ সাল—৬,১০,০০,০০,০০০ পাউন্ড

সমাজ কর্তৃক উৎপাদনের উপায় দখলের পর অবসান হয় পণ্য-উৎপাদনের এবং যুগপৎ উৎপাদকের ওপর উৎপন্নের আধিপত্যের। সামাজিক উৎপাদনে নৈরাজ্যের বদলে আসে প্রণালীবদ্ধ সুনির্দিষ্ট সংগঠন। ব্যক্তিগত অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম অন্তর্হিত হয়। একটা বিশেষ অর্থে তখনই সেই প্রথম মানুষ অবশিষ্ট প্রাণীজগৎ থেকে চূড়ান্তভাবে তফাৎ হয়ে অস্তিত্বের নিতান্ত পাশবিক পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হয় সত্যকার মানবিক পরিস্থিতিতে। জীবনধারণের যে ক্ষেত্রটা মানুষকে ঘিরে আছে এবং এযাবৎ তার ওপর আধিপত্য করেছে, সেই সমগ্র ক্ষেত্রটা এখন আসে মানুষের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণে — এই প্রথম মানুষ হয়ে ওঠে প্রকৃতির সত্যকার সচেতন প্রভু, কেননা নিজেদের সমাজ-সংগঠনের প্রভু সে হতে পেরেছে। তারই নিজ সামাজিক ক্রিয়ার যে নিয়ম এতদিন পরকীয় প্রাকৃতিক নিয়মের মতো তার ওপর আধিপত্য করেছে, তা এখন ব্যবহৃত হবে পরিপূর্ণ বোধের সঙ্গে, এবং সেইহেতু তার ওপর প্রভুত্ব করবে মানুষ। মানুষেরই নিজ যে সামাজিক সংগঠন এতদিন প্রকৃতি ও ইতিহাস থেকে চাপানো এক আবশ্যিকতা রূপে তার সম্মুখীন হয়েছে, সে সংগঠন এখন হয়ে দাঁড়ায় তারই স্বাধীন কর্মের ফল। যে বহির্ভূত বিষয়গত শক্তিগুলি এতদিন ইতিহাসকে শাসন করেছে, তা চলে আসে মানুষেরই নিয়ন্ত্রণের অধীনে। শুধু সেই সময় থেকেই ক্রমাগত সচেতনভাবে মানুষই রচনা করবে তার স্বীয় ইতিহাস, কেবল সেই সময় থেকেই মানুষ যে সামাজিক কারণগুলিকে গতিদান করবে সেগুলি প্রধানত এবং ক্রমবর্ধমান পরিমাণে তারই বাঞ্ছিত ফলপ্রসব করবে। এ হল আবশ্যিকতার রাজ্য থেকে মুক্তির রাজ্যে মানুষের উত্তরণ।

আমাদের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সংক্ষেপ রূপরেখার সারসংকলন করা যাক।

১৮৭৫ সাল—৮,৫০,০০,০০,০০০ পাউন্ড

সংকটকালে উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্নের অপচয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৭৩-১৮৭৮ সালের সংকটে কেবল জার্মান লোহ-শিল্পেরই মোট ক্ষতির পরিমাণ ২,২৭,৫০,০০০ পাউন্ড বলে দ্বিতীয় জার্মান শিল্প-কংগ্রেসে (বার্লিন, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮) উল্লিখিত হয়। (এঙ্গেলসের টীকা।)

১। **মধ্যযুগীয় সমাজ** — ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তিগত উৎপাদন। উৎপাদনের উপায় ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী; সেইহেতু আদিম, কদাকার, নগণ্য, ক্রিয়া তাদের খর্বিত। হয় স্বয়ং উৎপাদক নয় তার সামন্ত প্রভুর আশু ভোগের জন্য উৎপাদন। এই ভোগের ওপর যদি কখনো একটা উদ্বৃত্তি ঘটে, কেবল তখনই সে উদ্বৃত্তিটা বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয়, বিনিময়ের মধ্যে আসে। সুতরাং, পণ্য-উৎপাদন নিতান্ত তার শৈশবে। তবু তখনই তার মধ্যে ভ্রূণাবস্থায় নিহিত **সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্য।**

২। **পুঁজিবাদী বিপ্লব** — প্রথমে সরল সমবায় ও হস্তশিল্প কারখানার সাহায্যে শিল্পের রূপান্তর। এযাবৎ বিচ্ছিন্ন উৎপাদন-উপায়গুলির বড়ো বড়ো কারখানার মধ্যে কেন্দ্রীভবন। ফলস্বরূপ, ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক উৎপাদন-উপায়ে তাদের রূপান্তর — এ রূপান্তরে বিনিময়ের ধরন মোটের ওপর অপ্রভাবিত। দখলের পূর্বতন রূপগুলিই বলবৎ। **পুঁজিপতির** উদয়। উৎপাদন-উপায়ের মালিক হিশেবে সে উৎপন্নকেও দখল করে এবং তাকে রূপান্তরিত করে পণ্যে। উৎপাদন হয়ে দাঁড়ায় একটা **সামাজিক** কাজ। বিনিময় ও দখল থেকেই যায় **ব্যক্তিগত** কাজ, এক-একটা ব্যক্তির ব্যাপার। **সামাজিক উৎপন্ন দখল করে ব্যক্তি পুঁজিপতি।** মৌলিক বিরোধ, তা থেকে অন্য সবকিছু বিরোধের উদয়, যার মধ্য দিয়ে চলেছে আমাদের সমাজ এবং আধুনিক শিল্প যা উদ্ঘাটিত করছে।

ক) উৎপাদনের উপায় থেকে উৎপাদকের বিচ্ছেদ। শ্রমিকদের জন্য আজীবন মজুরি-শ্রমের দন্ড। **প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে বৈপরীত্য।**

খ) পণ্য-উৎপাদন যে নিয়মগুলির অধীন সেগুলির বর্ধমান আধিপত্য ও ক্রমাধিক কার্যকারিতা। বলগাহীন প্রতিযোগিতা। **এক-একটা ফ্যাক্টরিতে সমাজীকৃত সংগঠন এবং সমগ্রভাবে উৎপাদনের সামাজিক নৈরাজ্যের মধ্যে বিরোধ।**

গ) একদিকে, প্রতিযোগিতার ফলে প্রতিটি ব্যক্তিগত কলওয়ালার পক্ষে যা বাধ্যতামূলক, যন্ত্রের সেই ক্রমোন্নতি এবং তার অনুপূরক হিশেবে শ্রমিকদের নিয়ত বর্ধমান কর্মচ্যুতি। **শিল্পের মজুত বাহিনী।** অন্যদিকে, — এটাও প্রতিযোগিতার ফলে প্রতিটি কলওয়ালার পক্ষে বাধ্যতামূলক, উৎপাদনের সীমাহীন প্রসার। দুদিকেই উৎপাদন-শক্তির অশ্রুতপূর্ব বিকাশ,

চাহিদার তুলনায় যোগানের আধিক্য, অতি-উৎপাদন, বাজারে অত্যধিক সরবরাহ, প্রতি দশ বছর অন্তর সংকট, পাপ চক্র: **এদিকে উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্নের আধিক্য — ওদিকে** কর্মহীন ও জীবিকাহীন **শ্রমিকদের আধিক্য।** কিন্তু উৎপাদন ও সামাজিক সমৃদ্ধির এই দুটি কারিকা একত্রে সক্রিয় হতে অক্ষম, কারণ উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি উৎপাদন-শক্তিকে আটকে রাখে কাজ থেকে এবং উৎপন্নকে আটকে রাখে সঞ্চালন থেকে — যদি না তারা প্রথমে পরিণত হয় পুঁজিতে, কিন্তু এই অতি আধিক্যেই তা অসম্ভব। এ বিরোধ বেড়ে ওঠে এক অদ্ভুত স্তরে। **বিনিময়-রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উৎপাদন-পদ্ধতি।** নিজেদেরই সামাজিক উৎপাদন-শক্তিকে আর পরিচালনা করতে অসামর্থ্যের দ্বারা বুর্জোয়ারা অভিযুক্ত।

ঘ) উৎপাদন-শক্তির সামাজিক চরিত্রের আংশিক স্বীকৃতি দিতে পুঁজিপতিরা নিজেরাই বাধ্য হয়। উৎপাদন ও যোগাযোগের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলিকে হাতে নেয় প্রথমে **জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি,** পরে ট্রাস্ট, অতঃপর **রাষ্ট্র।** অনাবশ্যক শ্রেণী রূপে প্রমাণিত হয় বুর্জোয়ারা। তাদের সামাজিক ক্রিয়ার সবই এখন চলে বেতনভোগী কর্মচারী দ্বারা।

৩। **প্রলেতারীয় বিপ্লব** — বিরোধসমূহের সমাধান। সামাজিক ক্ষমতা দখল করে প্রলেতারিয়েত, এবং তার দ্বারা বুর্জোয়ার হাত থেকে স্খলিত সমাজীকৃত উৎপাদন-উপায়গুলিকে পরিণত করে সাধারণ সম্পত্তিতে। এ কাজের ফলে উৎপাদনের উপায়গুলি এতদিন যে পুঁজির চরিত্র ধারণ করেছিল তা থেকে প্রলেতারিয়েত তাদের মুক্ত ক'রে তাদের সমাজীকৃত চরিত্রটার পরিপূর্ণ সক্রিয়তার স্বাধীনতা এনে দেয়। পূর্বনির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনায় সমাজীকৃত উৎপাদন এখন থেকে সম্ভব হয়। উৎপাদনের বিকাশের ফলে তখন থেকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব কালাসঙ্গতি হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক উৎপাদন থেকে যে পরিমাণে নৈরাজ্য অন্তর্ধান করতে থাকে সেই পরিমাণে মরে যেতে থাকে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। মানুষ অবশেষে নিজেরই সমাজ-সংগঠনের প্রভু হবার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতির প্রভু, নিজের প্রভু — মুক্ত।

সার্বজনীন মুক্তির এই কর্মই হল আধুনিক প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ব্রত। ঐতিহাসিক অবস্থাটিকে পুরোপুরি বোঝা, এবং সে

কারণে এই কর্মের চরিত্র প্রণিধান করা, যে স্মরণীয় কীর্তি প্রলেতারিয়েতের সাধন করার কথা, আজকের নিপীড়িত প্রলেতারীয় শ্রেণীকে, তার শর্ত ও তাৎপর্যের পরিপূর্ণ জ্ঞানদান করা—এই হল প্রলেতারীয় আন্দোলনের তাত্ত্বিক প্রকাশ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কর্তব্য।

১৮৮০ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের প্রথমার্ধে এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

প্রকাশিত হয় *La Revue socialiste* পত্রিকায়, নং ৩, ৪, ৫, সংখ্যায়, ১৮৮০ সালের ২০ মার্চ, ২০ এপ্রিল, ৫ মে তারিখে এবং ফরাসী ভাষায় পৃথক পুস্তিকাকারে: F. Engels. 'Socialisme utopique et socialisme scientifique', Paris, 1880

ইংরেজি সংস্করণের পাঠ থেকে বাংলা অনুবাদ

ভ. ই. জাসুলিচের চিঠির উত্তরের প্রথম খসড়া (৬০)

১) পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্ভব সম্পর্কে আমার বিশ্লেষণে আমি বলেছিলাম যে তার গোপন রহস্যটা রয়েছে এইখানে যে 'উৎপাদনের উপায়সমূহ থেকে উৎপাদককে একদম বিচ্ছিন্ন করার' উপরে তা প্রতিষ্ঠিত ('পুঁজির' ফরাসী সংস্করণের পৃঃ ৩১৫, কলম ১) এবং 'জমি থেকে **কৃষি-উৎপাদনকারীর উচ্ছেদসাধন হল** সমগ্র প্রক্রিয়ার ভিত্তি। এই উচ্ছেদসাধনের ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে... আমাদের দৃষ্টান্ত হিশেবে আমরা যাকে নিচ্ছি, একমাত্র সেই ইংলন্ডেই রয়েছে তার চিরায়ত রূপ' (ঐ, কলম ২)*।

একাজ করার সময়ে আমি এই প্রক্রিয়ার 'ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতাকে' **পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই** সীমাবদ্ধ রেখেছি। কেন? দয়া করে ৩২তম অধ্যায়টি দেখুন, সেখানে এই কথাগুলি দেখতে পাবেন: 'তার বিলুপ্তি, উৎপাদনের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও বিক্ষিপ্ত উপায়সমূহের সামাজিকভাবে কেন্দ্রীকৃত উপায়ে রূপান্তর, বহুর অতি-ক্ষুদ্র সম্পত্তির কতিপয়ের বিপুল সম্পত্তিতে রূপান্তর... বিরাট জনসাধারণের এই ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক উচ্ছেদসাধনই পুঁজির ইতিহাসের ভূমিকা... স্বোপার্জিত **ব্যক্তিগত সম্পত্তি**... স্থানচ্যুত হয় **পুঁজিবাদধর্মী ব্যক্তিগত সম্পত্তি** দিয়ে, তা নির্ভর করে থাকে অপরের নামত মুক্ত শ্রমের, অর্থাৎ মজুরি-শ্রমের শোষণের উপরে' (পৃঃ ৩৪১, কলম ২)**।

---

* তুলনীয়: এই সংস্করণের ৬ খন্ড, ৩২-৩৩ পৃঃ। — সম্পাঃ

** ঐ, ১০৭-১০৮ পৃঃ। — সম্পাঃ

এইভাবে, শেষ বিশ্লেষণে, এখানে আমরা **একধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তির আরেকধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করছি।** রুশ চাষীরা যে জমি চাষ করে তা কোনোকালেই তাদের **ব্যক্তিগত সম্পত্তি** না-থাকায়, তাদের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব প্রযুক্ত হবে কী করে?

২) ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে **রুশ কৃষকদের** গ্রাম-সমাজের (কমিউন) **অবশ্যম্ভাবী ভাঙনের** সপক্ষে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হল এই:

অতীতের শতাব্দীগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে সারা পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে অল্পবিস্তর প্রাচীন ধরনের সম্প্রদায়গত সম্পত্তি দেখতে পাওয়া যায়; সমাজ-প্রগতির ফলে এখন তা সর্বত্র লোপ পেয়েছে। একমাত্র রাশিয়াতেই তা এই নিয়তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে কেন?

এর জবাবে আমি বলব: কারণ রাশিয়ায়, এক অনন্য ঘটনাসংযোগের দরুন, জাতীয় স্তরে এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান গ্রামীণ সমাজ ক্রমে ক্রমে তার আদিম লক্ষণগুলি পরিত্যাগ করতে সক্ষম এবং জাতীয় স্তরে যৌথ উৎপাদনের একটি উপাদান হিশেবে প্রত্যক্ষভাবে বিকাশ লাভ করতে সক্ষম। তা যে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সঙ্গে একই সময়ে রয়েছে, এই ঘটনাই তাকে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সমস্ত ভয়ংকর উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে না গিয়েই তার সমস্ত ইতিবাচক কৃতিত্বগুলির সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম করে তোলে। রাশিয়া তো আধুনিক পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্নাবস্থায় বাস করে না; পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের (ইস্ট ইণ্ডিয়ার) মতো সে বিদেশী দখলদারির শিকারও নয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রুশ সমর্থকরা যদি এরূপ এক বিবর্তনের **তত্ত্বগত** সম্ভাবনা অস্বীকার করতেন, তাহলে আমি তাঁদের এই প্রশ্নটি করতাম: রাশিয়া কি পশ্চিমের মতো যন্ত্র, স্টিমবোট, রেলওয়ে প্রভৃতি পাওয়ার জন্য যন্ত্রোৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ-সাধনের এক দীর্ঘ পরিণতি-কালের মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল? আমাকে তাঁরা একথাও বলুন, পশ্চিমে যা গড়ে উঠতে বহু শতাব্দী লেগেছিল সেই গোটা বিনিময়-ব্যবস্থা (ব্যাঙ্ক, ঋণদান সমিতি প্রভৃতি) তাঁরা এক লহমায় প্রবর্তন করতে পারলেন কী করে?

ভূমিদাসপ্রথা (৬১) বিলোপের সময়ে গ্রামীণ সমাজগুলিকে যদি সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক বিকাশের অবস্থায় রাখা যেত, যে বিপুল পরিমাণ সরকারী ঋণের বেশির ভাগটাই মিটিয়েছিল কৃষকরা সেই ঋণ, সেই সঙ্গে পুঁজিপতিতে

রূপান্তরিত 'সমাজের নতুন স্তম্ভদের' রাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় (এবারেও কৃষকদের স্বার্থের বিনিময়ে) অন্যান্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ যোগানো হয়েছিল — এই সমস্ত ব্যয় যদি গ্রামীণ সমাজের **ভবিষ্যৎ বিকাশের** জন্য ব্যবহৃত হত, তাহলে কেউই আজ গ্রাম-সমাজের বিনাশের 'ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতার' কথা বলতেন না: প্রত্যেকে একে স্বীকার করে নিতেন রুশ সমাজে পুনঃসৃষ্টিমূলক শক্তি হিশেবে এবং যেসমস্ত দেশ এখনও পুঁজিবাদী শাসনের দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ তাদের চাইতে শ্রেয়তর বস্তু হিশেবে।

রুশ গ্রাম-সমাজ রক্ষা করার (তার বিকাশের সাহায্যে) অনুকূলে আরেকটি বিষয় এই যে গ্রাম-সমাজ শুধু পুঁজিবাদী উৎপাদনের (পশ্চিমে) সমসাময়িকই নয়, এই সমাজব্যবস্থা যখন অক্ষুণ্ণ ছিল সেই কালপর্ব কাটিয়ে উঠেও সে টিকে রয়েছে, বরংচ পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় স্থানেই তাকে বিজ্ঞানের সঙ্গে, জনসাধারণের সঙ্গে এবং যে উৎপাদন-শক্তিসমূহের সে জন্ম দেয় তারই সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হতে দেখছে। এককথায়, রুশ কমিউন বা গ্রাম-সমাজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে দেখতে পাচ্ছে এক সংকটের অবস্থায়, যার অবসান হবে তার নিশ্চিহ্নতার মধ্যে, আধুনিক সমাজগুলির 'প্রাচীন' ধরনের সম্প্রদায়গত মালিকানায় প্রত্যাবর্তনের মধ্যে, কিংবা নিশ্চিত রূপেই যাঁকে বিপ্লবী প্রবণতাসম্পন্ন বলে সন্দেহ করা যায় না এবং যাঁর রচনাদি ওয়াশিংটন সরকারের সমর্থনপুষ্ট এমন জনৈক মার্কিন লেখকের* ভাষায় বলতে গেলে, আধুনিক সমাজ যে দিকে চলেছে সেই 'নতুন ব্যবস্থা' হবে এক প্রাচীন ধরনের সমাজের 'শ্রেয়তর রূপে পুনরুজ্জীবন', ফলে, 'প্রাচীন' শব্দটিতে খুব বেশি ভয় পাওয়া উচিত নয়।

কিন্তু সে ক্ষেত্রে, এই পরিবর্তনগুলি কী সে সম্পর্কে অন্তত অবহিত হওয়া দরকার। সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না।

আদিম সম্প্রদায়গুলির পতনের ইতিহাস (তাদের সকলকে সমান স্তরের বলে গণ্য করা ভুল হবে: ভূতত্ত্বগত স্তরসমষ্টির ক্ষেত্রে যেমন, ঐতিহাসিক গঠনবিন্যাসে অনেকগুলি মুখ্য, গৌণ ও তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক ধরন প্রভৃতি থাকে) এখনও লেখা বাকি। এযাবৎ শুধু নকসার মতো সংক্ষিপ্ত কিছু

* ল. মর্গান। — সম্পাঃ

রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুসন্ধান যথেষ্ট পরিমাণে এগিয়েছে, যাতে একথা বলা যায় যে: ১) আদিম সম্প্রদায়গুলির জীবনীশক্তি সেমিটিক, গ্রীক ও রোমক সমাজ প্রভৃতির চাইতে অতুলনীয়ভাবে বেশি ছিল এবং আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজগুলির তুলনায় কঠিনতর যুক্তিসহ ছিল; ২) তাদের পতনের কারণগুলি উৎসারিত হচ্ছে কতকগুলি অর্থনৈতিক বিষয় থেকে, যা তাদের এক নির্দিষ্ট স্থানের সীমা পেরিয়ে বিকাশ লাভ করতে বাধা দিয়েছে, এবং তাদের ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে, যা কোনো মতেই আজকের রুশ কমিউনের পটভূমির অনুরূপ নয়।

বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের লেখা আদিম সম্প্রদায়গুলির ইতিহাস পড়ার সময়ে সতর্ক থাকা উচিত। তাঁরা কোনো কিছুতেই পরাঙমুখ নন, এমন কি নির্ভেজাল বিকৃতিতেও না। যেমন, বলপ্রয়োগে ভারতীয় গ্রাম-সমাজগুলিকে ধ্বংস করার নীতিতে ব্রিটিশ সরকারের ঐকান্তিক সক্রিয় সমর্থক স্যর হেনরি মেইন কপটতাসহকারে আমাদের বলেন যে সরকারের তরফ থেকে এই সব গ্রাম-সমাজকে মদত দেবার মহতী প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছিল অর্থনৈতিক নিয়মের অমোঘ বলে!

কোনো না কোনো ভাবে এই গ্রাম-সমাজ বাইরে থেকে ও ভিতর থেকে অবিরত যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিনষ্ট হয়েছিল। তার হয়ত নৃশংস মৃত্যু ঘটেছিল। জার্মান উপজাতিগুলি যখন ইতালি, স্পেন, গল, প্রভৃতি জয় করেছিল তখন সেকেলে ধরনের গ্রাম-সমাজের আর অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু তার **স্বাভাবিক জীবনীশক্তি** প্রমাণিত হয় দুটি ঘটনা দিয়ে। এমন এক-একটি দৃষ্টান্ত আছে যেখানে তা মধ্য যুগের সমস্ত উত্থান-পতন কাটিয়ে উঠে একেবারে বর্তমান কাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ অবস্থায় টিকে আছে, যেমন আমার বাসভূমি ট্রিড্‌স অঞ্চলে। কিন্তু যা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে তাকে স্থানচ্যুত করে যে গ্রাম-সমাজ এসেছে — যে গ্রাম-সমাজে কর্ষণযোগ্য জমি পরিণত হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে, অথচ অরণ্য, গোচারণ ভূমি ও পতিত জমি সম্প্রদায়গত সম্পত্তি থেকে গেছে — তার উপরে সে তার ছাপ এমন জোরালোভাবে রেখে গেছে যে মউরার দ্বিতীয় স্তরের গঠনবিন্যাসের এই গ্রাম-সমাজ পর্যবেক্ষণ করে প্রাচীন আদিরূপ নতুন করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেষোক্তের রেখে-যাওয়া বৈশিষ্ট্যসূচক

ছাপের দরুন, জার্মানরা তাদের অধিকৃত সমস্ত জমিতে যে গ্রাম-সমাজ প্রবর্তন করেছিল, সেই নতুন গ্রাম-সমাজ গোটা মধ্য যুগ ধরে হয়ে উঠেছিল মুক্তি ও জনমুখী জীবনের দুর্গ।

গ্রাম-সমাজের জীবন সম্পর্কে কিংবা তার বিলুপ্তি কিভাবে, কোন সময়ে হয়েছে সে সম্পর্কে ট্যাসিটাসের যুগের পর আমরা কিছু জানি না বটে, তবে জুলিয়স সিজারের গল্প থেকে এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত সম্পর্কে অন্তত জানতে পারি। তাঁর সময়েই জমি পুনর্বণ্টন করা হচ্ছিল বছরে বছরে, যদিও সেটা ছিল জার্মান **কনফেডারেশনগুলির গোষ্ঠী** (gentes) ও **উপজাতিগুলির** (tribus) মধ্যে, একটি গ্রাম-সমাজের এক-একজন স্বতন্ত্র সদস্যের মধ্যে তখনো পর্যন্ত নয়। এইভাবে জার্মানিতে **গ্রাম-সমাজের** উদ্ভব ঘটেছিল আরো প্রাচীন সমাজের একটা ধরন থেকে এবং এশিয়া থেকে তৈরি অবস্থায় আমদানি হওয়ার পরিবর্তে তা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ফল। সেখানে — ইস্ট ইন্ডিয়ায় — তা সবসময়ে সেকেলে গঠনবিন্যাসে **সর্বশেষ স্তর** বা সর্বশেষ কালপর্ব হিশেবেও দেখা যায়।

পুরোপুরি তত্ত্বগত দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থাৎ নিয়ত স্বাভাবিক অবস্থার অস্তিত্ব ছিল এই কথা পূর্বাহ্নেই অনুমান করে নিয়ে, গ্রাম-সমাজের সম্ভাব্য ভাগ্য বিচার করার উদ্দেশ্যে আমি এখন এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যা 'জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজকে' অধিকতর সেকেলে ধরনগুলির থেকে পৃথক করে।

সর্বপ্রথমে, গোড়ার দিকের আদিম সম্প্রদায়গুলির সবকটিরই ভিত্তি ছিল তাদের সদস্যদের অভিন্ন বংশপরিচয়; এই জোরালো অথচ সংকীর্ণ যোগসূত্র ভেঙে জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজ অপরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রসারিত করতে ও টিকিয়ে রাখতে অধিকতর সক্ষম।

দ্বিতীয়ত, জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজে বাসগৃহ ও তার পরিপূরক, অঙ্গন, জমি যে চাষ করে তারই ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অথচ কৃষি প্রবর্তনের বহু আগে বারোয়ারি বাসগৃহ ছিল গোড়ার দিককার সম্প্রদায়গুলির অন্যতম বৈষয়িক ভিত্তি।

সবশেষে, কর্ষণযোগ্য জমি সম্প্রদায়গত বা বারোয়ারি সম্পত্তি থাকলেও কিছুকাল অন্তর অন্তর তা জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজের সদস্যদের মধ্যে এমনভাবে

নতুন করে ভাগাভাগি করা হয় যে প্রত্যেকে তার নির্দিষ্ট খেত নিজেই চাষ করে এবং তার নিজের শ্রমের ফসল ভোগ করে, পক্ষান্তরে আরো সেকেলে সম্প্রদায়গুলিতে উৎপাদন ছিল সম্প্রদায়গত এবং শুধু উৎপন্ন সামগ্রী বণ্টন করা হত। অবশ্য, এই আদিম ধরনের যৌথ বা সমবায়মূলক উৎপাদন ছিল বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির দুর্বলতার ফল, উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিকীকরণের ফল নয়।

'জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজে' অন্তর্নিহিত দ্বিবিধত্ব কিভাবে তাকে প্রাণশক্তি প্রদান করে তা সহজেই দেখা যায়, কারণ একদিকে সম্প্রদায়গত সম্পত্তি এবং তা থেকে উদ্ভূত সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক তাকে একটা দৃঢ় ভিত্তি যোগায়, আর ব্যক্তিগত বাসগৃহ, কর্ষণযোগ্য জমির অংশ-বিভক্ত চাষ এবং শ্রমের ফসল ব্যক্তিগতভাবে উপযোজন ব্যক্তির বিকাশে সহায়ক হয়, আদিমতর জনসম্প্রদায়গুলিতে বিদ্যমান অবস্থায় যা বেমানান ছিল।

কিন্তু একথাও সমান পরিষ্কার যে এই দ্বিবিধত্বই কালক্রমে ভাঙনের উৎস হয়ে উঠতে পারে। এক বৈরি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব ছাড়াও, গবাদি পশু দিয়ে যার শুরু সেই অস্থাবর সম্পত্তির (এর মধ্যে এমনকি ভূমিদাসও পড়ে) ক্রমান্বিত সঞ্চয়, কৃষিতে অস্থাবর সম্পত্তির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং এই সঞ্চয়ের আনুষঙ্গিক অনেকগুলি অন্যান্য বিষয় — এখানে তা বিশদভাবে বর্ণনা করতে হলে মূল বিষয় থেকে আমাকে বহুদূর সরে যেতে হবে — অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য ভেঙে ফেলে গ্রাম-সমাজেরই ভিতরে এমন স্বার্থের সংঘাতের জন্ম দেয়, যার ফলে প্রথমেই কর্ষণযোগ্য জমি পরিণত হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে এবং শেষ পর্যন্ত অরণ্য, গোচারণ ভূমি ও পতিত জমি প্রভৃতি ব্যক্তিগত ভোগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় — এগুলি ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির **সম্প্রদায়গত উপাঙ্গে** পরিণত হয়েছে। এই জন্যই 'জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজ' সর্বত্রই সেকেলে সামাজিক গঠনবিন্যাসের **সাম্প্রতিকতম ধরন** এবং সেই কারণেই, পশ্চিম ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজের কালপর্বটি হল সম্প্রদায়গত মালিকানা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানায় উত্তরণের, প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় স্তরের গঠনবিন্যাসে উত্তরণের কালপর্ব। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে 'জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজের' বিকাশ সব অবস্থায় অবশ্যই

একই ধারা অনুসরণ করবে? নিশ্চয়ই না। তার উপাদানমূলক রূপটি নিম্নলিখিত বিকল্প তুলে ধরে: হয় তার অন্তর্নিহিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপাদানটি যৌথ উপাদানের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে, না হয় তার উল্টো। সবকিছুই নির্ভর করে যে ঐতিহাসিক পটভূমিতে সে রয়েছে, তার উপরে... এই দুটি সমাধানই সম্ভব কার্যকারণ নির্ণয়াত্মক পদ্ধতি নির্বিশেষে, কিন্তু স্পষ্টতই দুটির জন্যই দরকার একেবারে পৃথক ঐতিহাসিক পরিবেশ।

৩) রাশিয়াই একমাত্র ইউরোপীয় দেশ যেখানে 'জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজ' বর্তমান কাল পর্যন্ত জাতীয় স্তরে বজায় রাখা হয়েছে। সে বৈদেশিক দেশ দখলের শিকার নয়, যেমন ইস্ট ইণ্ডিয়া। সেই সঙ্গে আধুনিক পৃথিবী থেকে সে বিচ্ছিন্ন নয়। একদিকে, জমির সাধারণ মালিকানার দরুন সে অংশবিভক্ত ও ব্যক্তিগত কৃষিব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষভাবে ও ক্রমে ক্রমে যৌথ কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে পারে, এবং যেসব তৃণভূমি ভাগাভাগি হয়ে যায় নি সেখানে রুশ কৃষকরা ইতিমধ্যেই তা করছে। রাশিয়ার জমির প্রাকৃতিক গঠনই বৃহদাকারে যন্ত্রের ব্যবহার দাবি করে। কৃষক যে শ্রমের **আর্তেল** প্রথায় (যৌথ উদ্যোগ) অভ্যস্ত এই ঘটনাটিই তার পক্ষে অর্থনীতির অংশবিভক্ত ব্যবস্থা থেকে সমবায়মূলক ব্যবস্থায় পরিবর্তনসাধনের কাজকে সহজতর করে তোলে, এবং সবশেষে, যে রুশ সমাজ এতকাল তার স্বার্থের বিনিময়ে বেঁচে থেকেছে, এরূপ উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় অগ্রিমমূল্য তারই প্রদেয়। অন্যদিকে, পৃথিবীর বাজারে যার আধিপত্য রয়েছে সেই পশ্চিমী উৎপাদনব্যবস্থার **যুগপৎ অস্তিত্ব** রাশিয়াকে সক্ষম করে তোলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার 'কওদিন ফর্কস'-এর (৬২) মধ্য দিয়ে না-গিয়েই তার অর্জিত সমস্ত ইতিবাচক কৃতিত্বকে গ্রাম-সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে।

'সমাজের নতুন স্তম্ভের' মুখপাত্ররা যদি আধুনিক গ্রাম-সমাজের বিবর্তনের তত্ত্বগত সম্ভাবনা অস্বীকার করেন, তাহলে তাঁদের প্রশ্ন করা যেতে পারে, যন্ত্র, স্টিমবোট, রেলওয়ে প্রভৃতি পাওয়ার জন্য রাশিয়া পশ্চিমের মতো যন্ত্রোৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশসাধনের এক দীর্ঘ পরিণতিকালের মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল কিনা। পশ্চিমে যা গড়ে উঠতে বহু শতাব্দী লেগেছিল সেই গোটা বিনিময়-ব্যবস্থা (ব্যাংক, জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি প্রভৃতি) রুশীরা

কী করে এক লহমায় প্রবর্তন করতে পারলেন, সে প্রশ্নও তাঁদের করা যায়।

রাশিয়ার 'জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজের' একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেটাই তার দুর্বলতা এবং সর্বদিক দিয়ে তার পক্ষে ক্ষতিকর। সেটা হল তার বিচ্ছিন্নতা, এক গ্রাম-সমাজের জীবন এবং অন্যান্য গ্রাম-সমাজের জীবনের মধ্যে যোগাযোগের অভাব, **নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ এই ক্ষুদ্র-বিশ্ব,** যা এই ধরনটির অন্তর্নিহিত লক্ষণ হিশেবে সর্বত্র দেখা যায় না, কিন্তু যেখানেই তা আছে সেখানেই গ্রাম-সমাজগুলির উপরে অল্পবিস্তর কেন্দ্রীকৃত স্বেচ্ছাচারের জন্ম দিয়েছে। রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলির একীকরণ প্রমাণ করে যে মঙ্গোলদের আক্রমণের পর রাশিয়া যে রাজনৈতিক ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, তার দ্বারা এই বিচ্ছিন্নতা অনেকাংশে জোরদার হয়েছিল; মনে হয় মূলত এই বিচ্ছিন্নতার হেতু ছিল বিপুল বিস্তীর্ণ এলাকা। আজ এই বাধা সহজেই অতিক্রম করা যায়। যা করা দরকার সেটা হল সরকারী প্রতিষ্ঠান 'ভোলোস্ত'*কে স্থানান্তরিত করে তার জায়গায় গ্রাম-সমাজগুলিরই নির্বাচিত কৃষকদের এক পরিষদকে বসানো, এই পরিষদ তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্থা হিশেবে কাজ করবে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে, তার ভবিষ্যৎ বিকাশের সাহায্যে 'জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজ' সংরক্ষণের পক্ষে অতি অনুকূল একটি বিষয় এই যে গ্রাম-সমাজ যে শুধু পশ্চিমী পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে একই সময়ে রয়েছে এবং তাই তার কার্যপ্রণালীর কাছে আত্মসমর্পণ না-করেও তার কৃতিত্বগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারে তাই নয়, বরং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন পুরো অক্ষুণ্ণ ছিল সেই কালপর্ব কাটিয়েও তা টিকে রয়েছে, এবং এখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে দেখছে, পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দু'জায়গাতেই শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে, বিজ্ঞানের সঙ্গে এবং সে যে উৎপাদন-শক্তিসমূহের জন্ম দেয় সেগুলির সঙ্গেই সংঘাতে লিপ্ত হতে — এককথায়, এমন এক সংকটাবস্থায়, যার অবসান ঘটবে তার বিলুপ্তিতে, 'সেকেলে' ধরনের যৌথ মালিকানা ও যৌথ উৎপাদনের এক উচ্চতর রূপে আধুনিক সমাজগুলির প্রত্যাবর্তনে।

---

* মূল রচনায় শব্দটি রুশ ভাষাতে রয়েছে। — সম্পাঃ

একথা বলাই বাহুল্য যে গ্রাম-সমাজের বিবর্তন হবে ক্রমান্বিত বিবর্তন এবং প্রথম ধাপটি হবে তার **বর্তমান ভিত্তির** উপরে তার জন্য স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি।

কিন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা, জমির প্রায় অর্ধেক, এবং উন্নততর অংশই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, রাষ্ট্রীয় জোত-জমির কথা তো বলাই বাহুল্য। সেই জন্যই, ভবিষ্যৎ বিকাশের সাহায্যে 'গ্রাম-সমাজ' সংরক্ষণ রুশ সমাজের সাধারণ অগ্রগতির সঙ্গে মিলে যায়, রুশ সমাজের পুনর্জন্ম একমাত্র এই মূল্যেই ক্রয় করা যেতে পারে। এমনকি, শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও, রাশিয়ার কৃষি যে অচলাবস্থায় পড়ে আছে, রাশিয়া তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে গ্রাম-সমাজের বিকাশ ঘটিয়ে; ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার ধারায় পুঁজিবাদী খাজনা প্রবর্তন করে তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করা এবং বেরিয়ে আসাটা হবে বাতুলতা, কারণ সারা দেশের কৃষির অবস্থার পক্ষে তা বেমানান।

বর্তমানে রুশ 'গ্রাম-সমাজ' যেসমস্ত কষ্ট ভোগ করছে, সেকথা বাদ দিয়ে, এবং একমাত্র তার উপাদানমূলক রূপ ও তার ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি মনোনিবেশ করে একথা সোজাসুজি স্পষ্ট হয়ে যায় যে তার অন্যতম মৌলিক লক্ষণ, জমির সাধারণ মালিকানা, যৌথ উৎপাদন ও উপযোজনের স্বাভাবিক ভিত্তি। তদুপরি, রুশ কৃষক যে কাজের **আর্তেল** প্রথায় অভ্যস্ত এই ঘটনাটি অর্থনীতির অংশবিভক্ত ব্যবস্থা থেকে যৌথ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটানোর কাজকে তার পক্ষে সহজতর করে তোলে; এই যৌথ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই সে কিছুটা পরিমাণে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে বিভক্ত না-হওয়া তৃণভূমিতে, নিকাশী কাজে এবং সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য উদ্যোগে। তবে, কৃষিতে ব্যক্তিগত উপযোজনের উৎস অংশবিভক্ত শ্রমকে স্থানান্তরিত করে যৌথ শ্রম কায়েম হওয়ার জন্য দুটি বিষয় দরকার — এরূপ পরিবর্তনের অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং তা অর্জনের জন্য আবশ্যকীয় বৈষয়িক অবস্থা।

অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কথা বলতে গেলে 'গ্রাম-সমাজ' স্বাভাবিক অবস্থায় স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ তার উপরে চাপানো গুরুভার বোঝা সরানোর সঙ্গে সঙ্গে এবং উপযুক্তভাবে চাষ করার মতো যথেষ্ট জমি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রয়োজন অনুভূত হবে। রুশ কৃষির যখন শুধুই

জমি দরকার ছিল এবং ছোট চাষীর সরঞ্জাম ছিল অল্পবিস্তর আদিম উপকরণ, সেই সময় চলে গেছে। এই সময়টা চলে গেছে আরো বেশি তাড়াতাড়ি, কারণ চাষীর অত্যাচার তার খেতকে নিঃস্ব ও বন্ধ্যা করে দেয়। তার এখন দরকার বৃহৎ আকারে সংগঠিত সমবায়মূলক শ্রম। আর যে চাষীর নিজের ২ কিংবা ৩ দেসিয়াতিনা* জমি চাষ করার প্রয়োজনীয় সঙ্গতি নেই সে কি দশগুণ বেশি দেসিয়াতিনা জমি নিয়ে আরো ভালো অবস্থায় পড়বে?

কিন্তু হাতিয়ার, সার, খামার-পদ্ধতি অর্থাৎ যৌথ শ্রমের পক্ষে অপরিহার্য সমস্ত উপায়-উপকরণ পাওয়া যাবে কোথায়? একই ধরনের সেকেলে গ্রাম-সমাজগুলির তুলনায় রুশী 'গ্রাম-সমাজের' বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই। ইউরোপে একমাত্র সেই বিশাল জাতীয় স্তরে রক্ষিত হয়েছে। সে তাই এমন এক ঐতিহাসিক পরিবেশে রয়েছে যেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সহবর্তমান অস্তিত্ব তাকে যৌথ শ্রমের সমস্ত অবস্থা যোগায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার 'কওদিন ফর্কস'-এর মধ্য দিয়ে না-গিয়েও তার সমস্ত ইতিবাচক কৃতিত্বকে সে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম। রাশিয়ার জমির প্রাকৃতিক গঠনই বৃহৎ আকারে সংগঠিত ও সমবায়মূলক শ্রমে সম্পাদিত যন্ত্রের ব্যবহারে তাকে চাষ করার আমন্ত্রণ জানায়। প্রারম্ভিক সাংগঠনিক ব্যয়ের কথা — বুদ্ধিবৃত্তিগত তথা বৈষয়িক — বলতে গেলে, রুশ সমাজেরই তা 'গ্রাম-সমাজকে' প্রদেয়, 'গ্রাম-সমাজের' বিনিময়েই রুশ সমাজ এতদিন বেঁচে আছে এবং তারই মধ্যে তাকে তার 'পুনর্জন্মের উৎস' সন্ধান করতে হবে।

'গ্রাম-সমাজের' এই বিকাশ যে আমাদের সময়কার ইতিহাসের ধারার সঙ্গে মানানসই, তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলিতে, পুঁজিবাদী উৎপাদন যেখানে সবচেয়ে বেশি উন্নত সেইখানেই তার মারাত্মক সংকট, যে সংকটের অবসান হবে তার বিলুপ্তিতে এবং সবচেয়ে প্রাচীন ধরনটির — যৌথ উৎপাদন ও উপযোজন — উন্নততর রূপে আধুনিক সমাজের প্রত্যাবর্তনে।

৪) বিকাশলাভে সক্ষম হওয়ার জন্য সর্বোপরি প্রয়োজন জীবিত থাকা, আর এই ঘটনাটি না-দেখে পারা যায় না যে বর্তমান কালে 'গ্রাম-সমাজের' জীবন বিপন্ন।

* এক দেসিয়াতিনা প্রায় এক হেক্টরের সমান। — সম্পাঃ

জমির কৃষকদের উচ্ছেদ করার জন্য ইংলণ্ডে ও অন্যত্র যেরকম ঘটেছে সেই রকম, তাদের জমি থেকে বিতাড়িত করার প্রয়োজন হয় না; অনুশাসন জারী করে সম্প্রদায়গত সম্পত্তির বিলোপ ঘটানোরও দরকার নেই। কৃষকদের একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে তাদের শ্রমের ফসল থেকে বঞ্চিত করেই দেখুন, এমনকি আপনার পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়েও তাদের জমিতে তাদের বেঁধে রাখতে পারবেন না! রোমক সাম্রাজ্যের শেষ দিকে প্রাদেশিক রোমক অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসাররা — এরা কৃষক ছিল না, ছিল ব্যক্তিগত ভূস্বামী — তাদের জমি ছেড়ে দিয়ে, এমনকি নিজেদের ক্রীতদাস রূপে বিক্রি করেও ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, — সবই সেই সম্পত্তির হাত থেকে রেহাই পেতে যে সম্পত্তি কঠোর ও নির্দয় কর-আদায়ের সরকারী অজুহাতের বেশি আর কিছু ছিল না।

ভূমিদাসদের তথাকথিত মুক্তির পর থেকে রুশ গ্রাম-সমাজ রাষ্ট্রের দিক থেকে অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক অবস্থার সামনে পড়েছে, রাষ্ট্র তার হাতে কেন্দ্রীভূত সামাজিক শক্তি দিয়ে তাকে নিপীড়ন করা বন্ধ করে নি। রাষ্ট্রের কর-আদায়ের দরুন দুর্বল হয়ে পড়া গ্রাম-সমাজ বণিক, ভূস্বামী ও মহাজনদের শোষণের সহজ লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। বাইরে থেকে এই নিপীড়ন গ্রাম-সমাজেরই মধ্যে ইতিমধ্যেই বিদ্যমান স্বার্থের সংঘাতকে বাড়িয়ে তুলেছে এবং তার ভাঙনকে ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু এই সব নয়। কৃষকদের স্বার্থের বিনিময়ে রাষ্ট্র লালিত করেছে পশ্চিমী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সেই শাখাগুলিকে, যেগুলি কৃষির কোনো উৎপাদিকাক্ষমতার বিকাশসাধন না-করে, অনুৎপাদনশীল মধ্যস্বত্বভোগীদের দিয়ে কৃষিজাত পণ্য লুণ্ঠনকে সহজতর ও ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহায়ক। এইভাবে তা ইতিমধ্যেই নিরক্ত 'গ্রাম-সমাজের' রক্ত-চোষা এক নতুন পুঁজিবাদী কীটকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করেছে।

... সংক্ষেপে, চাষীর, অর্থাৎ রাশিয়ায় বৃহত্তম উৎপাদন-শক্তির শোষণ সহজতর ও দ্রুততর করার ক্ষেত্রে এবং 'সমাজের নতুন স্তম্ভগুলিকে' সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহায়ক কৃৎকৌশলগত ও অর্থনৈতিক উপায়সমূহের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে রাষ্ট্র সাহায্য করেছে।

৫) ধ্বংসাত্মক প্রভাবগুলির এই মিলনের ফলে অবশ্যম্ভাবী রূপেই

গ্রাম-সমাজ ধ্বংস হবে, যদি না এক বলিষ্ঠ প্রতিকূল ক্রিয়া দিয়ে তাকে চূর্ণ করা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে: গ্রাম-সমাজের বর্তমান অবস্থা যাদের কাছে এত লাভজনক, সেই সমস্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল (সরকারের রক্ষণাধীন বড়ো বড়ো শিল্পোদ্যোগ সহ) সোনার ডিম-পাড়া হাঁসটিকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করবে কেন? ঠিক এই কারণেই যে তারা বুঝতে পারছে 'বর্তমান অবস্থাটা' ধরে রাখা যাবে না এবং ফলত, তাকে শোষণ করার বর্তমান উপায়গুলিই সেকেলে। কৃষকের দুঃখকষ্ট ইতিমধ্যেই জমিকে নিঃশেষ করে ফেলেছে, জমি অনুৎপাদী হয়ে যাচ্ছে। অনুকূল অবস্থায় কোনো কোনো বছর সেখানে যে ভালো ফসল ফলেছে, তা বাতিল হয়ে গেছে অন্যান্য বছরের দুর্ভিক্ষে। গত দশ বছরের গড় পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে কৃষি-উৎপাদন শুধু যে স্থাণু তাই নয়, বরং পশ্চাৎগামী। সব শেষে, এই সর্বপ্রথম রাশিয়া খাদ্যশস্য রপ্তানি করার পরিবর্তে আমদানি করতে বাধ্য হচ্ছে। তাই নষ্ট করার মতো সময় নেই। এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতেই হবে। অল্পবিস্তর সম্পন্ন চাষীদের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ দিয়ে এক গ্রামীণ মধ্য শ্রেণী গঠন করতেই হবে এবং কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নিছক প্রলেতারিয়েতে পরিণত করতেই হবে। এই লক্ষ্য মাথায় রেখেই 'সমাজের নতুন স্তম্ভের' মুখপাত্ররা গ্রাম-সমাজের উপরে আঘাতজনিত ক্ষতগুলিকেই তার জরাজীর্ণ দশার স্বাভাবিক উপসর্গ বলে অভিযোগ করেন।

এত বিচিত্র ধরনের স্বার্থ, বিশেষ করে দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের সদাশয় শাসনে খাড়া-করা 'সমাজের নতুন স্তম্ভগুলির' স্বার্থের কাছে 'গ্রাম-সমাজের' **বর্তমান অবস্থা** সুবিধাজনক, তবুও তারা সচেতনভাবে তাকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করে কেন? কেন তাদের মুখপাত্ররা তার ক্ষতগুলিকে তার স্বাভাবিক জীর্ণদশার অকাট্য প্রমাণ বলে অভিযোগ করে? যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তাকে তারা হত্যা করতে চায় কেন?

শুধু এই কারণে যে অর্থনৈতিক বিষয়গুলি — এখানে যেগুলি বিশ্লেষণ করতে গেলে আলোচ্য বিষয় থেকে আমাকে অনেকদূর সরে যেতে হবে — এই রহস্য প্রকাশ করেছে যে **গ্রাম-সমাজের বর্তমান অবস্থা টিকিয়ে রাখা যাবে না,** এবং জনসাধারণকে শোষণ করার বর্তমান উপায়গুলি অচিরেই

ঘটনাপ্রবাহে সেকেলে হয়ে যাবে। ফলে, নতুন কিছন্ দরকার, আর এই যে নতুন উপাদানটির কথা বিচিত্রতম ছদ্মবেশে ইঙ্গিত করা হচ্ছে সেটিকে সবসময়ে একই জিনিসে পর্যবসিত করা যেতে পারে: সম্প্রদায়গত সম্পত্তি বিলন্প্ত করা, অল্প বিত্তর সম্পন্ন চাষীদের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ থেকে একটা গ্রামীণ মধ্য শ্রেণী গঠন করা এবং বিপন্ল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নিছক প্রলেতারিয়েতে পরিণত করা।

একদিকে 'গ্রাম-সমাজ' প্রায় ভাঙনের কিনারায়, অন্যদিকে তার উপরে শেষ আঘাত হানার এক জোরালো ষড়যন্ত্রে তা বিপন্ন। রাশিয়ার গ্রাম-সমাজকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই এক রন্শ বিপ্লব দরকার। প্রসঙ্গত, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা যাঁদের হাতে রয়েছে তাঁরা জনসাধারণকে এরন্প এক বিপর্যয়ের জন্য যথাসাধ্য করছেন।

সেই সঙ্গে, গ্রাম-সমাজের যখন রক্তক্ষরণ হচ্ছে এবং তা যখন অত্যাচারিত হচ্ছে, তার জমি অনন্ৎপাদী ও দন্র্বল করে ফেলা হচ্ছে তখন 'সমাজের নতুন স্তম্ভগন্লির' সাহিত্যিক পরিচারকরা গ্রাম-সমাজের উপরে হানা আঘাতজনিত ক্ষতগন্লিকে পরিহাসভরে উল্লেখ করছে তার স্বতঃস্ফন্র্ত জীর্ণদশার উপসর্গ বলে। তারা দাবি করছে যে তার স্বাভাবিক মন্ত্যু ঘটছে এবং সদয়তম ব্যাপারটা হবে তার যন্ত্রণার অবসান ঘটানো। এখানে আমরা আর সমাধান করার মতো একটা সমস্যার মোকাবিলা করছি না, মোকাবিলা করছি নিতান্তই এক শত্রন্র, যাকে পরাস্ত করতেই হবে। রন্শ দেশীয় গ্রাম-সমাজকে রক্ষা করার জন্য একটি রন্শ বিপ্লব অবশ্যই দরকার। এবং রন্শ সরকার ও 'সমাজের নতুন স্তম্ভগন্লি' এরন্প বিপর্যয়ের জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত করার জন্য তাদের যথাসাধ্য করছে। যদি ঠিক সময়ে বিপ্লব হয়, যদি তা গ্রাম-সমাজের অবাধ বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য তার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে, তাহলে গ্রাম-সমাজ অচিরেই রন্শ সমাজে নবজন্মদায়ক শক্তি হিশেবে, এবং যেসব দেশ এখনো পন্ঁজিবাদী শাসনের দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ তাদের চাইতে উন্নততর কিছন্ হিশেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

১৮৮১ সালের ফেব্রন্য়ারির শেষে ও মার্চের গোড়ার দিকে মার্কস-কর্তৃক লিখিত
প্রথম প্রকাশ: 'মার্কস-এঙ্গেলস আরকাইভ' গ্রন্থের ১, ১৯২৪

পাণ্ডুলিপি অনন্যায়ী মন্দ্রিত
ফরাসী থেকে ইংরেজি অনন্বাদের ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কার্ল মার্কসের সমাধিপার্শ্বে বক্তৃতা

১৪ মার্চ, বেলা পৌনে তিনটেয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক চিন্তা থেকে বিরত হয়েছেন। মাত্র মিনিটদুয়েকের জন্য তাঁকে একা রেখে যাওয়া হয়েছিল। আমরা ফিরে এসে দেখলাম যে তিনি তাঁর আরামকেদারায় শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন — কিন্তু ঘুমিয়েছেন চিরকালের জন্য।

এই মানুষটির মৃত্যুতে ইউরোপ ও আমেরিকার জঙ্গী প্রলেতারিয়েত এবং ইতিহাস-বিজ্ঞান উভয়েরই অপূরণীয় ক্ষতি হল। এই মহান প্রাণের তিরোভাবে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তা অচিরেই অনুভূত হবে।

ডারউইন যেমন জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন তেমনি মার্কস আবিষ্কার করেছেন মানুষের ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম, মতাদর্শের অতি নিচে এতদিন লুকিয়ে রাখা এই সহজ সত্য যে, রাজনীতি, বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম ইত্যাদি চর্চা করতে পারার আগে মানুষের প্রথম চাই খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়-পরিচ্ছদ, সুতরাং প্রাণধারণের আশু বাস্তব উপকরণের উৎপাদন এবং সেইহেতু কোনো নির্দিষ্ট জাতির বা নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রাই হল সেই ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট জাতিটির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইনের ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলা, এমনকি তাদের ধর্মীয় ভাবধারা পর্যন্ত এবং সেই দিক থেকেই এগুলির ব্যাখ্যা করতে হবে, এতদিন যা করা হয়েছে সেভাবে উল্টো দিক থেকে নয়।

কিন্তু শুধু এই নয়। বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির এবং এই পদ্ধতি যে বুর্জোয়া সমাজ সৃষ্টি করেছে তার গতির বিশেষ নিয়মটিও মার্কস আবিষ্কার করেন। যে সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে এতদিন পর্যন্ত সব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও সমাজতন্ত্রী সমালোচক উভয়েরই অনুসন্ধান

অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, তার ওপর সহসা আলোকপাত হল বাড়তি মূল্য আবিষ্কারের ফলে।

একজনের জীবদ্দশার পক্ষে এরকম দুটো আবিষ্কারই যথেষ্ট। এমনকি এরকম একটা আবিষ্কার করতে পারার সৌভাগ্য যাঁর হয়েছে তিনিও ধন্য। কিন্তু মার্কস চর্চা করেছিলেন বহু বিষয় নিয়ে এবং কোনোটাই ওপর ওপর নয় — তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই, এমনকি গণিতশাস্ত্রেও তিনি স্বাধীন আবিষ্কার করে গেছেন।

এই হল বিজ্ঞানী মানুষটির রূপ। কিন্তু এটা তাঁর ব্যক্তিত্বের অর্ধেকও নয়। মার্কসের কাছে বিজ্ঞান ছিল এক ঐতিহাসিকভাবে গতিষ্ণু বিপ্লবী শক্তি। কোনো একটা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের নতুন যে আবিষ্কার কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের কল্পনা করাও হয়ত তখনো পর্যন্ত অসম্ভব, তেমন আবিষ্কারকে মার্কস যত আনন্দেই স্বাগত জানান না কেন, তিনি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের আনন্দ পেতেন যখন কোনো আবিষ্কার শিল্প এবং সাধারণভাবে ঐতিহাসিক বিকাশে একটা আশু বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করছে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রে যেসব আবিষ্কার হয়েছে তার বিকাশ এবং সম্প্রতি মার্সেল দেপ্রে-র আবিষ্কারগুলি তিনি খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করতেন।

কারণ মার্কস সবার আগে ছিলেন বিপ্লবী। তাঁর জীবনের আসল ব্রত ছিল পুঁজিবাদী সমাজ এবং এই সমাজ যেসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে তার উচ্ছেদে কোনো না কোনো উপায়ে অংশ নেওয়া, আধুনিক প্রলেতারিয়েতের মুক্তিসাধনের কাজে অংশ নেওয়া, একে তিনিই প্রথম তার নিজের অবস্থা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে, তার মুক্তির শর্তাবলি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিলেন। তাঁর ধাতটাই ছিল সংগ্রাম। এবং যে আবেগ, যে অধ্যবসায় ও যতখানি সাফল্যের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করতেন তার তুলনা মেলা ভার। প্রথম *Rheinische Zeitung* (১৮৪২) (৬৩), প্যারিসের *Vorwärts!* (১৮৪৪) (৬৪) পত্রিকা, *Deutsche-Brüsseler-Zeitung* (১৮৪৭) (৬৫), *Neue Rheinische Zeitung* (১৮৪৮-১৮৪৯),* *New-York Daily Tribune* (১৮৫২-১৮৬১) পত্রিকা (৬৬) এবং এছাড়া একরাশ

* এই খণ্ডের পৃঃ ৯৯-১১০ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

সংগ্রামী পুস্তিকা, প্যারিস, ব্রাসেল্‌স্‌ এবং লণ্ডনের সংগঠনে তাঁর কাজ এবং শেষে, সর্বোপরি মহান শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি গঠন — এটা এমন এক কীর্তি যে আর কোনো কিছু না করলেও শুধু এইটুকুর জন্যই এর প্রতিষ্ঠাতা খুবই গর্ববোধ করতে পারতেন।

এবং তাই, তাঁর কালের লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রোশ ও কুৎসার পাত্র হয়েছেন মার্কস। স্বেচ্ছাতন্ত্রী এবং প্রজাতন্ত্রী — দুধরনের সরকারই নিজ নিজ এলাকা থেকে তাঁকে নির্বাসিত করেছে। রক্ষণশীল বা উগ্র-গণতান্ত্রিক সব বুর্জোয়ারাই পাল্লা দিয়ে তাঁর দুর্নাম রটনা করেছে। এসব কিছুই তিনি ঠিক মাকড়শার ঝুলের মতোই ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন, উপেক্ষা করেছেন এবং যখন একান্ত প্রয়োজনবশে বাধ্য হয়েছেন একমাত্র তখনই এর জবাব দিয়েছেন। আর আজ সাইবেরিয়ার খনি থেকে কালিফোর্নিয়া পর্যন্ত, ইউরোপ ও আমেরিকার সব অংশে লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী সহকর্মীদের প্রীতির মধ্যে, শ্রদ্ধার মধ্যে, শোকের মধ্যে তাঁর মৃত্যু। আমি সাহস করে বলতে পারি যে মার্কসের বহু বিরোধী থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত শত্রু তাঁর মেলা ভার।

যুগে যুগে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর নাম, অক্ষয় থাকবে তাঁর কাজ!

১৮৮৩ সালের ১৭ মার্চ লণ্ডনের হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে এঙ্গেলসের ইংরেজীতে প্রদত্ত বক্তৃতা

১৮৮৩ সালের ২২ মার্চ *Der Sozialdemokrat* ১৩ নং পত্রিকায় জার্মান ভাষায় প্রকাশিত

পত্রিকার পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

মার্কস ও *Neue Rheinische Zeitung* (৬৭) (১৮৪৮-১৮৪৯)

আমরা যাকে জার্মান 'কমিউনিস্ট পার্টি' বলতাম, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আরম্ভে তা ছিল শুধু একটি স্বল্পসংখ্যকের কোষকেন্দ্র, ছিল গোপন প্রচারমূলক সমিতি হিশেবে সংগঠিত কমিউনিস্ট লীগ। সেই সময়ে জার্মানিতে সংঘ ও সভাসমিতির কোনো স্বাধীনতা ছিল না বলেই লীগকে গুপ্ত সংগঠন হতে হয়েছিল। বিদেশের বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থা থেকে লীগ তার সদস্য সংগ্রহ করত; এই সব সংস্থা ছাড়াও জার্মান দেশেই এর প্রায় তিরিশটি সমিতি বা বিভাগ ছিল আর নানা জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে সদস্য ছিল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সংগ্রামী বাহিনীর ছিল একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা। তিনি মার্কস। সবাই স্বেচ্ছায় তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিত। আর তাঁরই দৌলতে লীগ নীতি ও রণকৌশলের এমন এক কর্মসূচি পেয়েছিল যার তাৎপর্য আজো পর্যন্ত পুরোপুরি বজায় আছে। সে কর্মসূচি **'কমিউনিস্ট ইশতেহার'**।

এখানে সর্বাগ্রে কর্মসূচির রণকৌশলের অংশটুকু নিয়েই আমাদের আগ্রহ। তার সাধারণ প্রতিপাদ্য হল এই:

'শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টিগুলির প্রতিপক্ষ হিশেবে কমিউনিস্টরা স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করে না।

সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনো স্বার্থ তাদের নেই।

প্রলেতারীয় আন্দোলনকে রূপ দেওয়া বা গড়ে পিটে তোলার জন্য তারা নিজস্ব কোনো গোষ্ঠীগত নীতি খাড়া করে না।

শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টি থেকে কমিউনিস্টদের তফাতটা শুধু এই: (১) নানা দেশের শ্রমিকদের জাতীয় সংগ্রামের ভিতর তারা **জাতি-নির্বিশেষে** সারা প্রলেতারিয়েতের **সাধারণ স্বার্থটার** দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাকেই

সামনে টেনে আনে; (২) বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইকে যে বিভিন্ন **পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হয় তার মধ্যে** তারা সর্বদা ও সর্বত্র **সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থের** প্রতিনিধিত্ব করে।

সুতরাং কমিউনিস্টরা হল একদিকে **কার্যক্ষেত্রে** প্রতি দেশের শ্রমিক পার্টিগুলির সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অংশ — যে অংশ অন্যান্য সবাইকে সামনে ঠেলে নিয়ে যায়। অপরদিকে, **তত্ত্বের দিক দিয়ে** শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশের তুলনায় তাদের এই সুবিধা যে শ্রমিক আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত এবং শেষ সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছবোধ রয়েছে।'*

আর জার্মান পার্টি সম্পর্কে বিশেষ করে বলা হয়েছিল:

'জার্মানিতে বুর্জোয়ারা যখন বিপ্লবী অভিযান করে তখনই কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে একত্রে লড়ে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, সামন্ত জমিদারতন্ত্র এবং পেটি বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে।

কিন্তু বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যে বৈর বিরোধ বর্তমান তার যথাসম্ভব স্পষ্ট স্বীকৃতিটা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চার করার কাজ থেকে তারা মুহূর্তের জন্যও বিরত হয় না; এইজন্য যাতে, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজ আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আসতে বাধ্য, জার্মান শ্রমিকেরা যেন তৎক্ষণাৎ তাকেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিশেবে ব্যবহার করতে পারে; এইজন্যই যাতে, জার্মানিতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির পতনের পর যেন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেই অবিলম্বে লড়াই শুরু হতে পারে।

কমিউনিস্টরা প্রধানত জার্মানির দিকে মন দিচ্ছে কারণ দেশে একটি বুর্জোয়া বিপ্লব আসন্ন,' ইত্যাদি ('ইশতেহার', চতুর্থ পরিচ্ছেদ**)।

এই রণকৌশলগত কর্মসূচি যে পরিমাণ ন্যায্য প্রতিপন্ন হয়েছে তা আর কোনো কর্মসূচি হয় নি। বিপ্লবের প্রাক্কালে ঘোষিত হয়ে এটি সে বিপ্লবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তারপর থেকে যখনই শ্রমিকদের কোনো

* এই উদ্ধৃতিটিতে মোটা হরফ এঙ্গেলসের। এই সংস্করণের প্রথম খণ্ডের ১৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের প্রথম খণ্ডের ১৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

পার্টি তাদের কাজকর্মে এর থেকে বিচ্যুত হয়েছে তখনই প্রতিটি বিচ্যুতির শাস্তিও তারা পেয়েছে। আর আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরেও এটি মাদ্রিদ থেকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ পর্যন্ত ইউরোপের সব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সচেতন শ্রমিক পার্টির পথের নিশানা হয়ে রয়েছে।

প্যারিসের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনাবলির (৬৮) ফলে জার্মানির আসন্ন বিপ্লব ত্বরান্বিত হল আর তাতে করে সে বিপ্লবের চরিত্র গেল বদলে। নিজস্ব ক্ষমতাবলে জয়লাভ করার বদলে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী জয়ী হল ফরাসী শ্রমিক বিপ্লবের টানে। পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বীদের অর্থাৎ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-মালিকানা, আমলাতন্ত্র ও কাপুরুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারার আগেই তাকে এক নতুন শত্রুর অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের সম্মুখীন হতে হল। কিন্তু ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের তুলনায় জার্মানির অনেক পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আর তা থেকে উদ্ভূত তার সমান পশ্চাৎপদ শ্রেণী-সম্পর্কের ফল সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল।

জার্মান বুর্জোয়া তখন সবেমাত্র তার বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রে নিজের নিঃশর্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার শক্তি বা সাহস কোনোটাই তার ছিল না, আর তা করার কোনো চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তাও ছিল না। প্রলেতারিয়েতও সমান অপরিণত। তারা বেড়ে উঠেছিল পরিপূর্ণ মানসিক দাসত্বের মধ্যে। তারা ছিল অসংগঠিত; স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তোলার মতো ক্ষমতাও তাদের তখনো হয় নি। বুর্জোয়ার স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থের গভীর বিরোধ সম্বন্ধে কেবল একটা ঝাপসা অনুভূতি তাদের ছিল। তাই মূলত বুর্জোয়ার ভয়াবহ প্রতিপক্ষ হলেও তারা তখনো বুর্জোয়ার রাজনৈতিক অনুষঙ্গ হিশেবেই রইল। জার্মান প্রলেতারিয়েত তখন যা ছিল তাই দেখা নয় বরং ভবিষ্যতে সে যা হয়ে উঠবে বলে ভয় ছিল এবং ফরাসী প্রলেতারিয়েত তখনই যা হয়ে উঠেছে, তাই দেখে ভয় পেয়ে বুর্জোয়ারা মনে করল যে, তার পরিত্রাণের একমাত্র পথ হল রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে কোনো ধরনের একটা আপস, তা সে আপস যতই কাপুরুষোচিত হোক না কেন। প্রলেতারিয়েত তখনো নিজের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা জানত না বলে প্রথমে তাদের বেশির ভাগকে নিয়ে তারা বুর্জোয়াদের অতি-অগ্রণী চরম বামপন্থী অংশের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়। জার্মান শ্রমিকদের

সবচেয়ে বড়ো কাজ ছিল শ্রেণীগত পার্টি হিশেবে স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ার জন্য তাদের যেসব অধিকার অপরিহার্য সেগুলি অর্থাৎ মুদ্রণ, সংগঠন আর সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা অর্জন করা। নিজের শাসন ক্ষমতার স্বার্থেই এইসব অধিকারের জন্য লড়াই করা বুর্জোয়ার উচিত ছিল; কিন্তু শ্রমিকদের ভয়ে এখন সে এদের এইসব অধিকারের বিরোধিতা করতে থাকল। যে বিরাট জনসংখ্যাকে অকস্মাৎ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল তাদের মধ্যে দু'-একশত ছাড়া লীগসদস্য হারিয়ে গেল। জার্মান প্রলেতারিয়েত এইভাবে রাজনৈতিক রঙ্গভূমিতে প্রথম অবতীর্ণ হল চরম গণতান্ত্রিক পার্টি হিশেবে।

আমরা যখন জার্মানিতে এক বৃহৎ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করলাম তখন নিশান কী হবে তা এই থেকেই স্থির হয়ে গেল। সে নিশান একমাত্র গণতন্ত্রের নিশান হওয়াই সম্ভব ছিল। কিন্তু সেটা এমন এক গণতন্ত্র যা সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলবে তার বিশিষ্ট প্রলেতারীয় চরিত্র যেটা কিন্তু তখনো তার পতাকায় চিরকালের মতো উৎকীর্ণ করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। আমরা যদি তা না করতাম, আন্দোলনে যোগ দিতে, তার তখনই বর্তমান সবচেয়ে অগ্রণী, কার্যত প্রলেতারীয় দিকটার পক্ষ নিয়ে তা আরো এগিয়ে দিতে না চাইতাম তাহলে আমাদের পক্ষে ক্ষুদ্র প্রাদেশিক এক-পাতা কাগজে কমিউনিজম প্রচার করা আর বিরাট সক্রিয় এক পার্টির বদলে অতি ক্ষুদ্র এক সংকীর্ণ সম্প্রদায় গড়া ছাড়া আর কিছু করার থাকত না। কিন্তু বিজনে প্রচারকের ভূমিকা আমাদের জন্য নয়। ইউটোপীয়দের আমরা যে এত ভালো করে পড়েছিলাম, নিজেদের কর্মসূচিও রচনা করলাম, সেটা এই উদ্দেশ্যে নয়।

আমরা যখন কলোনে এলাম তখনো আংশিকভাবে গণতন্ত্রীদের, আর আংশিকভাবে কমিউনিস্টদের কাজ চলল এক বৃহৎ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কলোনের সংকীর্ণ স্থানীয় সংবাদপত্রে তা পরিণত করে আমাদের বার্লিনে পাঠাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রধানত মার্কসেরই চেষ্টায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নিই আর সংবাদপত্রটি আমাদের হয়ে দাঁড়ায়। এর বদলে আমাদের **হাইনরিখ ব্যুরগের্সকে** সম্পাদকমণ্ডলীতে নিতে হয়েছিল। তিনি (দ্বিতীয় সংখ্যায়) **একটি** প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তারপর আর কোনোদিন লেখেন নি।

বার্লিন নয়, বিশেষ করে কলোনই আমাদের প্রয়োজন ছিল। প্রথমত, কলোনই রাইন প্রদেশের কেন্দ্র। রাইন প্রদেশ ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গেছে, 'কোড নেপোলিয়ন' মারফত আধুনিক অধিকার-জ্ঞান আয়ত্ত করেছে, নিজস্ব বৃহৎ শিল্প গড়ে তুলেছে, আর সর্বদিক দিয়েই তা তখন জার্মানির সবচেয়ে অগ্রণী অংশ। নিজেদের পর্যবেক্ষণ থেকেই আমরা সমসাময়িক বার্লিনকে খুব ভালো করেই চিনতাম। তার বুর্জোয়া তখন সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করছে। তার তোষামুদে পেটি বুর্জোয়ার মুখে খুব দুঃসাহস, কিন্তু কাজে তারা কাপুরুষ, আর শ্রমিক শ্রেণী তখনো পর্যন্ত মোটেই বিকাশলাভ করে নি, অসংখ্য আমলাতন্ত্রী, অভিজাত ও দরবারী জঞ্জাল সেখানে। তার পুরো চরিত্রই হল কেবল 'রেসিডেন্সের' মতো। কিন্তু চূড়ান্ত কথা হল: বার্লিনে তখন ঘৃণ্য প্রুশীয় ল্যান্ডর‍্যাখট* বলবৎ রয়েছে আর পেশাদার বিচারকেরা রাজনৈতিক মামলার বিচার করছেন। রাইনে 'কোড নেপোলিয়ন' বলবৎ ছিল, তাতে মুদ্রণ সংক্রান্ত কোনো মামলার প্রশ্নই ছিল না, কারণ আগে থেকেই এতে সেন্সর ব্যবস্থার কথা ধরে নেওয়া হয়েছিল। আর আইন না ভেঙে রাজনৈতিক অপরাধ করলে জুরীর সামনে হাজির হতে হত। বার্লিনে বিপ্লবের পরে তরুণ শ্লেয়েফেল বাজে কারণে এক বছরের জন্য দণ্ডিত হন। কিন্তু রাইনে আমরা মুদ্রণের শর্তহীন স্বাধীনতা উপভোগ করতাম — আর সেই স্বাধীনতা শেষ বিন্দু পর্যন্ত কাজে লাগাতাম।

এইভাবে ১৮৪৮ সালের ১ জুন আমরা খুব অল্প শেয়ার ক্যাপিটাল নিয়ে সংবাদপত্র প্রকাশের কাজ শুরু করলাম; এবং শেয়ার-হোল্ডারেরা বিশ্বাসী ছিল না। প্রথম সংখ্যার পরই তাদের অর্ধেক আমাদের পরিত্যাগ করল আর মাসের শেষে একজনও আর রইল না।

সম্পাদকমণ্ডলীর গঠনতন্ত্র পরিণত হল মার্কসের একনায়কত্বে। বড়ো একটা দৈনিক সংবাদপত্র যাকে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হতে হবে, সেখানে অন্য কোনো ধরনের সংগঠনে স্বীয় নীতির সুসঙ্গত প্রচার সম্ভব নয়। তাছাড়া এ প্রশ্নে আমাদের কাছে মার্কসের একনায়কত্ব ছিল কেমন স্বতঃসিদ্ধ তর্কাতীত, আমরা সবাই সাগ্রহে তা মেনে নিয়েছিলাম। মূলত তাঁর

* ল্যান্ডর‍্যাখট — সাবেকী সামন্ত আইন। — সম্পাঃ

স্বচ্ছদৃষ্টি আর দৃঢ় মনোভাবের জন্যই এই পত্রিকাটি বিপ্লবের বছরগুলিতে সবচেয়ে নাম করা জার্মান সংবাদপত্র হয়ে দাঁড়ায়।

Neue Rheinische Zeitung পত্রিকার রাজনৈতিক কর্মসূচিতে দুটো মূলকথা ছিল:

একটি একক অখণ্ড গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র আর রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ, পোল্যাণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সহ।

সেসময়ে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্র দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল: উত্তর-জার্মান, — গণতান্ত্রিক এক প্রুশীয় সম্রাটকে মেনে নিতে আপত্তি ছিল না এদের; আর দক্ষিণ-জার্মান, সেসময়ে প্রায় পুরোপুরিভাবে ও নির্দিষ্টভাবে বাদেনীয় — এরা সুইজারল্যাণ্ডের অনুকরণে জার্মানিকে একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করতে চাইত। উভয়ের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই করতে হল। জার্মানির প্রুশীকরণ আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে তার বিভাগ চিরস্থায়ী করা, দুটোই প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের পক্ষে সমান ক্ষতিকর ছিল। এই স্বার্থরক্ষার জন্য জার্মানিকে চূড়ান্তভাবে একটি **জাতি** হিশেবে ঐক্যবদ্ধ করা একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছিল। একমাত্র এর ফলেই চিরাচরিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্ত বাধা প্রতিবন্ধক থেকে মুক্ত এমন এক যুদ্ধক্ষেত্রের সৃষ্টি হত যেখানে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার পরস্পরের শক্তি যাচাই করার কথা। কিন্তু প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবন্ধনও ছিল প্রলেতারীয় স্বার্থের একান্ত বিরোধী। জার্মানির বিপ্লবের পক্ষে সত্যকারের একমাত্র যে অভ্যন্তরীণ শত্রুকে উচ্ছেদ করা উচিত ছিল সে হল সমস্ত ব্যবস্থাধারা, সমস্ত ঐতিহ্য ও রাজবংশসহ প্রুশীয় রাষ্ট্র, আর তাছাড়া, জার্মানিকে বিভক্ত করে জার্মান অস্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে তবেই শুধু প্রাশিয়া জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারত। প্রুশীয় রাষ্ট্র ধ্বংস ও অস্ট্রীয় রাষ্ট্র চূর্ণ করে প্রজাতন্ত্র হিশেবে জার্মানির সত্যকারের ঐক্যসাধন, এছাড়া আমাদের আর কোনো আশু বিপ্লবী কর্মসূচি থাকতে পারত না। এবং রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের মাধ্যমে, একমাত্র সেই মাধ্যমেই এ কাজ করা যেত। আমি আবার পরে একথায় ফিরে আসব।

সাধারণত আড়ম্বর, গুরুগাম্ভীর্য বা উল্লাসের সুর ছিল না কাগজটিতে। আমাদের বিরোধীরা ছিল সম্পূর্ণই ঘৃণ্য আর বিনা ব্যতিক্রমে তাদের সকলের প্রতিই ছিল আমাদের চরম ঘৃণা। ষড়যন্ত্রকারী রাজতন্ত্র, দরবারী

চক্র, অভিজাততন্ত্র, *Kreuz-Zeitung* (৬৯)—সমগ্র সম্মিলিত 'প্রতিক্রিয়া', যাদের সম্পর্কে কূপমণ্ডূকেরা নৈতিক বিরক্তি বোধ করে থাকে, তাদের প্রতি শুধু ব্যঙ্গ ও উপহাস নিক্ষেপ করতাম আমরা। বিপ্লবের মাধ্যমে রঙ্গমঞ্চে যেসব নতুন পুজ্যজনদের আবির্ভাব ঘটেছিল, অর্থাৎ মার্চ মন্ত্রীবর্গ (৭০), ফ্রাংকফুর্ট ও বার্লিন পরিষদ (৭১) এবং সেখানকার দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় অংশ, তাদের সম্পর্কেও আমাদের আচরণ ছিল একই। প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধেই ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্টের* অকিঞ্চিৎকরতাকে, তার দীর্ঘ বক্তৃতার অনাবশ্যকতাকে, তার ভীরু প্রস্তাবাবলির উদ্দেশ্যহীনতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। তার মূল্য হিশেবে আমাদের শেয়ার-হোল্ডারদের অর্ধেককে হারাতে হয়। ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্টকে এমনকি একটা বিতর্ক ক্লাবও বলা যেত না, সেখানে প্রায় কোনো বিতর্কই হত না, প্রধানত সেখানে শুধু আগে থেকে তৈরি করা পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ পাঠ হত এবং এমন সব প্রস্তাব গৃহীত হত যার উদ্দেশ্য ছিল জার্মান কূপমণ্ডূকদের অনুপ্রেরণা দেওয়া, তবে কেউই সেদিকে দৃষ্টিপাত করত না।

বার্লিন পরিষদের গুরুত্ব এর চেয়ে বেশি ছিল, তাদের বিরুদ্ধে ছিল সত্যিকারের এক শক্তি। শুধু হাওয়ায়, ফ্রাংকফুর্টের মেঘাতীত উচ্চতায় তারা বিতর্ক ও প্রস্তাব গ্রহণ করত না। তাই এদের দিকে বেশি মন দেওয়া হত। কিন্তু সেখানেও শুল্ট্সে-ডেলিচ, বেরেণ্ড্স, এলস্নার, স্টাইন প্রভৃতি বামপন্থীদের পুজ্যজনদের প্রতিও ফ্রাংকফুর্টের পুজ্যজনদের মতোই তীব্র আক্রমণ চালানো হত; তাদের দৃঢ়তার অভাব, ভীরুতা এবং তুচ্ছ হিসাবীপনাকে নির্মমভাবে উদ্ঘাটন করা হত এবং তারা কীভাবে আপস মারফত ধাপে ধাপে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে তা প্রমাণ করে দেওয়া হত। এর ফলে স্বভাবতই গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ারা ত্রাস বোধ করত, এই পুজ্যজনদের তারা সবে সৃষ্টি করেছিল নিজের প্রয়োজনেই। তবে এ আতঙ্কে বোঝা গেল আমাদের বাণ ঠিক লক্ষ্যেই বিঁধেছে।

মার্চের দিনগুলির সঙ্গে সঙ্গেই নাকি বিপ্লব শেষ হয়ে গেছে, আর এখন শুধু তার ফল হস্তগত করা বাকি এই বলে পেটি বুর্জোয়া পরম উৎসাহের সঙ্গে যে বিভ্রান্তি প্রচার করেছিল আমরা তার বিরুদ্ধেও সমান

* ফ. এঙ্গেলস, 'ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্ট' দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

প্রতিবাদ জানাই। আমাদের কাছে ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ সত্যকার বিপ্লবের তাৎপর্য লাভ করত তখনই যদি সেটা একটি দীর্ঘ বিপ্লবী আন্দোলনের শেষ না হয়ে শুরু হত, মহান ফরাসী বিপ্লবের মতো যার মধ্য দিয়ে জনগণ তাদের নিজেদের সংগ্রামের ধারায় বিকশিত হয়ে উঠত আর পার্টিগুলি ক্রমশ আরো তীক্ষ্ণভাবে পৃথক হয়ে বড়ো বড়ো শ্রেণীগুলির সঙ্গে অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণী, পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী আর প্রলেতারীয় শ্রেণীর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যেত আর প্রলেতারিয়েত একাধিক লড়াইয়ের মধ্যে একটির পর একটি পৃথক অবস্থান জয় করে নিত। সুতরাং, আমরা সবাই তো একই জিনিস চাই, সব পার্থক্যের একমাত্র কারণ হল ভুল বোঝাবুঝি, এই বাঁধাবুলির সাহায্যে গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া যখনই প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে তার শ্রেণী-বিরোধের কথা চাপা দিতে চাইত তখনই আমরা সর্বত্র তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতাম। কিন্তু পেটি বুর্জোয়াকে আমরা আমাদের প্রলেতারীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা করার সুযোগ যতই কম দিতাম, আমাদের সম্পর্কে তারা ততই নিরীহ এবং আপসমুখী হয়ে উঠত। যতই তীব্র ও দৃঢ়ভাবে তাদের বিরোধিতা করা যায় ততই তারা নম্র হয়ে ওঠে এবং শ্রমিকদের পার্টিকে ততই সুবিধাদান করতে থাকে। এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হয়ে উঠেছি।

শেষত, আমরা বিভিন্ন তথাকথিত জাতীয় পরিষদের পার্লামেণ্টীয় ক্রেটিনিজম (মার্কসের ভাষায়) উদ্‌ঘাটন করে দিতাম। এই ভদ্রমহোদয়রা ক্ষমতার সব মাধ্যমই হাতছাড়া হয়ে যেতে দিয়েছিলেন — অংশত স্বেচ্ছায় — সেগুলিকে সরকারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে। বার্লিন ও ফ্রাঙ্কফুর্টে নতুন শক্তিপ্রাপ্ত প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের পাশাপাশি ছিল শক্তিহীন পরিষদগুলি। তারা কল্পনা করত যে, তাদের অক্ষম প্রস্তাবাবলি পৃথিবী উলটিয়ে দেবে। চরম বামপন্থী পর্যন্ত সকলেই ছিল এই নির্বোধ আত্মপ্রতারণার শিকার। আমরা তাদের বার বার বলতাম, তাদের পার্লামেণ্টীয় জয়ই হবে কার্যত তাদের যুগপৎ পরাজয়।

আর বার্লিন ও ফ্রাঙ্কফুর্ট দু'জায়গাতেই ঠিক তাই ঘটল। 'বামপন্থীরা' সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার পরিষদকে ভেঙে দিল। সরকার যে এ কাজ করতে পারল তার কারণ হল পরিষদ জনগণের আস্থা হারিয়েছিল।

পরে আমি মারাত সম্পর্কে বুজারের বই পড়ে দেখতে পাই যে, একাধিক ব্যাপারে আমরা না জেনে সত্যিকারের 'Ami du Peuple'-এর (৭২) (রাজতন্ত্রীদের নকল 'জনগণের বন্ধু' নয়) মহান আদর্শ অনুকরণ করেছিলাম এবং যে ক্রুদ্ধ গর্জন ও ইতিহাস বিকৃতির ফলে প্রায় এক শতাব্দী ধরে সবাই সম্পূর্ণ বিকৃত এক মারাতের পরিচয় পেয়ে এসেছিল, তার একমাত্র কারণ হল মারাত নির্মমভাবে সেই মুহূর্তের পূজ্যজনদের অর্থাৎ লাফায়েৎ, বায়ি ও অন্যান্যদের মুখোশ টেনে খুলে দিয়েছিলেন এবং দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা ইতিমধ্যেই বিপ্লবের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আমাদের মতো তিনিও এ ঘোষণা চান নি যে, বিপ্লব শেষ হয়েছে, বরং তিনি চেয়েছিলেন বিপ্লব অবিরাম চলুক।

আমরা খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করলাম যে, আমরা যে ধারার প্রতিনিধি সে ধারা আমাদের পার্টির আসল লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম শুরু করতে পারবে একমাত্র তখনই যখন জার্মানির সমস্ত সরকারী পার্টিগুলির মধ্যে সবচেয়ে চরমপন্থী পার্টিটি ক্ষমতায় আসবে। তখন আমরা হয়ে উঠব তার বিরোধী দল।

কিন্তু ঘটনাচক্রে দাঁড়াল এই যে, আমাদের জার্মান বিরোধীদের ব্যঙ্গ করা ছাড়াও জ্বলাময়ী আবেগও ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। ১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্যারিসের শ্রমিকদের বিদ্রোহ যখন শুরু হয় ততক্ষণে আমরা ঘাঁটি নিয়ে বসেছি। প্রথম গুলিবর্ষণ থেকেই আমরা দৃঢ়ভাবে বিদ্রোহীদের পক্ষ নিলাম। তাদের পরাজয়ের পর মার্কস একটি অত্যন্ত জোরালো প্রবন্ধে পরাজিতদের স্মৃতিতে অঞ্জলি দেন।*

আমাদের অবশিষ্ট শেয়ার-হোল্ডাররাও তখন আমাদের পরিত্যাগ করল। কিন্তু আমরা সন্তুষ্ট এই যে আমাদের পত্রিকা সারা জার্মানি ও প্রায় সারা ইউরোপে একমাত্র পত্রিকা ছিল যে বিধ্বস্ত প্রলেতারিয়েতের পতাকা উচ্চে তুলে ধরেছিল এমন এক মুহূর্তে যখন সব দেশের বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া পরাজিতদের উদ্দেশে কদর্য গালি বর্ষণ করছে।

আমাদের বৈদেশিক নীতি ছিল সরল: প্রতিটি বিপ্লবী জাতির পক্ষ

* কার্ল মার্কস, 'জুন বিপ্লব' দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

সমর্থন এবং ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার শক্তিশালী দুর্গ রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লবী ইউরোপের এক সাধারণ যুদ্ধের জন্য আহ্বান। ২৪ ফেব্রুয়ারি (৭৩) থেকে আমাদের কাছে একথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিপ্লবের সত্যকারের ভয়ংকর শত্রু মাত্র **একটি** — রাশিয়া, এবং আন্দোলন যতই সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছে, সংগ্রামে নামার প্রয়োজনীয়তা এ শত্রুর পক্ষে তত অদম্য হয়ে উঠছে। ভিয়েনা, মিলান ও বার্লিনের ঘটনাবলির ফলে রুশ আক্রমণ অবশ্য বিলম্বিত হবার কথা, কিন্তু বিপ্লব রাশিয়ার যত কাছে এগিয়ে আসছে সেই আক্রমণের অপরিহার্যতা ততই সুনিশ্চিত হয়ে উঠছে। কিন্তু যদি জার্মানিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো যেত তাহলে হাপস্‌বুর্গ এবং হয়েনট্‌সলার্নের শেষ হত এবং বিপ্লব সর্বত্র জয়ী হত।

রুশীরা যখন সত্যি হাঙ্গেরি আক্রমণ করল, সেই মুহূর্ত পর্যন্ত সংবাদপত্রের প্রতিটি সংখ্যায় এই নীতি বিধৃত ছিল। এই আক্রমণ আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী পুরোপুরি প্রমাণ করল এবং সুনিশ্চিত করল বিপ্লবের পরাজয়।

১৮৪৯ সালের বসন্তকালে, যখন চূড়ান্ত সংগ্রামের দিন ঘনিয়ে আসছে তখন প্রতি সংখ্যায় সংবাদপত্রটির সুর তীব্র এবং আবেগদীপ্ত হয়ে উঠতে থাকল। ‘সাইলেসিয়া মিলিয়ার্ড’-এ (৮টি প্রবন্ধ) **ভিলহেল্ম ভলফ** সাইলেসিয়ার কৃষকদের মনে করিয়ে দিলেন যে, তারা যখন সামন্ততান্ত্রিক অধীনতা থেকে মুক্তি পায় তখন সরকারের সাহায্যে জমিদাররা কীভাবে তাদের টাকা ও জমির ব্যাপারে ঠকিয়েছিল এবং তিনি দাবি করলেন যে, ক্ষতিপূরণ হিশেবে শত কোটি টেলার দিতে হবে।

এইসঙ্গে, এপ্রিল মাসে, **মার্কসের** ‘মজুরি-শ্রম ও পুঁজি’* লেখাটি কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত হয়ে আমাদের নীতির সামাজিক লক্ষ্য স্পষ্টভাবে নির্ধারিত করে দিল। যে বিরাট সংগ্রামের প্রস্তুতি চলছিল, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি এবং হাঙ্গেরিতে যে বিরোধ তীব্রতর হয়ে উঠছিল, প্রতি সংখ্যায় ও প্রতি বিশেষ সংখ্যায় তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। বিশেষ করে এপ্রিল ও মে মাসের বিশেষ সংখ্যাগুলিতে ছিল জনগণের উদ্দেশে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান।

* এই সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

আমরা যে ৮০০০ দুর্গসৈন্য ও কারাগার সম্বলিত প্রথম শ্রেণীর এক প্রুশীয় দুর্গের মধ্যে এমন নির্ভয়ে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতাম তাতে জার্মানির সর্বত্র বিস্ময় প্রকাশ করা হত। কিন্তু সম্পাদকদের ঘরে ৮টি বন্দুক ও ২৫০টি কার্তুজ এবং কম্পোজিটরদের লাল জ্যাকোবিন টুপির (৭৪) দরুন আমাদের বাড়িও অফিসারদের কাছে এমন এক দুর্গ বলে প্রতীয়মান হত যা নেহাৎ হানা দিয়ে অধিকার করা সম্ভব নয়।

অবশেষে এল ১৮৪৯ সালের ১৮ মে তারিখের আঘাত।

ড্রেসডেন এবং এলবারফেল্ডে বিদ্রোহ দমিত হল, ইসারলোহ্ন বেষ্টিত হল; রাইন প্রদেশ এবং ওয়েস্টফালিয়া সৈন্যে প্লাবিত হয়ে উঠল। প্রুশীয় রাইনল্যান্ড ধর্ষণের পর তাদের পেলটিনেট ও বাডেনের বিরুদ্ধে পাঠানোর কথা। অবশেষে তখন সরকার আমাদের দিকে এগোবার সাহস পেল। সম্পাদকমন্ডলীর অর্ধেককে অভিযুক্ত করা হল, বাকি অর্ধেক অ-প্রুশীয় বলে নির্বাসিত হলেন। এর বিরুদ্ধে কিছু করা অসম্ভব ছিল, কেননা সরকারের পেছনে রয়েছে পুরো একটা সৈন্যবাহিনী। আমাদের দুর্গ সমর্পণ করতে হল। কিন্তু আমরা পিছু হটে এলাম আমাদের অস্ত্রশস্ত্র রসদ সঙ্গে নিয়ে, ব্যান্ড বাজিয়ে, শেষ লাল সংখ্যার পতাকা উড়িয়ে; তাতে আমরা নিষ্ফল অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কলোনের শ্রমিকদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলাম:

'আপনারা যে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন তার জন্য *Neue Rheinische Zeitung*-এর সম্পাদকরা বিদায়কালে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছে। চিরকাল এবং সর্বত্র তাদের শেষ কথা হবে: **শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি।**'

এইভাবে অস্তিত্বের এক বছর পূর্ণ হওয়ার কিছু আগে *Neue Rheinische Zeitung* পত্রিকার অবসান হল। প্রায় কোনো আর্থিক সম্বল ছাড়াই এটি শুরু হয়েছিল — আমি আগেই বলেছি যে, সামান্য যেটুকুর প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল তা-ও আসে নি, — কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই তার প্রচারসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজারে গিয়ে পেঁছেছিল। কলোনের অবরুদ্ধ অবস্থার ফলে এটি বন্ধ হয়ে যায়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আবার তাকে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। কিন্তু ১৮৪৯ সালের মে মাসে যখন কাগজটি বন্ধ করে দেওয়া হল তখন তার গ্রাহকসংখ্যা আবার ছ'হাজারে

গিয়ে পেঁ'ছেছিল, যে ক্ষেত্রে *Kölnische Zeitung* পত্রিকার (৭৫) নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারেই গ্রাহকসংখ্যা ন'হাজারের বেশি ছিল না। *Neue Rheinische Zeitung*-এর মতো ক্ষমতা ও প্রভাব, তথা প্রলেতারীয় জনগণকে প্রদীপ্ত করে তোলার সামর্থ্য পরে বা আগে কোনো জার্মান সংবাদপত্রের হয় নি।

এবং এর জন্য সে ঋণী সর্বাগ্রে **মার্কসের** কাছে।

যখন আঘাত এল, সম্পাদকীয় বিভাগের সবাই ছড়িয়ে পড়লেন। **মার্কস** প্যারিসে গেলেন — সেখানে নাটকের যে শেষ অংকের প্রস্তুতি চলছিল তা অনুষ্ঠিত হল ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন তারিখে (৭৬); এখন, যখন ওপর থেকে ভেঙে যাওয়া বা বিপ্লবে যোগ দেওয়া এই দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নেওয়ার সময় হল ফ্রাংকফুর্ট পরিষদের, তখন **ভিলহেল্ম ভলফ** পরিষদে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন, আর আমি পেলট্‌নেটে গিয়ে ভিলিখের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে (৭৭) অ্যাডজুট্যাণ্ট হলাম।

১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি এবং মার্চ মাসের গোড়ায় লিখিত

১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ *Der Sozialdemokrat* ১১ নং পত্রিকায় প্রকাশিত

স্বাক্ষর: **ফ. এঙ্গেলস**

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত

জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কমিউনিস্ট লীগের ইতিহাস প্রসঙ্গে (৭৮)

১৮৫২ সালে (৭৯), কলোনের কমিউনিস্টদের দণ্ডাদেশের সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম যুগের উপর যবনিকা পড়ল। আজ এ যুগের কথা প্রায় সবাই ভুলে গেছে। কিন্তু ১৮৩৬ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ যুগ, এবং বিদেশে জার্মান শ্রমিকদের বিস্তারলাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমস্ত সংস্কৃতিমান দেশেই আন্দোলন অবারিত হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়। বর্তমান আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন মূলগতভাবে সে যুগের জার্মান শ্রমিক আন্দোলনেরই সরাসরি ক্রমানুবর্তন। সেটি ছিল সাধারণভাবে **প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন,** এবং পরে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিতে যাঁরা নেতৃত্ব করছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এসেছিলেন এর ভেতর থেকে। আর কমিউনিস্ট লীগ ১৮৪৭ সালের 'কমিউনিস্ট ইশতেহারের'* যে তাত্ত্বিক মূলনীতি তার পতাকায় লিখে নিয়েছিল তা আজো ইউরোপ ও আমেরিকা উভয় মহাদেশের সমগ্র প্রলেতারীয় আন্দোলনের দৃঢ়তম আন্তর্জাতিক বন্ধন হয়ে রয়েছে।

এখন পর্যন্ত এই আন্দোলনের সুসংবদ্ধ ইতিহাসের মূল উৎস একটিই পাওয়া গেছে। এটি হল তথাকথিত কালা কিতাব, ভেমুর্ট ও স্টিবার লিখিত 'উনবিংশ শতাব্দীর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র', বার্লিন, দুই খণ্ড, ১৮৫৩ ও ১৮৫৪। এই স্থূল সংকলনটি ইচ্ছাকৃত বহু মিথ্যাভাষণে পূর্ণ। আমাদের শতকের সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য দুজন পুলিশ এটি উদ্ভাবন করেছে। তবু সে যুগ সম্পর্কে অ-কমিউনিস্ট সমস্ত রচনার আদি উৎস এখনো এটিই।

---

* এই সংস্করণের ১ খণ্ড, ১৪১-১৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

আমি এখানে শুধু সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনাই দিতে পারি এবং তাও যে পরিমাণে লীগের কথা আসে কেবল সেই পরিমাণে এবং 'স্বরূপ প্রকাশ' বোঝার জন্য যেটুকু একান্ত প্রয়োজন শুধু সেটুকুই। আশা করি, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের যৌবনের সেই গৌরবময় পর্বের ইতিহাস সম্পর্কে আমি ও মার্কস যে মূল্যবান তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছি তা গুছিয়ে তোলার সুযোগ আমি হয়ত কোনোদিন পাব।

* * *

জার্মান দেশান্তরীগণ কর্তৃক ১৮৩৪ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক-প্রজাতন্ত্রী গুপ্ত 'বিধিবহির্ভূতদের' লীগ থেকে সবচেয়ে চরমপন্থী ও প্রধানত প্রলেতারীয় অংশটি ১৮৩৬ সালে আলাদা হয়ে গিয়ে নতুন একটি গুপ্ত সংগঠন, **ন্যায়নিষ্ঠদের লীগ** গঠন করল। আদি যে সংগঠনে বাকি ছিল কেবল ইয়াকব ভেনেডে-র মতো অতি নিষ্কর্মারা, সেটির শীঘ্রই পুরোপুরি মৃত্যু হল: ১৮৪০ সালে যখন পুলিশ জার্মানিতে এদের কয়েকটি শাখা খুঁজে বের করে তখন তাদের আসল চেহারার ছায়াটুকু পর্যন্ত প্রায় অবশিষ্ট নেই। কিন্তু নতুন লীগটি তুলনামূলকভাবে দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকল। বাব্যেফবাদ (৮০) ধারার সঙ্গে যুক্ত যে ফরাসী শ্রমিক কমিউনিজম এই সময়ে প্যারিসে গড়ে উঠছিল, এটি গোড়ায় ছিল তারই জার্মান অংশবিশেষ; 'সাম্যের' অপরিহার্য ফল হিশেবে সম্পত্তির সাধারণ মালিকানা দাবি করা হত। উদ্দেশ্য ছিল সে যুগের প্যারিসের গুপ্ত সংগঠনগুলির মতোই: অর্ধেক প্রচারমূলক সংগঠন, অর্ধেক ষড়যন্ত্রমূলক। তবে প্যারিসকেই বরাবর বিপ্লবী কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল হিশেবে ধরা হত, যদিও সুযোগ এলে জার্মানিতেও অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি বাদ যেত না। কিন্তু প্যারিস চূড়ান্ত যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে রইল বলে লীগ সে যুগে আসলে ফরাসী গুপ্ত সংগঠনের, বিশেষ করে ব্লাঙ্কি ও বার্বে পরিচালিত যে Société des saisons-এর* সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখত, তার জার্মান শাখার বেশি কিছু হয়ে ওঠে নি। ১৮৩৯ সালে ১২ মে ফরাসীরা অভ্যুত্থান শুরু করল। লীগের শাখারাও এগিয়ে যায় তাদের সঙ্গে এবং তাদের সঙ্গেই একত্রে সাধারণ পরাজয় বরণ করে (৮১)।

* ঋতু সমিতি। — সম্পাঃ

যেসব জার্মান গ্রেপ্তার হল তাদের মধ্যে ছিলেন **কার্ল শাপার** ও **হাইনরিখ বাউয়েরও**। বেশ দীর্ঘদিন কারাবাসের পর তাঁদের নির্বাসন দিয়ে তুষ্টি লাভ করল লুই ফিলিপের সরকার। দুজনেই লণ্ডনে চলে গেলেন। শাপার এসেছিলেন নাসাউয়ের ওয়েলবুর্গ থেকে। ১৮৩২ সালে তিনি যখন গিয়েসেনে বনবিদ্যা কলেজের ছাত্র তখনই গিওর্গ ব্যুখনার পরিচালিত ষড়যন্ত্রমূলক সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৩৩ সালের ৩ এপ্রিল ফ্রাঙ্কফুর্টের পুলিশ-ফাঁড়ি (৮২) আক্রমণে অংশ নেন, তারপর বিদেশে পালিয়ে যান এবং ১৮৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাৎসিনির স্যাভয় (৮৩) অভিযানে যোগ দেন। ৩০-এর দশকে যেসব পেশাদার বিপ্লবীর কিছুটা ভূমিকা ছিল, তিনি ছিলেন তাদের নিদর্শনস্বরূপ — দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ, যে কোনো মুহূর্তে জীবন সম্পদ এমনকি জীবনটাই বিপন্ন করতে তৈরি এক বীরপুরুষ। চিন্তাধারায় কিছুটা আলস্য থাকা সত্ত্বেও গভীর তাত্ত্বিক উপলব্ধির ক্ষমতাও তাঁর ছিল, তার প্রমাণ 'ডেমাগগ' (৮৪) থেকে তিনি রূপান্তরিত হলেন কমিউনিস্টে, এবং একবার যে জিনিসটা স্বীকার করে নিলেন তা আঁকড়ে রইলেন আরো অটলভাবে। ঠিক এই কারণেই সময়ে সময়ে তাঁর বিপ্লবী উদ্দীপনা বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে যেত। তবে সবক্ষেত্রেই তিনি পরে নিজের ভুল বুঝতেন এবং খোলাখুলিভাবে তা স্বীকার করতেন। তিনি ছিলেন বিরাট পুরুষ আর জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের আদি সংগঠনের কাজে তাঁর অবদান কোনোদিনই ভোলার নয়।

ফ্রাঙ্কনিয়ার হাইনরিখ বাউয়ের জুতা তৈরি করতেন। সজীব, সজাগ ও রসিক তরুণ। কিন্তু তাঁর ক্ষুদ্র দেহে অনেকখানি চাতুর্য ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাও লুকিয়ে ছিল।

প্যারিসে শাপার কম্পোজিটারের কাজ করতেন। লণ্ডনে এসে তিনি ভাষা শিক্ষক হিশেবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা শুরু করলেন। আর দুজনেই লেগে গেলেন ছিন্ন সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে। লণ্ডনকে তাঁরা লীগের কেন্দ্র করে তুললেন। এখানে, হয়ত বা আরো আগে প্যারিসেই, তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন কলোনের ঘাড়ি নির্মাতা **জোসেফ মল্**। মাঝারি আকারের, হার্কিউলিসের মতো চেহারা তাঁর। কতবার যে শাপার ও তিনি হলের দরজায় দাঁড়িয়ে শতখানেক বিরোধীর আক্রমণ রুখেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

উৎসাহ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দিক থেকে তিনি তাঁর দুই কমরেডেরই সমতুল্য আর বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে উভয়েরই ঊর্ধ্বে। শুধু এই নয় যে তিনি একজন আজন্ম কূটনীতিক, যার প্রমাণ হয়ে যায় বিভিন্ন দৌত্যে তাঁর অসংখ্য সফরের সাফল্য থেকে। তাত্ত্বিক সমস্যায়ও তাঁর সামর্থ্য ছিল বেশি। ১৮৪৩ সালে লণ্ডনে এই তিনজনেরই সঙ্গে আমার আলাপ হয়। এঁরাই হলেন আমার দেখা প্রথম বিপ্লবী প্রলেতারীয়। সেসময় খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাদের যতই মত পার্থক্য থাকুক না কেন — তাঁদের সংকীর্ণ সমতাবাদী কমিউনিজমের* বিপরীতে আমার ছিল ঠিক সমান সংকীর্ণ দার্শনিক ঔদ্ধত্য — এই সত্যকারের মানুষ তিনটি আমার মনে যে গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছিলেন সেকথা কোনোদিন ভুলব না আমি, যে আমি তখন সবে মানুষ হতে চাইছি।

লণ্ডনে, এবং আরেকটু কম মাত্রায় সুইজারল্যাণ্ডে, তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ও সভাসমিতি করার স্বাধীনতা উপভোগ করতেন। ১৮৪০ সালের ৭ ফেব্রুয়ারিতেই জার্মান শ্রমিকদের শিক্ষা-সমিতি নামে আইনসঙ্গত সংগঠন হল। এটি এখনও আছে (৮৫)। এই সমিতি লীগে নতুন সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্র হিশেবে কাজ করত, এবং বরাবরের মতো এখানেও কমিউনিস্টরাই সমিতির সবচেয়ে সক্রিয় ও বুদ্ধিমান সদস্য ছিল বলে স্বাভাবিকভাবেই তার নেতৃত্ব পুরোপুরিভাবে গিয়ে পড়ল লীগের হাতে। কিছুদিনের মধ্যেই লণ্ডনে লীগের কয়েকটি সমিতি, বা তখনো পর্যন্ত তাদের যা বলা হত 'লজ' গড়ে উঠল। সুইজারল্যাণ্ডে ও অন্যান্য জায়গাতেও ঠিক একই স্বতঃসিদ্ধ নীতি অনুসরণ করা হল। যেখানে শ্রমিকদের সমিতি গড়া সম্ভব হত, সেখানেই সেগুলিকে একইভাবে কাজে লাগানো হত। যেখানে সমিতি গড়া বেআইনী ছিল সেখানে গায়ক সঙ্ঘ, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে যোগ দেওয়া হত। যোগাযোগ রক্ষা করা হত প্রধানত এমন সব সদস্য দিয়ে যারা অনবরত যাতায়াত করত। প্রয়োজন হলে তারা দূত হিশেবেও কাজ করত। সরকারের বিচক্ষণতা লীগকে উভয় ব্যাপারেই খুব সাহায্য করত। কারণ, নির্বাসনদণ্ড প্রয়োগ করে সরকার যে কোনো আপত্তিজনক শ্রমিককেই দূতে পরিণত

* আগেই বলেছি সমতাবাদী কমিউনিজম বলতে আমি বুঝি শুধুমাত্র সেই কমিউনিজম যার একমাত্র বা প্রধান ভিত্তি হল সমতার দাবি। (এঙ্গেলসের টীকা।)

করত। আর এই ধরনের শ্রমিকদের দশজনের মধ্যে ন'জনই ছিল লীগের সদস্য।

পুনঃস্থাপিত লীগ বেশ বিস্তারলাভ করল। বিশেষত সুইজারল্যান্ডে **ভেইটলিং, আগস্ট বেকার** (খুবই প্রতিভাবান লোক, কিন্তু অন্যান্য বহু জার্মানের মতো চরিত্রের অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তার অভাবে এঁরও সর্বনাশ হয়) এবং অন্যান্যরা মোটামুটিভাবে ভেইটলিং-এর কমিউনিস্ট ব্যবস্থার অনুগামী একটা খুবই শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুললেন। ভেইটলিং-এর কমিউনিজমের সমালোচনা করার জায়গা এটা নয়। কিন্তু জার্মান প্রলেতারিয়েতের প্রথম স্বাধীন তাত্ত্বিক আলোড়ন হিশেবে তাৎপর্যের কথা বলতে গিয়ে মার্কস ১৮৪৪ সালে প্যারিসে *Vorwärts* পত্রিকায় যা লিখেছিলেন তা আমি আজো সমর্থন করি। মার্কস লিখেছিলেন: '(জার্মান) বুর্জোয়া তথা তার দার্শনিকবৃন্দ ও পণ্ডিতবর্গ বুর্জোয়ার মুক্তির বিষয়ে — তার রাজনৈতিক মুক্তির বিষয়ে — এমন কোন রচনা হাজির করতে পারে যা ভেইটলিং-এর 'সামঞ্জস্য ও স্বাধীনতার গ্যারাণ্টি' বইটির সঙ্গে তুলনীয়? জার্মান শ্রমিকদের এই অতুলনীয় ও উজ্জ্বল প্রথম প্রচেষ্টার সঙ্গে জার্মান রাজনৈতিক সাহিত্যের একঘেয়ে ভীরু মাঝারিপনার তুলনা করলে, প্রলেতারিয়েতের শিশুকালের এই বিরাট পাদুকার সঙ্গে বুর্জোয়ার ক্ষয়প্রাপ্ত রাজনৈতিক পাদুকার বামনাকারের তুলনা করলে এ ভবিষ্যদ্বাণী করতেই হবে যে, এই সিণ্ডারেলার দেহ হবে মল্লবীরোচিত।' এই মল্লবীর আজ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যদিও পূর্ণ অবয়ব পেতে তার এখনো দেরি আছে।

জার্মানিতেও লীগের অনেক শাখা ছিল। স্বভাবতই এগুলির প্রকৃতি ছিল অস্থায়ী। কিন্তু যতগুলি ভেঙে যেত তার চেয়ে গড়ে উঠত অনেক বেশি। সাত বছর পরেই কেবল ১৮৪৬ সালের শেষে পুলিশ বার্লিনে (মেণ্টেল) ও মাগডেবুর্গ (বেক) লীগের অস্তিত্বের চিহ্ন পায়, কিন্তু আর বেশি খোঁজ বার করতে পারে নি।

প্যারিস থেকে সুইজারল্যাণ্ডে যাবার আগে ভেইটলিংও সেখানে লীগের বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে একত্রিত করলেন। তিনি ১৮৪০ সালেও প্যারিসে ছিলেন।

লীগের কেন্দ্র ছিল দর্জিরা। সুইজারল্যান্ড, লন্ডন, প্যারিস—সর্বত্রই জার্মান দর্জিদের দেখা মিলত। প্যারিসে দর্জিদের মধ্যে জার্মান ভাষার প্রচলন এত বেশি ছিল যে, ১৮৪৬ সালে সেখানে আমার এমন একজন নরওয়েজীয় দর্জির সঙ্গে আলাপ হয় যিনি ট্রন্ধজেম থেকে সোজা সমুদ্রপথে ফ্রান্সে এসেছেন এবং ১৮ মাসে ফরাসী ভাষার প্রায় একটা কথাও না শিখলেও জার্মান শিখেছেন অতি চমৎকার। ১৮৪৭ সালে প্যারিসে সমিতিগুলির মধ্যে দুটি ছিল প্রধানত দর্জিদের নিয়ে তৈরি আর একটি আসবাব-বানিয়ে সূত্রধরদের নিয়ে।

ভারকেন্দ্র প্যারিস থেকে লন্ডনে সরে আসার পর একটা নতুন বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠল: জার্মান লীগ ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠল **আন্তর্জাতিক**। শ্রমিক সমিতিতে জার্মান এবং সুইস ছাড়া আরো এমন সব জাতির লোক দেখা যেত যাদের প্রধানত জার্মান ভাষার মাধ্যমেই বিদেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হত—অর্থাৎ স্ক্যান্ডিনেভীয়, ওলন্দাজ, হাঙ্গেরীয়, চেক, দক্ষিণ স্লাভ এবং রুশ ও আলসেসীয়দেরও। ১৮৪৭ সালে নিয়মিত যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে রক্ষিবাহিনীর ইউনিফর্ম পরিহিত একজন ব্রিটিশ গ্রিনেডিয়ারও ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সমিতির নাম দাঁড়াল **কমিউনিস্ট** শ্রমিক শিক্ষা-সমিতি। আর সদস্যদের কার্ডে 'সব মানুষই ভাই' এই কথাটি লেখা থাকত অন্তত বিশটি ভাষায়, অবশ্য দু'-চারটে ভুল যে তাতে থাকত না তা নয়। প্রকাশ্য সমিতিটির মতো গুপ্ত লীগের চরিত্রও কিছুদিনের মধ্যেই আরো আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করল। প্রথম দিকে সেটা অবশ্য সীমাবদ্ধ অর্থে: কার্যক্ষেত্রে — সদস্যদের বিভিন্ন জাতিসত্তার মারফত, আর তত্ত্বের ক্ষেত্রে — এই উপলব্ধির মাধ্যমে যে, যে কোনো বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হতে গেলে তা ইউরোপীয় বিপ্লব হওয়া চাই। তখন পর্যন্ত আর বেশি দূর এগোনো যায় নি, কিন্তু ভিত্তিটা পাতা ছিল।

ফরাসী বিপ্লবীদের সঙ্গে লীগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা হল লন্ডনস্থ দেশান্তরীদের, ১৮৩৯ সালের ১২ মে তারিখের সংগ্রামসঙ্গীদের মাধ্যমে। র‍্যাডিকেল-পন্থী পোলদের সঙ্গেও তেমনি যোগাযোগ রাখা হত। পোলীয় দেশান্তরী বলে যাঁরা সরকারীভাবে পরিচিত তাঁরা এবং মাৎসিনি অবশ্য আমাদের বন্ধুর বদলে বরং বিরোধীই ছিলেন। ইংরেজ চার্টিস্টদের

আন্দোলনের বিশিষ্ট ইংরেজ চরিত্রের দরুন তাঁদের অবিপ্লবী বলে উপেক্ষা করা হত। অনেক পরে, আমার মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে লীগের লণ্ডনস্থ নেতাদের যোগাযোগ হয়।

ঘটনাবলির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দিকেও লীগের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছিল। তখনো পর্যন্ত প্যারিসকে — সেকালের পক্ষে সঙ্গত কারণেই — বিপ্লবের উৎসস্থল বলে মনে করা হলেও প্যারিসের ষড়যন্ত্রকারীদের উপর নির্ভরশীলতা ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছিল। লীগের বিস্তারলাভের ফলে তার আত্মসচেতনতাও বৃদ্ধি পেল। বোঝা গেল যে, জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে লীগের ভিত্তি ক্রমেই দৃঢ় হয়ে উঠছে আর উত্তর ও পূর্ব ইউরোপের শ্রমিকদের পতাকাবাহী রূপে কাজ করার ঐতিহাসিক নির্বন্ধ এসে পড়েছে এই জার্মান শ্রমিকদের উপর। ভেইটলিং-এর মধ্যে এমন একজন কমিউনিস্ট তাত্ত্বিককে পাওয়া গিয়েছিল যাঁকে অসংকোচে তাঁর সমসাময়িক ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বীদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেওয়া যেত। আর শেষ কথা, ১২ মে-র অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই জিনিসটা শিখেছিলাম যে, বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে তখনকার মতো কোনো ফল হবে না। তবু যে প্রতি ঘটনাকেই আসন্ন ঝড়ের সংকেত বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হত, তবু যে পুরনো আধা-ষড়যন্ত্রমূলক নিয়মাবলিই অক্ষুণ্ণ রাখা হত, তা ছিল প্রধানত পুরনো বিপ্লবীদের একগুঁয়েমির দোষ, যার সঙ্গে ক্রমশ উদীয়মান সঠিকতর মতবাদের সংঘর্ষ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, লীগের সামাজিক মতবাদ অনির্দিষ্ট হলেও তার মস্ত বড়ো একটা গলদ ছিল, যার মূল ছিল তখনকার পরিস্থিতির মধ্যেই। সদস্যদের মধ্যে যারা শ্রমিক তারা প্রায় সবাই ছিল হস্তশিল্পী। বড়ো বড়ো শহরগুলিতেও সাধারণত ক্ষুদ্র মালিকই তাদের শোষণ করত। দর্জির হস্তশিল্পকে একজন বৃহৎ পুঁজিপতির স্বার্থে চালানো একটা গার্হস্থ্য শিল্পে পরিণত করে বৃহদাকারে দর্জিবৃত্তি, অর্থাৎ যাকে এখন বলা হয় তৈরি পোশাকের উৎপাদন, সেরূপ শোষণ এমনকি লণ্ডনেও তখন সবে শুরু হচ্ছে। একদিকে এই কারিগরদের শোষণ করত ক্ষুদ্র মালিক। অন্যদিকে তারা প্রত্যেকেই আশা রাখত যে, শেষে তারা নিজেরাই ক্ষুদ্র মালিক হয়ে উঠবে। তার উপর সেসময়ে জার্মান হস্তশিল্পীদের মনে

উত্তরাধিকার-সূত্রে-প্রাপ্ত বহু গিল্ডযুগীয় ধারণাও থেকে গিয়েছিল। তারা তখনো পুরোপুরি প্রলেতারীয় হয়ে ওঠে নি, তখন পর্যন্ত তারা ছিল পেটি বুর্জোয়ার উপাঙ্গ মাত্র। এই উপাঙ্গটি তখন আধুনিক প্রলেতারিয়েতে রূপান্তরিত হচ্ছে, কিন্তু বুর্জোয়া অর্থাৎ বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে সরাসরিভাবে তখন পর্যন্ত দাঁড়ায় নি। তাহলেও এই হস্তশিল্পীরা যে সহজাত প্রবৃত্তিবশে নিজেদের ভবিষ্যৎ বিকাশের ধারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে না হলেও নিজেদের যে তারা প্রলেতারিয়েতের পার্টি হিশেবে সংগঠিত করতে পেরেছিল, সেইজন্যই তাদের সর্বোচ্চ সম্মান প্রাপ্য। কিন্তু তখনকার সমাজকে খুঁটিনাটিতে সমালোচনা করতে গেলেই অর্থাৎ অর্থনৈতিক তথ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গেলেই তাদের হস্তশিল্পসুলভ পুরনো সব কুসংস্কার প্রতিপদেই যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, সেটাও অনিবার্য। আর আমার বিশ্বাস হয় না যে, পুরো লীগের মধ্যে তখন এমন একজন লোকও ছিলেন যিনি অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে একটি বইও পড়েছেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু এসে যেত না। তখনকার মতো 'সমতা', 'ভ্রাতৃত্ব' ও 'ন্যায়'-এর সাহায্যে তারা তাত্ত্বিক সব বাধা পার হয়ে যেত।

ইতিমধ্যে লীগের ও ভেইটলিং-এর কমিউনিজমের পাশাপাশি আরেকটি মূলগতভাবে আলাদা ধরনের কমিউনিজম বিকাশলাভ করছিল। আমি যখন ম্যাঞ্চেস্টারে ছিলাম তখন আমায় ঠেকে শিখতে হয় যে, এতদিন পর্যন্ত যদিও অর্থনৈতিক তথ্যাবলি ইতিহাস রচনায় কোনোও স্থানই পায় নি বা নিতান্ত তুচ্ছ স্থানই পেয়েছে, তবু, অন্তত আধুনিক জগতে তা এক নির্ধারক ঐতিহাসিক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে; এই অর্থনৈতিক তথ্যাবলিই হল আজকের দিনের শ্রেণীবিরোধ উদ্ভবের ভিত্তি; বৃহৎ শিল্পের কল্যাণে যেসব দেশে এইসব শ্রেণীবিরোধ পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে, সুতরাং বিশেষভাবে ইংলণ্ডে, সেসব দেশে তা আবার রাজনৈতিক পার্টিগঠনের ও পার্টি-সংঘাতের, আর তার ফলে সব রাজনৈতিক ইতিহাসেরও ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কসও এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যেই *Deutsche-Französische Jahrbücher*-এ (১৮৪৪) (৮৬) তিনি তার এই মর্মে সাধারণীকরণ হাজির করেন যে, সাধারণভাবে বলতে গেলে রাষ্ট্র

নাগরিক সমাজকে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে না বরং সমাজই রাষ্ট্রকে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেইহেতু অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও তার বিকাশ থেকেই রাজনীতি ও তার ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতে হবে, বিপরীতভাবে নয়। ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে আমি প্যারিসে মার্কসের সঙ্গে দেখা করি তখন তত্ত্বগত সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাদের পূর্ণ মতৈক্য পরিষ্কার হয়ে উঠল। আর তখন থেকেই শুরু হয় আমাদের মিলিত কাজ। ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে ব্রাসেল্সে আবার যখন আমাদের দেখা হয় তার মধ্যেই মার্কস উপরিউক্ত ভিত্তি থেকে ইতিহাসের বস্তুবাদী তত্ত্বকে তার প্রধান দিকগুলিতে পুরোপুরি বিকশিত করে তুলেছেন। এবার আমরা এই নব-অর্জিত দৃষ্টিভঙ্গিকে বিভিন্নতম দিকে বিশদে সংরচিত করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম।

এই যে আবিষ্কারটি ইতিহাসবিজ্ঞানে বিপ্লব এনেছিল, সেটা আমরা দেখেছি প্রধানত মার্কসেরই কীর্তি, এতে আমি খুবই নগণ্য অংশই দাবি করতে পারি। তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনে কিন্তু এ আবিষ্কারের একটা প্রত্যক্ষ গুরুত্বও ছিল। ফরাসী ও জার্মানদের মধ্যে কমিউনিজমকে, ইংরেজদের মধ্যে চার্টিস্টবাদকে তখন আর মনে হল না এমন এক আকস্মিক ঘটনা বলে, যা একই ভাবে না-ও ঘটতে পারত। এখন বোঝা গেল যে, এইসব আন্দোলন হল আধুনিক শোষিত শ্রেণী, প্রলেতারিয়েতের আন্দোলন, শাসক শ্রেণী, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে তার ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় সংগ্রামের ন্যূনাধিক বিকশিত বিভিন্ন রূপ, শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ, কিন্তু আগেকার সব শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে, সমগ্রভাবে সমাজকে শ্রেণী-বিভাগ থেকে এবং ফলত শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে মুক্ত না করে আজকের দিনের শোষিত শ্রেণী, প্রলেতারিয়েত নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। এখন আর কমিউনিজমের মানে কল্পনার সাহায্যে যতদূর সম্ভব নিখুঁত এক আদর্শ সমাজ বানিয়ে তোলা নয়, এখন কমিউনিজমের মানে দাঁড়াল প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের প্রকৃতি, শর্তাবলি আর তদনুযায়ী সংগ্রামের সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি।

আমাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে, নতুন এইসব বৈজ্ঞানিক ফলাফল মস্ত মস্ত বইয়ে শুধু 'পণ্ডিত' মহালকে জানানো হবে। আমাদের মত ছিল

ঠিক বিপরীত। ইতিমধ্যে আমরা উভয়েই রাজনৈতিক আন্দোলনে বেশ গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়েছি, শিক্ষিত মহলে, বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানির শিক্ষিত মহলে, আমাদের বেশ কিছু সমর্থকও ছিল, আর সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে ছিল প্রচুর যোগাযোগ। আমাদের মতবাদের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি রচনা করা আমাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতকে এবং প্রথমত জার্মান প্রলেতারিয়েতকে আমাদের মতে টেনে আনার গুরুত্বও কিছু কম ছিল না। আমাদের ধারণা নিজেদের কাছে পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কাজ শুরু করে দিলাম। আমরা ব্রাসেল্‌সে একটি জার্মান শ্রমিক সমিতি (৮৭) গড়লাম আর *Deutsche-Brüsseler-Zeitung* পত্রিকা তুলে নিলাম নিজেদের হাতে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত এ পত্রিকাটি আমাদের মুখপত্র হিশেবে কাজ করেছে। চার্টিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রীয় মুখপত্র *The Northern Star* (৮৮) পত্রিকার সম্পাদক জুলিয়ান হার্নি-র মাধ্যমে আমরা এই আন্দোলনের বিপ্লবী অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। ঐ পত্রিকায় আমিও লিখতাম। ব্রাসেল্‌স্‌ গণতন্ত্রীদের সঙ্গেও (মার্কস ছিলেন গণতান্ত্রিক সমিতির (৮৯) সহসভাপতি) আর *Réforme*-এর (৯০) ফরাসী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গেও আমরা এক ধরনের জোট গড়ে তুলেছিলাম। *Réforme* পত্রিকায় আমি ইংরেজী ও জার্মান আন্দোলনের খবর সরবরাহ করতাম। সংক্ষেপে বলা যায়, র‍্যাডিকেল ও প্রলেতারীয় সংগঠনাদি ও তাদের মুখপত্রগুলির সঙ্গে আমাদের আশানুরূপ যোগাযোগই ছিল।

ন্যায়নিষ্ঠদের লীগের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল নিম্নরূপ: ঐ লীগের অস্তিত্বের কথা আমরা অবশ্য জানতাম; ১৮৪৩ সালে শাপার প্রস্তাব করেছিলেন যেন আমি ঐ লীগে যোগ দিই। আমি স্বভাবতই তখন রাজি হই নি। কিন্তু লন্ডনবাসীদের সঙ্গে নিয়মিত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান তো আমরা চালাতামই; উপরন্তু প্যারিস গোষ্ঠীগুলির তদানীন্তন নেতা ডাঃ এভেরবেকের সঙ্গে রেখেছিলাম আরো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। লীগের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে না গিয়েও আমরা গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনারই খবর রাখতাম। অন্যদিকে, মৌখিক আলাপে, চিঠিপত্রে আর প্রেসের মাধ্যমে আমরা লীগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের তাত্ত্বিক মতামতের

উপর প্রভাব বিস্তার করতাম। এই উদ্দেশ্যে আমরা লিথোগ্রাফ করা নানা সার্কুলারেরও সাহায্য নিতাম, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেগুলি আমরা সারা পৃথিবীতে আমাদের বন্ধু ও পত্রদাতাদের কাছে পাঠিয়ে দিতাম যখন প্রশ্ন উঠত নির্মীয়মাণ কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে। কখনো কখনো এইসব সার্কুলারে লীগের আলোচনাও থাকত। যেমন, একজন তরুণ ওয়েস্টফালীয় ছাত্র হের্মান ক্রিগে আমেরিকায় গিয়ে সেখানে লীগের দূত হয়ে দাঁড়ায় এবং পাগলাটে হ্যারো হ্যারিঙের সঙ্গে যোগ দেয়। লীগের মাধ্যমে দক্ষিণ আমেরিকাকে উল্টে দেবার জন্য একটা সংবাদপত্র (৯১) প্রতিষ্ঠা করে তাতে সে লীগের নামে প্রচার করতে থাকল এক 'প্রেমভিত্তিক', প্রেমে ভরপুর, প্রেমের স্বপ্নে ভাবালু কমিউনিজম। এর বিরুদ্ধে একটা সার্কুলার ছাড়ি আমরা, তার ফলও হল।* লীগের মঞ্চ থেকে ক্রিগে অন্তর্হিত হল।

পরে ভেইটলিং ব্রাসেল্‌সে আসেন। কিন্তু যে সরল তরুণ সহকারী দর্জি একদিন নিজের প্রতিভায় নিজেই বিস্মিত হয়ে কমিউনিস্ট সমাজ ঠিক কেমন দেখতে হবে সেটা নিজের মনের কাছে পরিষ্কার করে নেবার চেষ্টা করেছিল, সে ভেইটলিং আর নেই। এখন তিনি একজন মহাপুরুষ, যাঁর শ্রেষ্ঠত্বের দরুন হিংসুটেরা তাঁর পেছনে লাগে, সর্বত্রই যিনি প্রতিদ্বন্দ্বী, গুপ্ত শত্রু আর ফাঁদের সন্ধান পান, দেশ থেকে দেশান্তরে বিতাড়িত এক পয়গম্বর; মর্ত্যলোকে স্বর্গ রচনার তৈরি দাওয়াই রয়েছে তাঁর কাছে আর তাঁর বদ্ধমূল ধারণা সবাই নাকি সেটি তাঁর কাছ থেকে চুরি করে নিতে চায়। লন্ডনে লীগের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর ইতিমধ্যেই মনোমালিন্য হয়ে গেছে। ব্রাসেল্‌সে মার্কস ও তাঁর স্ত্রী প্রায় অমানুষিক সহ্যশক্তি নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানেও কারুর সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হল না। তাই কিছুদিন পরেই তিনি আমেরিকায় চলে যান তাঁর পয়গম্বরী ভূমিকাটা সেখানে যাচাই করে দেখার জন্য।

লীগের মধ্যে, বিশেষত লন্ডনস্থ নেতাদের মধ্যে যে নীরব বিপ্লব সাধিত হচ্ছিল তা এইসব পরিস্থিতিতে সুগম হয়। কমিউনিজমের

---

* ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস, 'ক্রিগের বিরুদ্ধে সার্কুলার'। — সম্পাঃ

পূর্ববর্তী সব ফরাসী সহজ সমতাবাদী ধারা আর ভেইটলিঙের কমিউনিজম এই উভয় ধারণার অপ্রতুলতাই ক্রমশ তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ভেইটলিঙের লেখা 'দরিদ্র পাপীর সুসমাচার' বইটির কয়েকটি অংশ যতই প্রতিভাদীপ্ত হোক না কেন, তিনি যে আদিম খ্রীষ্টীয় ধর্ম থেকে কমিউনিজম টানতে চান তার ফলে সুইজারল্যাণ্ডে আন্দোলন প্রথমে আলব্রেখ্টের মতো বোকাদের হাতে আর পরে কুলমানের মতো লোভী প্রবঞ্চক পয়গম্বরদের হাতে অনেকখানি চলে যায়। কিছু সাহিত্যিক যে 'খাঁটি সমাজতন্ত্রের' কথা প্রচার করেছিলেন — অর্থাৎ বিকৃত হেগেলীয় জার্মান ভাষায় ফরাসী সমাজতন্ত্রী বুলির এই যে অনুবাদ ও ভাবপ্রবণ প্রেমস্বপ্ন ('কমিউনিস্ট ইশতেহারে'* জার্মান বা 'খাঁটি' সমাজতন্ত্রের অংশ দ্রষ্টব্য) ক্রিগে ও তৎসংশ্লিষ্ট চর্চার মাধ্যমে লীগের মধ্যে চালু হয়েছিল, তা অচিরেই লীগের পুরনো বিপ্লবীদের কাছে বিরক্তিকর বোধ হল আর কিছুর জন্য না হলেও অন্তত তার লোল অক্ষমতার জন্য। আগেকার তাত্ত্বিক মতামতের অনুত্তীর্ণতা এবং সে মতামত থেকে উদ্ভূত ব্যবহারিক ভ্রান্তির জন্য লণ্ডনে ক্রমেই বেশি করে উপলব্ধি ঘটল যে, মার্কস ও আমার নতুন তত্ত্ব সঠিক। এ উপলব্ধি নিশ্চয় আরো সুগম হয়েছিল এইজন্য যে, লণ্ডনের নেতাদের মধ্যে তখন এমন দুজন লোক ছিলেন যাঁরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের সামর্থ্যে পূর্বোল্লিখিত সবার অনেক ঊর্ধ্বে। এ'রা হলেন: হিলব্রনের মিনিয়েচর শিল্পী কার্ল ফেণ্ডার আর থুরিঙ্গিয়ার দর্জি গেওর্গ একারিয়স।**

মোটকথা, ১৮৪৭ সালের বসন্তকালে মল্ ব্রাসেল্সে মার্কসের সঙ্গে আর ঠিক তার পরই প্যারিসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন আর তাঁর

---

* এই সংস্করণের ১ খণ্ড, ১৪১-১৭৯ পৃঃ। — সম্পাঃ

** প্রায় আট বছর আগে লণ্ডনে ফেণ্ডারের মৃত্যু হয়। আশ্চর্যরকম সূক্ষ্ম মেধা ছিল তাঁর। কৌতুকপ্রিয়, ব্যঙ্গপটু ও দ্বন্দ্ববাদী লোক ছিলেন তিনি। আমরা জানি যে, একারিয়স পরে বহু বছর শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। এই সাধারণ পরিষদে অন্যান্যদের মধ্যে লীগের নিম্নলিখিত পুরনো সদস্যরাও ছিলেন: একারিয়স, ফেণ্ডার, লেসনার, লখনার, মার্কস ও আমি। একারিয়স পরে পুরোপুরিভাবে ইংলণ্ডের ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

কমরেডদের তরফ থেকে আরেকবার আমাদের লীগে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি জানালেন যে, তাঁরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণ যথার্থতা এবং লীগের পুরনো ষড়যন্ত্রমূলক ঐতিহ্য ও রূপ থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমান নিঃসন্দেহ হয়েছেন। আমরা যদি লীগে যোগ দিই তাহলে একটি ইশতেহারে লীগের কংগ্রেসের সামনে আমাদের সমালোচনামূলক কমিউনিজম ব্যাখ্যা করার সুযোগ আমাদের দেওয়া হবে। তারপর এই ইশতেহারটি লীগের ইশতেহার হিশেবে প্রকাশিত হবে। সেই সঙ্গে অচল লীগ সংগঠনের বদলে নতুন, যুগ ও আদর্শের উপযোগী সংগঠন গড়ার ব্যাপারেও আমরা হাত লাগাতে পারব।

এ ব্যাপারে আমাদের কোনোই সন্দেহ ছিল না যে, শুধু প্রচারের উদ্দেশ্যে হলেও জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে একটা সংগঠন থাকা প্রয়োজন, আর সে সংগঠন যেহেতু কেবল স্থানীয় চরিত্রের হবে না তাই তার পক্ষে এমনকি জার্মানির বাইরেও গুপ্ত সংগঠনই হওয়া সম্ভব। লীগ ছিল ঠিক এইরকমই এক সংগঠন। এ লীগের যেসব ব্যাপারে আগে আমাদের আপত্তি ছিল তা এখন লীগের প্রতিনিধিরা নিজেরাই ভুল বলে পরিত্যাগ করছেন। এমনকি তার সংগঠনের কাজেও সহযোগিতা করতে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হল। 'না' বলা চলত কি? নিশ্চয়ই না। সুতরাং আমরা লীগে যোগ দিলাম। আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে মার্কস ব্রাসেল্‌সে লীগের একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করলেন আর আমি প্যারিসের তিনটি গোষ্ঠীতে উপস্থিত থাকতাম।

১৮৪৭ সালের গ্রীষ্মকালে লন্ডনে লীগের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভলফ ব্রাসেল্‌সের আর আমি প্যারিসের গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিশেবে ছিলাম। এই কংগ্রেসে প্রথমেই লীগের পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। ষড়যন্ত্রমূলক কালপর্বের সেই পুরনো রহস্যময় যেসব নাম তখনো ছিল, সেগুলি তুলে দেওয়া হল; এখন গোষ্ঠী, চক্র, পরিচালক চক্র, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কংগ্রেস নিয়ে লীগ গঠিত হল আর এখন থেকে লীগের নাম হল 'কমিউনিস্ট লীগ'। প্রথম ধারায় বলা হয়: 'লীগের উদ্দেশ্য হল বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ, প্রলেতারিয়েতের শাসন, শ্রেণী-বিরোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পুরনো বুর্জোয়া সমাজের বিলোপ আর শ্রেণীহীন

ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিবিহীন এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা।'* সংগঠনটি ছিল পুরোপুরি গণতান্ত্রিক, তার কমিটিগুলি ছিল নির্বাচনমূলক ও যে কোনো সময় অপসারণীয়। শুধু এর ফলেই ষড়যন্ত্রের আকাঙ্ক্ষায় বাধা পড়ল কারণ তার জন্য চাই একনায়কত্ব। আর অন্ততপক্ষে সাধারণ শান্তির সময়ের জন্য লীগ সম্পূর্ণভাবে একটি প্রচারমূলক সমিতিতে রূপান্তরিত হল। এখন যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হল তা এতই গণতান্ত্রিক ছিল যে এই নতুন নিয়মাবলি বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির আলোচনার্থে পেশ করা হয়, তারপর দ্বিতীয় কংগ্রেসে আবার সেগুলির আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত ১৮৪৭ সালের ৮ ডিসেম্বরে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। ভেমুর্ট ও স্টিবারের রচনার প্রথম খণ্ডে, ২৩৯ পৃষ্ঠায়, দশম পরিশিষ্টে এই নিয়মাবলি মুদ্রিত হয়েছে।

এই বছরই নভেম্বরের শেষে ও ডিসেম্বর গোড়ায় দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। মার্কসও এবার হাজির ছিলেন এবং যথেষ্ট দীর্ঘ এক বিতর্কে — কংগ্রেসে চলেছিল অন্ততপক্ষে দশদিন ধরে — তিনি নতুন মতবাদ সমর্থন করলেন। অবশেষে সব বিরোধ ও সন্দেহের নিরসন হল। নতুন মৌলিক নীতিগুলি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হল। মার্কস আর আমাকে 'ইশতেহার' রচনার ভার দেওয়া হল। ঠিক এর পরেই 'ইশতেহার' রচিত হয় আর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহ আগে সেটি ছাপানোর জন্য লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর এটি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছে, প্রায় সব ভাষায় অনূদিত হয়েছে আর আজও বহু দেশে প্রলেতারীয় আন্দোলনের পথ-নির্দেশক হয়ে রয়েছে। 'সব মানুষই ভাই' লীগের এই পুরনো নীতির জায়গায় এল নতুন রণধ্বনি 'দুনিয়ার মজুর এক হও!' — সংগ্রামের আন্তর্জাতিক চরিত্রের প্রকাশ্য ঘোষণা হল তাতে। সতের বছর পরে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির মূলধ্বনিরূপে এই রণধ্বনি সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়, আর আজ সব দেশের জঙ্গী প্রলেতারিয়েত তার পতাকায় এটি উৎকীর্ণ করে নিয়েছে।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হল। এতদিন পর্যন্ত লন্ডনে যে কেন্দ্রীয়

---

* ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট লীগের নিয়মাবলি' দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

কমিটি কাজ চালাচ্ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষমতা দিয়ে দিল ব্রাসেল্‌সের পরিচালক চক্রের হাতে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত এল যে সময় তার আগেই ব্রাসেল্‌সে কার্যত অবরোধ অবস্থা জারী হয়েছে আর বিশেষ করে জার্মানরা সেখানে কোথাও একত্র হতে পারছে না। আমরা সবাই তখন প্যারিসে যাওয়ার জন্য তৈরি। কাজেই নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিও ঠিক করল যে, কমিটি ভেঙে দিয়ে মার্কসের হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে আর তাঁকে অবিলম্বে প্যারিসে একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গড়ার ভার দেওয়া হবে। যে পাঁচজন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন (৩ মার্চ, ১৮৪৮), তাঁরা বিদায় নিতে না নিতেই পুলিশ জোর করে মার্কসের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে গ্রেপ্তার করল আর পরদিনই তাঁকে ফ্রান্সে রওনা হতে বাধ্য করল। মার্কসও ঠিক সেখানেই যেতে চাইছিলেন।

প্যারিসে শীঘ্রই আমরা সবাই আবার মিলিত হলাম। সেখানে নিম্নলিখিত দলিলটি রচনা করে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির সব সদস্য তাতে সই করলেন। সারা জার্মানিতে এটি বিলি করা হয় আর আজো এর থেকে অনেকের অনেক কিছু শেখার আছে:

জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির দাবি (৯২)

১। সমগ্র জার্মানিকে একটি একক অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করতে হবে।

৩। জার্মান জনগণের পার্লামেণ্টে যাতে শ্রমিকরাও আসন গ্রহণ করতে পারেন তার জন্য জনগণের প্রতিনিধিদের বেতন দেওয়া হবে।

৪। জনগণের সর্বজনীন সশস্ত্রীকরণ।

৭। রাজরাজড়াদের জমিদারি ও অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক মহাল, সমস্ত খনি, আকর ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হবে। এইসব জমিতে সমগ্র সমাজের উপকারের জন্য আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে এবং বৃহদাকারে কৃষিকার্য করা হবে।

৮। কৃষকের জমি-জায়গার উপর বন্ধক রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে ঘোষিত হবে; কৃষক এইসব বন্ধকের সুদ রাষ্ট্রকে দেবে।

৯। যেসব জেলায় ইজারা-চাষের (tenant farming) বিকাশ হয়েছে সেখানে জমির খাজনা বা ইজারার ভাড়া রাষ্ট্রকে কর হিশেবে দেওয়া হবে।

১১। পরিবহণের সব ব্যবস্থা: রেলপথ, খাল, জাহাজ, রাস্তা, ডাক ইত্যাদি রাষ্ট্র স্বহস্তে গ্রহণ করবে। এগুলি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হবে আর সম্পত্তিবিহীন শ্রেণীর এখতিয়ারে তা তুলে দেওয়া হবে।

১৪। উত্তরাধিকারের অধিকার সীমিতকরণ।

১৫। খুব উচ্চহারে ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থার প্রবর্তন আর ভোগ্যদ্রব্যের উপর থেকে কর অপসারণ।

১৬। জাতীয় কর্মশালা প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্র সব শ্রমিকের জীবিকা সুনিশ্চিত করবে আর যারা কাজ করতে অক্ষম তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।

১৭। বিনাবেতনে সর্বজনীন জনশিক্ষা।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলি কাজে পরিণত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করায় জার্মান প্রলেতারিয়েত, পেটি বুর্জোয়া ও কৃষকদের স্বার্থ আছে, কারণ জার্মানির যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এতদিন পর্যন্ত অল্প কয়েকজন শোষণ করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও অধীনতায় আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করবে, সমগ্র সম্পদের উৎপাদক হিশেবে তাদের যে অধিকার ও যে ক্ষমতা প্রাপ্য তা পাওয়ার একমাত্র পথ হল উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলি কাজে পরিণত করা।

কমিটি: **কার্ল মার্কস, কার্ল শাপার, হ. বাউয়ের,**
ফ. এঙ্গেলস, জ. মল্, ভ. **ভলফ।**

সেসময়ে প্যারিসে বিপ্লবী বাহিনী গড়ার খুব একটা হুজুগ ছিল। স্পেনীয়, ইতালীয়, বেলজীয়, ওলন্দাজ, পোল ও জার্মানরা দলে দলে এসে মিলত নিজের নিজের পিতৃভূমি মুক্ত করার উদ্দেশ্যে। জার্মান বাহিনীর নেতৃত্ব করতেন হেরভেগ, বর্নস্টেড ও বের্নস্টাইন। বিপ্লবের ঠিক পরেই সমস্ত বিদেশী মজুরদের চাকরি তো যায়ই, তার উপর জনসাধারণও তাদের জ্বালাতন করত, এর ফলে এই সব বাহিনীতে খুব বেশি লোক আসতে থাকে। নতুন সরকার এই বাহিনীগুলিকে দেখল বিদেশী শ্রমিকদের

বিতাড়নের উপায় হিশেবে। এবং তাদের l'étape du soldat দিল অর্থাৎ তাদের চলার পথের ধারে ধারে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিল আর সীমানা পর্যন্ত দিনে পঞ্চাশ সেণ্টিম করে পথ খরচা ধার্য করল। এবং তার পরই বৈদেশিক মন্ত্রী সুবক্তা লামার্তিন, খুব সহজেই যাঁর চোখে জল আসত, চট করে সুযোগ বুঝে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের ধরিয়ে দিতেন তাদের নিজের নিজের সরকারের কাছে।

আমরা বিপ্লব নিয়ে এইভাবে খেলা করার বিরুদ্ধে অতি চূড়ান্ত আপত্তি জানিয়েছিলাম। জার্মানিতে তখন যেরকম আলোড়ন চলছে তার মধ্য দিয়ে আক্রমণ করা, যাতে বাইরে থেকে জোর করে বিপ্লব আমদানি করা হয়, তার মানে হত জার্মানির নিজের বিপ্লবকেই ক্ষতিগ্রস্ত করা, সরকারগুলিকে শক্তিশালী করা আর বাহিনীর লোকদেরই অসহায় অবস্থায় জার্মান সৈন্যবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া — লামার্তিন সে ব্যবস্থা পাকা করেই রেখেছিলেন। পরে যখন ভিয়েনা ও বার্লিনে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হল তখন বাহিনী আরো উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে পড়ল। কিন্তু একবার যখন খেলা শুরু হয়েছে, তখন তা চালিয়েই যাওয়া হল।

আমরা এক জার্মান কমিউনিস্ট ক্লাব (৯৩) প্রতিষ্ঠা করলাম। সেখানে আমরা শ্রমিকদের পরামর্শ দিতাম যে, তারা যেন বাহিনী থেকে দূরে থাকে, বরং যেন এক-একজন করে দেশে ফিরে গিয়ে সেখানে আন্দোলনের জন্য কাজ করে। আমাদের পুরনো বন্ধু ফ্লকোঁ তখন অস্থায়ী সরকারের একজন সদস্য। আমরা যেসব শ্রমিকদের পাঠাতাম তাদের তিনি বাহিনীর লোকদের মতোই যাতায়াতের সুবিধা আদায় করে দিতেন। এইভাবে আমরা ৩০০ বা ৪০০ জন শ্রমিককে জার্মানিতে ফেরৎ পাঠালাম, তার মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল লীগের সদস্য।

যে জিনিসটা আগেই সহজে আন্দাজ করা সম্ভব ছিল তাই ঘটল, তখন যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে তার তুলনায় লীগের কার্যিকা শক্তি ছিল খুবই দুর্বল। লীগের যেসব সদস্য আগে বিদেশে ছিল তাদের তিন চতুর্থাংশই দেশে ফিরে গিয়ে তাদের স্থায়ী বাসস্থান বদলে নেয়। ফলে তাদের পূর্বতন গোষ্ঠীগুলি অনেকাংশে ভেঙে গেল আর লীগের সঙ্গে তাদের আর কোনো যোগাযোগ রইল না। তাদের এক

অংশ, তাদের মধ্যে যারা বেশি উচ্চাভিলাষী, তারা সে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করার কোনো চেষ্টাও করল না বরং তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের এলাকায় নিজেদের উদ্যোগেই একটি করে ছোট ছোট পৃথক আন্দোলন শুরু করে দিল। শেষত, প্রতিটি ক্ষুদ্র রাজ্যে, প্রতি প্রদেশে ও প্রতি শহরে অবস্থার এত পার্থক্য ছিল যে, একেবারে সাধারণ ধরনের নির্দেশাবলি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করা লীগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর সে নির্দেশ সংবাদপত্রের মাধ্যমেই অনেক ভালো করে পৌঁছান যেত। অর্থাৎ, যেসব কারণের জন্য গুপ্ত লীগ প্রয়োজন হয়েছিল, সে কারণগুলি দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত লীগ হিশেবে এরও আর কোনো অর্থ রইল না। কিন্তু সদ্য যারা এই গুপ্ত লীগের ষড়যন্ত্রমূলক চরিত্রের শেষ রেশটুকু দূর করেছে তাদের এতে আশ্চর্য হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম।

তবে লীগ যে বিপ্লবী কার্যকলাপের চমৎকার বিদ্যালয় ছিল সেকথা এবার দেখা গেল। রাইনে যেখানে *Neue Rheinische Zeitung** একটা দৃঢ় কেন্দ্র জুগিয়েছিল সেখানে, নাসাউতে, রাইনের গিয়েসেনে ইত্যাদিতে সর্বত্র লীগের সদস্যরা চরম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। হামবুর্গেও ঠিক তাই হয়। দক্ষিণ জার্মানিতে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রাধান্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রেস্‌লাউতে ভিলহেল্‌ম ভলফ ১৮৪৮ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত খুবই সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেন। তার উপর তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টে সাইলেসিয়া থেকে বিকল্প প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। আর কম্পোজিটার স্টেফান বর্ন্‌, ব্রাসেল্‌স্‌ ও প্যারিসের যিনি ছিলেন লীগের সক্রিয় সদস্য তিনি বার্লিনে এক 'শ্রমিক ভ্রাতৃত্বের' প্রতিষ্ঠা করেন। এটি যথেষ্ট বিস্তারলাভ করেছিল আর ১৮৫০ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। বর্ন্‌ ছিলেন খুবই প্রতিভাবান যুবক। কিন্তু রাজনৈতিক নায়ক হয়ে ওঠার একটু বেশি তাড়া ছিল তাঁর। লোক জোগাড় করার জন্য তিনি যত আজেবাজে লোকদের সঙ্গে 'ভ্রাতৃত্ব' করতেন। আদৌ তিনি বিভিন্ন বিরোধী প্রবণতার মধ্যে একতা আনার, বিশৃঙ্খলার মধ্যে আলোকপাতের উপযোগী লোক ছিলেন না। ফলে 'ভ্রাতৃত্বের' সরকারী প্রকাশনীগুলিতে 'কমিউনিস্ট ইশতেহারের' দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে

* এই খণ্ডের ৯৯-১১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

গিল্ডের স্মৃতি, গিল্ডসুলভ আকাঙ্ক্ষা, লুই ব্লাঁ ও প্রুধোঁর টুকরোটাকরা, সংরক্ষণবাদ ইত্যাদির জগাখিচুড়ি মিলন ঘটে। অর্থাৎ এরা সবাইকে খুশী রাখতে চাইত। বিশেষত, 'ভ্রাতৃত্ব' ধর্মঘট, ট্রেড ইউনিয়ন ও উৎপাদক সমবায়-সমিতির আয়োজন করেছিল। কিন্তু একমাত্র যে ক্ষেত্রে এইসব জিনিস স্থায়ী ভিত্তিতে চালানো যায়, রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে সেই ক্ষেত্রটি জয় করে নেওয়াই যে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন সেকথা এদের মনে ছিল না। পরে প্রতিক্রিয়ার বিজয়ের ফলে 'ভ্রাতৃত্বের' নেতারা বিপ্লবী সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে যখন বাধ্য হন, তখন কিন্তু নিজেদের চারদিকে তারা যে বিশৃঙ্খল জনতার ভিড় জমিয়েছিলেন তারা স্বভাবতই তাঁদের ফেলে পালাল। বর্ন ১৮৪৯ সালের মে মাসে ড্রেসডেন অভ্যুত্থানে অংশ নেন (৯৪) আর খুব জোর বেঁচে যান। কিন্তু প্রলেতারিয়েতের বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলনের বিপরীতে দেখা গেল যে 'শ্রমিক ভ্রাতৃত্ব' হল বিশুদ্ধ এক (son der bund) পৃথক সংগঠন। তার অস্তিত্ব বহুলাংশেই কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ, আর এর ভূমিকা এতই গৌণ ছিল যে, প্রতিক্রিয়াশীলরা এই সংগঠনকে ১৮৫০ সালের আগে পর্যন্ত আর এর বাকি সব শাখাকে আরো অনেক বছর পরে পর্যন্ত বন্ধ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি। বর্নের আসল নাম বুটের্মিল্খ। বড়ো একজন রাজনৈতিক নায়ক না হয়ে তিনি হয়েছেন সামান্য এক সুইস অধ্যাপক। এখন আর তিনি গিল্ডের ভাষায় মার্কসের অনুবাদ করেন না, বরং বিনম্র রেনাঁ-র অনুবাদ করেন তাঁর মিষ্টি জার্মানে।

প্যারিসে ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন, জার্মানিতে মে বিদ্রোহের পরাজয় আর রুশীদের হাতে হাঙ্গেরীয় বিপ্লব দমনের সঙ্গে সঙ্গে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের বিরাট এক পর্ব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তখন পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা আদৌ চূড়ান্ত জয়লাভ করে নি। বিক্ষিপ্ত বিপ্লবী শক্তির পুনর্গঠন এবং সুতরাং লীগেও পুনর্গঠন প্রয়োজন ছিল। ১৮৪৮ সালের পূর্ববর্তীকালের মতো, তখনকার পরিস্থিতিতে প্রলেতারিয়েতের কোনো প্রকাশ্য সংগঠন গড়া সম্ভব হত না। কাজেই আবার গোপনে সংগঠন গড়তে হল।

১৮৪৯ সালের শরৎকালে পূর্বতন সব কেন্দ্রীয় কমিটি ও কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য আবার লন্ডনে মিলিত হলেন। অনুপস্থিত ছিলেন শুধু

শাপার ও মল্। শাপার ভিসবাডেন-এ কারারুদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ১৮৫০ সালের বসন্তকালে নিরপরাধ বলে প্রমাণ হবার পর তিনিও এলেন। মল্ অত্যন্ত বিপজ্জনক বহু দৌত্য ও প্রচারমূলক সফরের পর — শেষ পর্যন্ত রাইন প্রদেশে একেবারে প্রুশীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পেলট্‌নেট গোলন্দাজবাহিনীর জন্য অশ্বারোহী গোলন্দাজদের সংগ্রহ শুরু করেন — ভিলিখের সৈন্যদলের বেসানসন শ্রমিক বাহিনীতে যোগ দেন ও মুর্গে এক সংঘর্ষের সময়ে রটেনফেলস সেতুর সামনে মাথায় গুলি লেগে মারা যান। কিন্তু এবার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন ভিলিখ। ১৮৪৫ সাল থেকে পশ্চিম জার্মানিতে যেধরনের ভাবপ্রবণ কমিউনিস্টদের খুব প্রাদুর্ভাব তাদেরই একজন ভিলিখ। কেবল সেইজন্যই সহজাত প্রবৃত্তিবশেই তিনি আমাদের সমালোচনী প্রবণতার গোপন বিরোধী ছিলেন। তার উপর, তিনি ছিলেন পুরোপুরি এক পয়গম্বর, জার্মান প্রলেতারিয়েতের পূর্বনির্দিষ্ট মুক্তিদাতারূপে তাঁর ব্যক্তিগত ব্রতে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না, আর সেই হিশেবে রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় একনায়কত্বেরই তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ দাবিদার। ফলে ভেইটলিং যে আদিম খ্রীষ্টান কমিউনিজম প্রচার করেছিলেন, তদুপরি উদয় হল একধরনের কমিউনিস্ট ইসলামের। যাই হোক, তখনকার মতো এই নতুন ধর্মের প্রচার ভিলিখের সেনাপত্যাধীন উদ্বাস্তু শিবিরেই সীমাবদ্ধ রইল।

কাজেই লীগ নতুন করে সংগঠিত হল। ১৮৫০ সালের মার্চের 'বিবৃতি'* প্রকাশিত হল আর হাইনরিখ বাউয়েরকে দূত হিশেবে জার্মানিতে পাঠানো হল। মার্কস ও আমার সম্পাদিত এই 'বিবৃতিটি' আজো আগ্রহবহ, কারণ শীঘ্রই ইউরোপে যে উলটপালট হওয়ার কথা (ইউরোপীয় বিপ্লবগুলি — ১৮১৫, ১৮৩০, ১৮৪৮-১৮৫২, ১৮৭০ সালে — আমাদের শতাব্দীতে ১৫ থেকে ১৮ বছর অন্তর হয়েছে) তাতে কমিউনিস্ট শ্রমিকদের হাত থেকে সমাজের পরিত্রাতা হিশেবে জার্মানিতে যে পার্টির প্রথম ক্ষমতায় আসা অবশ্যম্ভাবী আজো তা হল পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্র। ঐ 'বিবৃতিতে' যা বলা হয়েছিল তার অনেক কিছুই তাই আজো প্রযোজ্য। হাইনরিখ বাউয়েরের

---

* এই সংস্করণের ২য় খণ্ড, ৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

দৌত্য পুরোপুরিভাবে সফল হল। এই আমুদে ক্ষুদ্রাকার জুতাপ্রস্তুতকারকটি ছিলেন আজন্ম কূটনীতিক। লীগের ভূতপূর্ব সদস্যদের কেউ কেউ তখন কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, আর কেউ কেউ নিজের মতো করে কাজ করছেন। তাঁদের আর বিশেষত 'শ্রমিক ভ্রাতৃত্বের' তদানীন্তন নেতাদের বাউয়ের সক্রিয় সংগঠনের মধ্যে ফিরিয়ে আনলেন। ১৮৪৮ সালের আগের তুলনায় লীগ শ্রমিক, কৃষক ও ক্রীড়া সঙ্ঘগুলিতে অনেক বেশি নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে শুরু করল। ফলে, ১৮৫০ সালের জুন মাসে গোষ্ঠীগুলির কাছে পরবর্তী ত্রৈমাসিক ভাষণেই একথা জানানো সম্ভব হল যে, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বার্থে জার্মানিতে সফররত বন্-এর ছাত্র শুর্টস (পরে আমেরিকার প্রাক্তন-মন্ত্রী) 'দেখেছেন যে, সক্ষম সব শক্তি ইতিমধ্যেই লীগের হাতে চলে গেছে'। নিঃসন্দেহে লীগই ছিল জার্মানির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একমাত্র বিপ্লবী সংগঠন।

কিন্তু এই সংগঠন কী কাজে লাগবে, তা অনেকখানি নির্ভর করত বিপ্লবের নতুন এক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নেয় কিনা তার উপর। ১৮৫০ সালে তার আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকল, বলতে কি অসম্ভবই হয়ে উঠছিল। ১৮৪৭ সালের যে শিল্প-সংকট ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সোপান রচনা করেছিল, তা কেটে গিয়েছিল; শিল্প সমৃদ্ধির এক নতুন, অভূতপূর্ব যুগ শুরু হয়েছিল। যাদের চোখ ছিল এবং সে চোখ যারা কাজে লাগিয়েছিল, তাদের পরিষ্কার বোঝার কথা যে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবী ঝড় ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে।

'এই যে সাধারণ সমৃদ্ধির মধ্যে বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলি বুর্জোয়া সম্পর্কাদির চৌহদ্দির ভিতরে যথাসম্ভব সতেজভাবেই বিকশিত হচ্ছে, তার ফলে **সত্যকার বিপ্লবের কথা আর ওঠে না**। তেমন বিপ্লব শুধু সে পর্বেই সম্ভব, যখন আধুনিক উৎপাদন-শক্তি ও বুর্জোয়া উৎপাদন-কাঠামো, এই উভয় উপাদানের মধ্যেই পারস্পরিক সংঘাত উপস্থিত হয়। ইউরোপীয় ভূখণ্ডের শৃঙ্খলা পার্টির এক এক উপদলের প্রতিনিধির বর্তমানে যেসব ঝগড়াঝাঁটিতে মাতছে ও নিজেদের খেলো করে তুলছে, সেগুলি নতুন বিপ্লবের উপলক্ষ মোটেই যোগাচ্ছে না, পক্ষান্তরে তা সম্ভব হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কাদির বনিয়াদটা সাময়িকভাবে অতি মজবুত, আর প্রতিক্রিয়া যা জানে না, অতিশয় **বুর্জোয়া** বলেই।

বুর্জোয়া বিকাশ ব্যাহত করার জন্য প্রতিক্রিয়ার **সমস্ত প্রচেষ্টা ওর গায়ে লেগে ঠিক ততখানি নিশ্চিতভাবেই ঠিকরে ফিরে আসবে, যেমন ফিরে আসবে গণতন্ত্রীদের সমস্ত নৈতিক ক্রোধ ও সোৎসাহ সকল ঘোষণা।'** *Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue* (৯৫), পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা, হামবুর্গ, ১৮৫০, ১৫৩ পৃষ্ঠায় '১৮৫০ সালের মে থেকে অক্টোবর মাসের পর্যালোচনায়' আমি আর মার্কস এই কথা লিখেছিলাম।

কিন্তু পরিস্থিতির এই শান্ত মূল্য-নিরূপণকে অনেকেই তখন ধৃষ্টোক্তি বলে গণ্য করেছিলেন। তখন লেদ্রু-রলাঁ, লুই ব্লাঁ, মাৎসিনি, কশুত এবং অপেক্ষাকৃত কম বিখ্যাত জার্মান তারকাদের মধ্যে রুগে, কিনকেল, গ্যোগ ও অন্যান্য সবাই লণ্ডনে গিয়ে গুচ্ছে গুচ্ছে ভবিষ্যতের অস্থায়ী সরকার গড়ার জন্য ভিড় করেছেন এবং সেটা শুধু তাঁদের নিজের নিজের পিতৃভূমির জন্যই নয়, সমগ্র ইউরোপেরও জন্য, বাকি কেবল আমেরিকার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় টাকাটা ধারে পাওয়া, তাহলেই ইউরোপীয় বিপ্লব আর তার স্বাভাবিক অনুষঙ্গ বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রগুলিকে পলকের মধ্যেই ঘটানো যাবে। আর ভিলিখের মতো লোক যে একথা বিশ্বাস করেছিলেন পুরনো বিপ্লবী ঝোঁকের বশে শাপারও যে বোকা বনেছিলেন এবং লণ্ডনের যে শ্রমিকরা নিজেরাই অনেকে দেশান্তরী তাদের বেশির ভাগই যে এদের পিছন পিছন বিপ্লবের বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক সংঘটক শিবিরে গিয়ে ঢুকেছিল, এতে আর আশ্চর্যের কী আছে? মোটকথা, আমাদের সংযমটা এঁদের মনঃপূত হয় নি, এঁদের মতে বিপ্লব ঘটানোর খেলায় যোগ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে কাজ করতে আমরা পুরোপুরি অস্বীকার করলাম। ফল হল বিভাগ। এবিষয়ে 'স্বরূপপ্রকাশ' রচনায় বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। তারপর নট্যুং গ্রেপ্তার হলেন। এঁর পরই হামবুর্গে গ্রেপ্তার হলেন হাউপ্ট। হাউপ্ট বিশ্বাসঘাতকতা করে কলোনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নাম ফাঁস করে দিলেন, বিচারে প্রধান সাক্ষী হবার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর আত্মীয়স্বজন এভাবে কলঙ্কিত হতে চাইলেন না, তাঁরা হাউপ্টকে রিও ডি জ্যানিরোতে চালান করে দিলেন। সেখানে তিনি পরে ব্যবসায়ী হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হন আর তাঁর সেবার স্বীকৃতি হিশেবে প্রথমে প্রুশীয় ও পরে জার্মান কন্সাল-

জেনারেল রূপে নিযুক্ত হন। এখন তিনি আবার ইউরোপে এসেছেন।*

'স্বরূপপ্রকাশ' রচনাটিকে আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য আমি কলোনের অভিযুক্তদের তালিকা দিচ্ছি: ১) পেটের রোজার চুরুট তৈরী করতেন; ২) হাইনরিখ ব্যুরগের্স, জীবনের অবসানকালে তিনি প্রতিনিধি-সভার প্রগতিশীল সদস্য ছিলেন; ৩) পেটের নট্যুং, দর্জি, কয়েক বছর আগে ফটোগ্রাফার হিশেবে ব্রেসলাউতে মারা গেছেন; ৪) ভিলহেল্ম রাইফ; ৫) ডাঃ হের্মান বেকার, এখন কলোনের প্রধান বার্গোমাস্টার ও উচ্চকক্ষের সদস্য; ৬) ডাঃ রলান্ড ডেনিয়েল্‌স, চিকিৎসক, কারাগারে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে মামলার কয়েক বছর পরে মারা যান; ৭) কার্ল অট্টো, রসায়নবিদ; ৮) ডাঃ আব্রাহাম ইয়াকবি, এখন নিউ ইয়র্কের চিকিৎসক; ৯) ডাঃ ইয়োহান ইয়াকব ক্লাইন, এখন চিকিৎসক আর কলোন শহরের কাউন্সিলার প্রতিনিধি; ১০) ফের্ডিনান্ড ফ্রাইলিখ্‌রাট, এর আগেই তিনি লন্ডনে চলে গিয়েছিলেন; ১১) ইয়ো. ল. এর্হার্ড, কেরানী; ১২) ফ্রিডরিখ লেসনার, দর্জি, এখন লন্ডনে আছেন। ১৮৫২ সালের ৪ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত জুরীর সমক্ষে প্রকাশ্য বিচারের পর রাজদ্রোহের অভিযোগে রোজার, ব্যুরগের্স ও নট্যুং-এর ছয় বছর, রাইফ, অট্টো ও বেকারের পাঁচ বছর আর লেসনারের তিন বছর দুর্গে রুদ্ধ থাকার দণ্ডাদেশ হয়। ডেনিয়েল্‌স, ক্লাইন, ইয়াকবি ও এর্হার্ড মুক্তি পান।

কলোন মামলার সঙ্গেই জার্মান কমিউনিস্ট শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম পর্ব শেষ হল। দণ্ডাদেশের ঠিক পরেই আমরা লীগ ভেঙে দিলাম। কয়েক মাস পরে ভিলিখ — শাপারের জোণ্ডেরবুণ্ডও (৯৭) চিরশান্তি লাভ করল।

---

* সপ্তম দশকের শেষে লন্ডনে শাপারের মৃত্যু হয়। ভিলিখ কৃতিত্বের সঙ্গে আমেরিকান গৃহযুদ্ধে (৯৬) অংশ নেন, তিনি ব্রিগেডিয়ার-জেনেরেল হন। মুরফ্রিসবোরো (টেনেসি)-র যুদ্ধে তাঁর বুকে গুলি লাগে, কিন্তু তিনি সেরে ওঠেন। প্রায় দশ বছর আগে আমেরিকায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অন্যান্য যাঁদের কথা উপরে উল্লেখ করা হল তাঁদের সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলব যে, অস্ট্রেলিয়ায় হাইনরিখ বাউয়েরের আর কোনো খোঁজ রাখা যায় নি আর ভেইটলিং ও এভেরবেক আমেরিকায় মারা গেছেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

* * *

তখনকার সঙ্গে এখনকার এক পুরুষের ব্যবধান। তখন জার্মানি ছিল হস্তশিল্পের আর শুধু কায়িক পরিশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত গার্হস্থ্য শ্রমশিল্পের দেশ। এখন এটা এক বৃহৎ শিল্পপ্রধান দেশ, ক্রমাগত তার শিল্পগত রূপান্তর চলছে। শ্রমিক হিশেবে নিজেদের অবস্থা আর পুঁজির বিরুদ্ধে তাদের ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক বিরোধ হৃদয়ঙ্গম করেছে এমন শ্রমিকদের তখন একজন একজন করে খুঁজে বের করতে হত, কারণ এই বিরোধও তখন সবেমাত্র বিকাশলাভ করতে শুরু করেছে। আর আজ নিপীড়িত শ্রেণী হিশেবে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ চেতনা বিকাশের প্রক্রিয়া ঈষৎ বিলম্বিত করার জন্যই সমগ্র জার্মান প্রলেতারিয়েতকে জরুরী আইনের অধীনে রাখতে হয়। তখন স্বল্পসংখ্যক যে কয়জন প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকা উপলব্ধি পর্যন্ত এগোতে পেরেছিলেন তাঁদের গোপনে কাজ করতে হত, ৩ থেকে ২০ জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে লুকিয়ে একত্রিত হতে হত। আর আজ প্রকাশ্য বা গোপন কোনো সরকারী সংগঠনেরই প্রয়োজন হয় না জার্মান প্রলেতারিয়েতের। কোনো নিয়মাবলি, কমিটি, সিদ্ধান্ত বা অন্যান্য প্রত্যক্ষ রূপ ছাড়াই একই মনোভাবসম্পন্ন শ্রেণী কমরেডদের সহজ স্বতঃসিদ্ধ পারস্পরিক যোগাযোগ সমগ্র জার্মান সাম্রাজ্যের মূল ধরে নাড়া দিতে পারে। জার্মানির সীমানার বাইরে বিসমার্ক হলেন ইউরোপীয় ব্যাপারের সালিশ। কিন্তু ১৮৪৪ সালেই মার্কস ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন, দেশাভ্যন্তরে জার্মান প্রলেতারিয়েতের সেই বলিষ্ঠ অবয়ব দিন দিন আরো শঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। কূপমণ্ডূকের উপযোগী করে যে সংকীর্ণ সাম্রাজ্য কাঠামো গড়া হয়েছিল তা এই দৈত্যের পক্ষে এখুনি অপ্রসর, এর মহাকায় দেহ আর প্রশস্ত স্কন্ধ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ও শীঘ্রই এমন এক মুহূর্ত আসবে যখন সে তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোমাত্রই সাম্রাজ্যের সংবিধানের পুরো কাঠামো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। শুধু তাই নয়। ইউরোপীয় ও আমেরিকান প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক আন্দোলন এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, শুধু তার প্রথম সংকীর্ণ রূপ গুপ্ত লীগই নয়, তার চেয়ে বহুগুণে প্রশস্ত তার দ্বিতীয় রূপ প্রকাশ্য শ্রমজীবী

মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিও তার পক্ষে শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর শ্রেণীগত অবস্থার অভিন্নতা উপলব্ধির ভিত্তিতে সংহতির যে সহজ অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে, তা সব দেশের ও সব ভাষার শ্রমিকদের মধ্যেই একটি একক মহান প্রলেতারীয় পার্টি গড়ে তোলা ও সংহত রাখার পক্ষে যথেষ্ট। ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত লীগ যে মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করত, যাকে জ্ঞানী কূপমণ্ডূকেরা বদ্ধ উন্মাদদের ভ্রম কল্পনা হিশেবে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু গোষ্ঠীভক্তের গুপ্ত মতবাদ হিশেবে উড়িয়ে দিতে পারত, আজ সারা পৃথিবীর সব সভ্য দেশের সে মতবাদের অসংখ্য অনুগামী মিলবে, মিলবে যেমন সাইবেরিয়ার খনিতে দণ্ডিত কয়েদীদের মধ্যে তেমনি কালিফোর্নিয়ায় স্বর্ণ খনির শ্রমিকদের মধ্যে। আর এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, স্বকালে যিনি ছিলেন সর্বাধিক ঘৃণিত, সর্বাধিক নিন্দিত ব্যক্তি, সেই কার্ল মার্কস জীবনের অবসানকালে হয়ে ওঠেন পুরনো ও নতুন উভয় দুনিয়ার প্রলেতারিয়েতের কাছেই চিরবাঞ্ছিত ও সদা প্রস্তুত পরামর্শদাতা।

লণ্ডন, ৮ অক্টোবর, ১৮৮৫

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কার্ল মার্কসের লেখা 'কলোনে কমিউনিস্টদের বিচারের স্বরূপপ্রকাশের' তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা হিশেবে এঙ্গেলস এটি লিখেছিলেন। ১৮৮৫ সালে জুরিখে এই সংস্করণটি প্রকাশিত হয়, ১৮৮৫ সালে *Der Sozialdemokrat* সংবাদপত্রে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়

পুস্তকের পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

লন্ড্‌ভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান (৯৮)

১৮৮৮ সালের সংস্করণের মুখবন্ধ

১৮৫৯ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় মার্কস বলেছেন, ১৮৪৫ সালে ব্রাসেল্‌সে 'জার্মান দর্শনের ভাবাদর্শগত মতামতের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্যটি', অর্থাৎ ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, যা প্রধানত মার্কসেরই রচনা, 'আমরা যুক্তভাবে প্রস্তুত করব, বস্তুতপক্ষে, আমাদের এতদিনকার দার্শনিক বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে হিসাব নিকাশ মিটিয়ে নেব' বলে স্থির করেছিলাম। 'আমাদের এই সংকল্প কাজে পরিণত হল হেগেল-পরবর্তী দর্শনের সমালোচনারূপে। অক্‌টাভো-আকারের দুই বৃহৎ খণ্ডে এই পাণ্ডুলিপিটি ওয়েস্টফালিয়ায় প্রকাশকেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার অনেকদিন পরে আমরা খবর পেলাম যে, পরিবর্তিত অবস্থার দরুন লেখাটির মুদ্রণ সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপিটিকে মূষিকের দন্তুর সমালোচনার কবলেই ছেড়ে দেওয়া গেল সাগ্রহেই, কারণ আমাদের প্রধান যে উদ্দেশ্য, নিজেদের ধারণাকে স্বচ্ছ করা, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল।'

তারপর চল্লিশ বছরের বেশি কেটে গিয়েছে, মার্কস মারা গিয়েছেন, এবং আমাদের দুজনের মধ্যে কেউই এই বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করবার সুযোগ পাই নি। নানা প্রসঙ্গে আমরা হেগেলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছি; কিন্তু কোথাও সামগ্রিক ও ধারাবাহিকভাবে নয়। এবং ফয়েরবাখের প্রসঙ্গে আমরা একবারও প্রত্যাবর্তন করি নি, যদিও সব সত্ত্বেও হেগেল-দর্শন ও আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে নানা দিক থেকে তিনিই হলেন অন্তর্বর্তী যোগসূত্র।

ইতিমধ্যে জার্মানি ও ইউরোপের সীমানার বাইরে বহুদূর পর্যন্ত, পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যিক ভাষায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির অনুগামীরা দেখা

দিয়েছেন। অপরপক্ষে বিদেশে বিশেষত ইংলন্ড ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় চিরায়ত জার্মান দর্শন যেন একধরনের পুনর্জন্ম লাভ করছে এবং এমনকি জার্মানিতেও বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের নামে যে কাঙালী ভোজনের একলেক্টিক খিচুড়ি পরিবেশন করা হয় সে সম্বন্ধেও লোকে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে বলে মনে হয়।

এই পরিস্থিতিতে হেগেল-দর্শনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিষয়ে — কীভাবে আমরা এই দর্শন থেকেই যাত্রা করেছি এবং কী করে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি, সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ও প্রণালীবদ্ধ বিবরণীর প্রয়োজনীয়তা আমি ক্রমশই বেশি করে অনুভব করছিলাম। সেই সঙ্গে আমি অনুভব করছিলাম, আমাদের ঝড়-ঝাপটার দিনে (৯৯) আমাদের উপর হেগেলোত্তর অন্যান্য দার্শনিকদের তুলনায় ফয়েরবাখের যে প্রভাব, সেটার পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি না দিলে আমাদের মর্যাদার ঋণ অপরিশোধিত থাকে। তাই *Neue Zeit* (১০০) পত্রিকার সম্পাদক যখন ফয়েরবাখ সম্বন্ধে স্টার্কে রচিত গ্রন্থটি সমালোচনা করবার অনুরোধ জানালেন, তখন আমি তা সাগ্রহে স্বীকার করলাম। উক্ত পত্রিকার ১৮৮৬ সালের চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যায় আমার লেখা প্রকাশিত হয় এবং বর্তমানে আমার সংশোধনায় তাইই স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।

এ লেখা ছাপাখানায় পাঠাবার আগে আমি ১৮৪৫-১৮৪৬ সালের সেই পুরনো পান্ডুলিপিটি* খুঁজে বের করেছি এবং আরেকবার পড়ে দেখেছি। তাতে ফয়েরবাখ সংক্রান্ত অংশটি** অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। সে পান্ডুলিপির সমাপ্ত অংশটি হল ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং তাতে শুধু এই প্রমাণ হয় যে, তখনো পর্যন্ত আমাদের অর্থনৈতিক ইতিহাসের জ্ঞান কত অসম্পূর্ণ ছিল। ফয়েরবাখের আসল মতবাদের কোন সমালোচনা এতে নেই; অতএব বর্তমান উদ্দেশ্যে তা ব্যবহারোপযোগী নয়। অপরপক্ষে, মার্কসের একটি পুরনো খাতায় ফয়েরবাখ সম্বন্ধে এগারোটি থিসিস*** খুঁজে পেয়েছি; সেগুলি এখানে পরিশিষ্ট হিশেবে প্রকাশিত হল। ভবিষ্যতে

* ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস, 'জার্মান মতাদর্শ'। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের ১ খন্ড, ৯-১০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

*** ঐ, ৯-১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

বিশদ সংরচনের জন্য তিনি এই নোটগুলি তাড়াহুড়োয় লিখে রেখেছিলেন, মোটেই প্রকাশের জন্য নয়। কিন্তু নতুন বিশ্বদৃষ্টির প্রতিভাদীপ্ত ভ্রূণসত্তার প্রথম দলিল হিশেবে এগুলি অমূল্য।

লন্ডন, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

১৮৮৮ সালে স্টুট্‌গার্টে প্রকাশিত 'লুড্‌ভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' গ্রন্থের স্বতন্ত্র সংস্করণের জন্য এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

মূল গ্রন্থের পাঠ অনুসরণে মুদ্রিত জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

লুডভিগ ফয়েরবাখ
ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান

১

আলোচ্য পুস্তক প্রসঙ্গে* এমন এক যুগে ফিরে যেতে হয় যা সময়ের হিশেবে এক পুরুষের চেয়ে বেশি পূর্ববর্তী না হলেও জার্মানির বর্তমান পুরুষদের কাছে এমনই সুদূর যে, মনে হয় বুঝি একশ' বছর আগের কথা। অথচ এই যুগটিই ছিল জার্মানির ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের প্রস্তুতির যুগ; এবং তারপর আমাদের দেশে যা কিছু ঘটেছে তা ওই ১৮৪৮-এরই পূর্বানুবর্তন, বিপ্লবের ইচ্ছাপত্রের পরিপূরণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের মতোই ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মানিতেও দার্শনিক বিপ্লব রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সূচনা করে। কিন্তু উভয়ের রূপে কতই না প্রভেদ! ফরাসীরা সমস্ত সরকারী বিজ্ঞান, গির্জা এবং এমনকি প্রায়ই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও সম্মুখ সমরে লিপ্ত ছিলেন; দেশের সীমানার বাইরে হল্যান্ড বা ইংলণ্ডে তাঁদের রচনা প্রকাশিত হত অথচ তখন তাঁদের নিজেদেরই প্রায়ই বাস্তিলে কারারুদ্ধ হবার আশংকা ছিল। অপরপক্ষে, জার্মানরা ছিলেন অধ্যাপক, তরুণদের রাষ্ট্রনিযুক্ত শিক্ষক, তাঁদের রচনাবলি ছিল মনোনীত পাঠ্যপুস্তক এবং দার্শনিক বিকাশ ধারার চরম পরিণতি যে হেগেল-প্রণালী তাকে যেন কিয়ৎ পরিমাণে এমনকি রাষ্ট্রের রাজকীয়-প্রুশীয় দর্শনের পর্যায়েই তুলে দেওয়া হল। এই অধ্যাপকদের আড়ালে, তাঁদের দুর্বোধ্য, পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত পরিভাষা এবং দীর্ঘ, ক্লান্তিকর বাক্যাবলির পিছনে সত্যই কি কোনো বিপ্লবের আশ্রয়লাভ সম্ভবপর? এবং যে উদারপন্থীরা তখন বিপ্লবের প্রতিনিধি বলে পরিগণিত তাঁরাই কি এই

---

* কার্ল স্টার্কে রচিত 'লুডভিগ ফয়েরবাখ', ফের্ডিনান্ড এঙ্কে সংস্করণ, স্টুটগার্ট, ১৮৮৫। (এঙ্গেলসের টীকা।)

মস্তিষ্ক-বিভ্রান্তিকর দর্শনের তীব্র পরিপন্থী ছিলেন না? কিন্তু যে কথা সরকার বা উদারপন্থীরা কেউই লক্ষ্য করেন নি তা ১৮৩৩ সালেই অন্তত একজনের চোখে পড়েছিল, এবং তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং হাইনরিখ হাইনে (১০১)।

একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। হেগেলের বিখ্যাত উক্তি:

'যা বাস্তব তাই যৌক্তিক, যা যৌক্তিক তাই বাস্তব।'

এটি সংকীর্ণচিত্ত সরকারের কাছ থেকে যে পরিমাণ কৃতজ্ঞতা এবং সমান সংকীর্ণচিত্ত উদারপন্থীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ উষ্মা অর্জন করেছে তা আর কোনো দার্শনিক বাক্যের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। এ বাক্য সুস্পষ্টভাবেই বর্তমান পরিস্থিতিকে প্রমাণসিদ্ধ করে; স্বৈরতন্ত্র, পুলিশ রাষ্ট্র, রাজকীয় নির্দেশসাপেক্ষ বিচার ও সেন্সর-ব্যবস্থার উপর বর্ষণ করে দার্শনিক আশীর্বাণী। তৃতীয় ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্ম ও তাঁর প্রজারা বাক্যটিকে এই অর্থেই বুঝেছিলেন। কিন্তু হেগেলের মতে বর্তমানে যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে নিশ্চয় তার সবই বিনাশর্তে বাস্তব নয়। হেগেলের বিচারে কেবল সেটাই বাস্তবতার গুণবিশিষ্ট যেটা সেই সঙ্গে আবার আবশ্যিকও বটে।

'বিকাশধারার পথে বাস্তব নিজেকে আবশ্যিক বলে প্রতিপন্ন করে।'

তাই তাঁর মতে যে কোনো সরকারী ব্যবস্থা — হেগেল নিজেই 'বিশেষ এক খাজনা আইনের' দৃষ্টান্ত দিয়েছেন — বিনাশর্তে বাস্তব নয়। কিন্তু যেটা আবশ্যিক, শেষ পর্যন্ত তা যৌক্তিক বলেও প্রতিপন্ন হয়। অতএব তখনকার প্রুশীয় রাষ্ট্রের উপর প্রযুক্ত হলে হেগেলীয় বাক্যটির কেবল এই অর্থ দাঁড়ায়: এ রাষ্ট্র যতদূর পর্যন্ত আবশ্যিক, ততদূর পর্যন্তই যৌক্তিক বা যুক্তিসিদ্ধ, এবং যদি তা সত্ত্বেও এটি আমাদের কাছে অশুভ বলে প্রতীয়মান হয় এবং অশুভ চরিত্র সত্ত্বেও যদি তা টিকে থাকে তাহলে সরকারের অশুভ চরিত্রটা সঙ্গত এবং তার ব্যাখ্যা মিলবে প্রজাদের পাল্টা অশুভ চরিত্রের মধ্যে। তখনকার প্রুশীয়রা যে-রকম সরকার পাবার উপযুক্ত তারা তাই-ই পেয়েছিল।

কিন্তু হেগেলের মতে বাস্তবতা এমন একটা ধর্ম নয় যা কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর সর্বাবস্থায় এবং সর্বকালে প্রযোজ্য। বরং তার বিপরীতই। রোমক প্রজাতন্ত্র বাস্তব ছিল, কিন্তু যে রোমক সাম্রাজ্য তার স্থান নেয় তার সম্বন্ধেও তো একই কথা। ১৭৮৯ সালে ফরাসী রাজতন্ত্র এমনই অবাস্তব হয়ে পড়েছিল, অর্থাৎ হয়ে পড়েছিল এমনই আবশ্যিকতাহীন, যুক্তিবিরুদ্ধ যে মহান বিপ্লবের সাহায্যে তার ধ্বংস প্রয়োজন হল; সে বিপ্লবের প্রসঙ্গে হেগেল সর্বদাই দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। অতএব, এ দৃষ্টান্তে রাজতন্ত্র অবাস্তব, বিপ্লবই বাস্তব। এইভাবে, আগে যা ছিল বাস্তব বিকাশধারার পথে তাইই হয়ে পড়ে অবাস্তব, লোপ পায় তার আবশ্যিকতা, তার অস্তিত্বের অধিকার, তার যুক্তিসিদ্ধতা। এবং মুমূর্ষু বাস্তবের স্থানে আসে এক নতুন সজীব বাস্তব, শান্তিপূর্ণভাবেই আসে যদি পুরাতনের পক্ষে বিনা সংগ্রামে বিলীন হবার মতো সুবুদ্ধিটুকু বজায় থাকে; আর ওই পুরাতন যদি এ আবশ্যিকতার প্রতিরোধ করে তাহলে আসে বলপ্রয়োগে। এইভাবে হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারেই হেগেলের প্রতিপাদ্য পরিণত হচ্ছে তার বিপরীতে: মানব-ইতিহাসের ক্ষেত্রে সমস্ত বাস্তবই কালক্রমে যুক্তিবিরুদ্ধ হয়ে পড়ে; অতএব নিজের প্রকৃতি অনুসারেই তা যুক্তিবিরুদ্ধ, আগে থাকতেই অযৌক্তিকতায় কলঙ্কিত; এবং মানব-মনের মধ্যে যা-কিছু যুক্তিসঙ্গত তাই শেষ পর্যন্ত বাস্তব হতে বাধ্য, সমসাময়িক আপাত বাস্তবের সঙ্গে তার যতই বিরোধ থাকুক না কেন। হেগেলীয় চিন্তাপদ্ধতির সমস্ত নিয়ম অনুসারে সমস্ত বাস্তবের যৌক্তিকতা সংক্রান্ত প্রতিপাদ্যটি শেষ পর্যন্ত আর একটি প্রতিপাদ্যে পরিণত হয়: যা-কিছু অস্তিত্বশীল তাই বিনাশের যোগ্য।

কিন্তু হেগেল-দর্শনের (এবং কাণ্টের সময় থেকে দর্শনের সমগ্র আন্দোলনের এই শেষ পর্বে আমরা আবদ্ধ থাকব) প্রকৃত তাৎপর্য ও বৈপ্লবিক চরিত্র আসলে ঠিক এই যে, মানবিক চিন্তা ও ক্রিয়ার ফলাফলগুলি সম্পর্কে চূড়ান্তপনার সমস্ত ধারণার উপর তা চিরকালের মতো মরণ আঘাত হেনেছে। সত্য, যাকে জানাই হল দর্শনের উদ্দেশ্য, সে সত্য আর হেগেলের কাছে কয়েকটি চূড়ান্ত আপ্তবাক্যের সমষ্টিমাত্র নয়, যা কিনা একবার আবিষ্কৃত

হবার পর শুধু মুখস্থ করতে পারলেই হল। এখন থেকে সত্য মিলবে জ্ঞান-আহরণ প্রক্রিয়ার মধ্যেই, বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্যেই, যে বিজ্ঞান ক্রমশই জ্ঞানের নিম্ন থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়, কিন্তু কখনোই তথাকথিত পরম সত্যকে আবিষ্কার করে এমন কোনো স্তরে পৌঁছোয় না যার পর আর তার অগ্রগতি সম্ভব নয়, যেখানে ওই লব্ধ সত্যটির সামনে করজোড়ে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার কিছুই করবার নেই। এবং দার্শনিক জ্ঞান সম্বন্ধে প্রযোজ্য এই কথা অন্যান্য সমস্ত জ্ঞান ও বাস্তব কর্ম সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। মানবতার কোনো এক নিখুঁত আদর্শ অবস্থায় জ্ঞান যেমন কোনো পরিপূর্ণ সমাপ্তিতে উপনীত হতে পারে না, তেমনি ইতিহাসও তা পারে না। কোনো নিখুঁত সমাজ বা নিখুঁত 'রাষ্ট্রের' অস্তিত্ব শুধুমাত্র কল্পনাতেই সম্ভব। পক্ষান্তরে একের পর এক প্রতিটি ঐতিহাসিক ব্যবস্থাই হল মানব-সমাজের নিম্ন থেকে ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়ে শেষহীন বিকাশধারার মধ্যে উৎক্রমণমূলক পর্যায়মাত্র। প্রতিটি পর্যায়ই আবশ্যিক, অতএব যে যুগ ও পরিবেশের কারণে তার উদ্ভব সেই যুগ ও পরিবেশের পক্ষে তা সঙ্গত। কিন্তু তারই গর্ভে যে নতুন ও উচ্চতর পরিস্থিতি ক্রমশ বিকাশলাভ করে তার সামনে তার বৈধতা ও যুক্তিসঙ্গতি লোপ পায়। উন্নততর পর্যায়ের জন্য তাকে পথ দিতেই হবে, যে পর্যায় নিজেও আবার ক্ষয় ও বিনাশ লাভ করবে। ঠিক যেমন বুর্জোয়ারা বৃহৎ শিল্প, প্রতিযোগিতা এবং বিশ্ববাজার সৃষ্টি ক'রে কার্যত সমস্ত কায়েমী যুগপূজ্য প্রতিষ্ঠান বিলীন করেছে, তেমনি এই দ্বান্দ্বিক দর্শনও বিলীন করেছে পরম সত্যের সমস্ত ধারণা এবং তদনুগামী মানবতার একটা চূড়ান্ত অবস্থার ধারণা। দ্বান্দ্বিক দর্শনের কাছে চূড়ান্ত, পরম বা পূত বলে কিছুই নেই। এ দর্শন সবকিছুর ক্ষেত্রে ও মধ্যে অনিত্যতা প্রকাশ করে দেয়; তার সামনে উদ্ভব ও বিলয়ের অবিচ্ছিন্ন ধারা ছাড়া, নিম্ন থেকে উচ্চতর অবস্থায় শেষহীন উন্নয়ন ছাড়া আর কিছুই টিকতে পারে না। এবং দ্বান্দ্বিক দর্শন নিজেই আসলে চিন্তাপরায়ণ মস্তিষ্কে এই পদ্ধতির প্রতিবিম্বমাত্র। তার একটি রক্ষণশীল দিকও অবশ্যই আছে: এ দর্শন অনুসারে জ্ঞান ও সমাজের বিকাশের নির্দিষ্ট এক-একটা পর্যায় তাদের কাল ও পরিস্থিতির পক্ষে সঙ্গত, কিন্তু তার বেশি আর কিছুই নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির রক্ষণশীলতাটুকু

আপেক্ষিক, এর বৈপ্লবিক তাৎপর্যই অনাপেক্ষিক — একমাত্র এই পরমটুকুই দ্বান্দ্বিক দর্শনে স্বীকৃত।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপূর্ণ সঙ্গতি আছে কিনা — এ বিজ্ঞান অনুসারে এমনকি পৃথিবীরও সম্ভাব্য অবসান এবং তার অধিবাসীদের বেশ সুনিশ্চিত অবসানের কথা বলা হয়, অতএব তাতে মানব-ইতিহাসেরও ঊর্ধ্বগতির দিক ছাড়াও একটি অধোগতির দিক স্বীকৃত — সে প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করবার প্রয়োজন নেই। সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন যখন মোড় ঘুরে নিম্নমুখী হবে সে বিন্দু থেকে আমরা অন্তত এখনো যথেষ্ট দূরে আছি এবং যে বিষয় এখনো প্রকৃতিবিজ্ঞানের কাছে আলোচ্য হয়ে ওঠে নি, হেগেল-দর্শন তা নিয়ে ভাবিত হবে এ আশা করতে পারি না।

কিন্তু এ কথাটা এখানে অবশ্যই বলা দরকার: হেগেলের রচনায় উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এত সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট হয় নি। এগুলি তাঁর পদ্ধতির অনিবার্য সিদ্ধান্ত, কিন্তু তিনি নিজে কখনো এতটা সুস্পষ্টভাবে সে সিদ্ধান্ত টানেন নি এবং বস্তুত তার সহজ কারণ এই যে, তিনি একটি দর্শনতন্ত্র গড়ে তুলতে বাধ্য ছিলেন এবং চিরাচরিত চাহিদা অনুসারে দর্শনতন্ত্রের উপসংহারে কোনো না কোনো চরম সত্য থাকতে বাধ্য। অতএব, বিশেষত তাঁর 'যুক্তিতত্ত্বে' ('Logic') হেগেল যত জোর দিয়েই বলুন না কেন যে, এই পরম সত্য কেবল যুক্তিমূলক (তাই ঐতিহাসিক) প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু তিনি সে প্রক্রিয়ার এক পরিসমাপ্তি যোগাতে বাধ্য বোধ করলেন, কেননা তাঁর দর্শনতন্ত্রকে কোনো না কোনো এক বিন্দুতে এনে শেষ করতেই হবে। তাঁর 'যুক্তিতত্ত্বে' তিনি এই শেষটাকে আবার শুরুতে পরিণত করতে পারেন, কেননা এখানে তাঁর সমাপ্তি-বিন্দু অর্থাৎ পরম ভাবসত্তা — এবং তা এই অর্থেই পরম যে, সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের পরম অভাব বর্তমান — 'অনন্বিত হয়' (alienates) অর্থাৎ রূপান্তরিত হয় প্রকৃতিরূপে এবং পরে চৈতন্যের মধ্যে — অর্থাৎ চিন্তা ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে — ফের স্বরূপ লাভ করে। কিন্তু এই সমগ্র দর্শনের শেষে অনুরূপভাবে ফের শুরুতে প্রত্যাবর্তন সম্ভব কেবল এক উপায়ে, অর্থাৎ কিনা, ইতিহাসের পরিসমাপ্তি নিম্নোক্তভাবে কল্পনা করতে হবে: মানবজাতি

এই পরম ভাবসত্তার জ্ঞান লাভ করছে এবং ঘোষণা করছে যে, হেগেলীয় দর্শনেই সে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সমস্ত গোঁড়ামি লোপ পায় তার বিপরীতে এইভাবে হেগেলীয় দর্শনতন্ত্রের গোঁড়ামির সবটুকুই পরম সত্য বলে ঘোষিত হয়েছে। বৈপ্লবিক দিকটি তাই রক্ষণশীলতার অতি বৃদ্ধিতে চাপা পড়ে গিয়েছে এবং শুধু দার্শনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, সেটা ঐতিহাসিক কর্মের ক্ষেত্রেও। মানবজাতি হেগেলের মাধ্যমেই যখন ওই পরম ভাবসত্তার পরিব্যাখ্যানের পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন কার্যক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই এত দূর এগিয়েছে যে, এই পরম ভাবসত্তাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা তার পক্ষে সম্ভব। অতএব সমসাময়িকদের উপর ওই পরম ভাবসত্তার বাস্তব রাজনৈতিক দাবিও খুব বেশি লম্বা করা উচিত নয়। তাই 'ব্যবহারশাস্ত্রের দর্শনের' উপসংহারে আমরা দেখি, তৃতীয় ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্ম বারবার কিন্তু ব্যর্থভাবে প্রজাদের কাছে সাবেকী সমাজ বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত যে রাজতন্ত্রের, অর্থাৎ তখনকার পেটি-বুর্জোয়া জার্মান অবস্থার উপযোগী মালিক-শ্রেণীর সীমাবদ্ধ নরমপন্থী পরোক্ষ যে শাসন-ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারই মধ্যেই নাকি ওই পরম ভাবসত্তা রূপ নেবে, এবং তাছাড়াও আমাদের কাছে আভিজাত্যের আবশ্যিকতা মনন পদ্ধতিতে প্রমাণ করা হয়েছে।

তাই, এমন এক সমূহ বৈপ্লবিক চিন্তাপদ্ধতি যে কেমন করে এহেন চূড়ান্ত নিরীহ এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত উপনীত হল তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাঁর দর্শনতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ আবশ্যিকতাগুলির মধ্যেই। আসলে এই বিশেষ ধরনের সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, হেগেল হলেন জার্মান, এবং সমসাময়িক গ্যেটের মতো তাঁর মাথাতেও একটি কূপমণ্ডূক টিকি ছিল। নিজ নিজ ক্ষেত্রে এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন এক-একজন অলিম্পীয় জিউস, কিন্তু কেউই জার্মান কূপমণ্ডূকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি।

কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও পূর্ববর্তী যে কোনো দর্শনতন্ত্রের তুলনায় হেগেলীয় তন্ত্র বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হতে বাধা পায় নি, এই সব ক্ষেত্রে চিন্তার এমন ঐশ্বর্য তা বিকশিত করতে পারল যা আজো বিস্ময়কর মনে হয়। মনের প্রপঞ্চবাদ (phenomenology) (তাকে মনের ভ্রূণতত্ত্ব ও প্রত্নজীববিদ্যার সমান্তরাল বলা যায়, বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে

ব্যক্তিচেতনার প্রকাশ, যে-স্তরগুলো ইতিহাসগতভাবে অতিক্রান্ত মানুষের চেতনার স্তরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হিশেবে আলোচিত), যুক্তিতত্ত্ব, প্রকৃতি-দর্শন, মনোদর্শন, শেষটি বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভাগ অনুসারে আলোচিত: ইতিহাসের দর্শন, ব্যবহারশাস্ত্রের দর্শন, ধর্মের দর্শন, দর্শনের ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব, ইত্যাদি—এই সব বিভিন্ন ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে হেগেল বিকাশের মূলসূত্র আবিষ্কার ও প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। এবং তিনি যেহেতু শুধুই সৃজনী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাই নয়, তাছাড়াও তাঁর ছিল বিশ্বকোষসুলভ পাণ্ডিত্য, তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর কীর্তি যুগান্তকারী। একথা অবশ্য স্বতঃই বোঝা যায় যে, 'দর্শনতন্ত্রের' খাতিরে তাঁকে প্রায়ই কয়েকটি কৃত্রিম ছক সৃষ্টি করতে হয়েছে, যা নিয়ে তাঁর বামন প্রতিপক্ষের দল আজো পর্যন্ত অমন ভয়ংকর সোরগোল তোলে। কিন্তু এগুলি তাঁর কীর্তির নেহাতই ভারা-বাঁধা মাচা। এখানে অনর্থক এলোমেলো না ঘুরে কেউ যদি আরো এগিয়ে প্রকাণ্ড সৌধটির মধ্যে ঢুকতে পারেন তাহলে তাঁর চোখে পড়বে অসীম ঐশ্বর্য, যার পুরো মূল্য আজো ম্লান হয় নি। সমস্ত দার্শনিকের ক্ষেত্রেই ঠিক 'দর্শনতন্ত্রটা'ই অনিত্য এবং তার সহজ কারণ মানবমনের এক অমর বাসনা, সমস্ত দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হবার বাসনা। কিন্তু যদি সমস্ত দ্বন্দ্ব সত্যই একবার উত্তীর্ণ হওয়া যায় তাহলে আমরা উপনীত হব পরম সত্যে — শেষ হবে বিশ্ব ইতিহাসের, তবু সে ইতিহাসকে চলতেই হবে, যদিও তখন তার আর করণীয় কিছু নেই। অতএব, এখানে এক নতুন সমাধানহীন অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। একবার যদি এই কথা হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে — এবং সেকথা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য শেষ পর্যন্ত আর কোন দার্শনিক হেগেলের চেয়ে বেশি সহায়তা করেন নি — এইভাবে বুঝলে দর্শনের কর্তব্য দাঁড়ায় একজন একক দার্শনিককে দিয়ে সেইটে সম্পন্ন করানো যা কিনা সমগ্র মানবজাতির ক্রমবিকাশের দ্বারা সাধ্য, একথা হৃদয়ঙ্গম করা মাত্র, এতদিন ধরে দর্শনকে যে অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে সে অর্থে সমস্ত দর্শনের অবসান অনিবার্য। তখন এই পথে ও একক দার্শনিকের পক্ষে যা অনধিগম্য, সেই 'পরম সত্যকে' শান্তিতে ছেড়ে দেওয়া হবে, কিন্তু তার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের পথ ধরে সন্ধান করা যাবে অধিগম্য আপেক্ষিক সত্যাবলির এবং দ্বান্দ্বিক চিন্তা-পদ্ধতি অনুসারে সে সত্যগুলির সামান্যীকরণ। অন্তত

হেগেলের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনেরও পরিসমাপ্তি ঘটল; কেননা, একদিকে তিনি তাঁর দর্শনতন্ত্রে সমগ্র দার্শনিক বিকাশের অত্যাশ্চর্য সামান্যীকরণ করেছেন এবং অপরদিকে, অচেতনভাবে হলেও তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন কীভাবে দর্শনতন্ত্রের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর বাস্তব সদর্থক জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

জার্মানির দর্শন-রঞ্জিত আবহাওয়ায় হেগেলীয় তন্ত্রের প্রচণ্ড প্রভাবের কথা কল্পনা করা কঠিন নয়। কয়েক দশক ধরে এক বিজয়যাত্রা চলল, হেগেলের মৃত্যুতেও তার পরিসমাপ্তি ঘটে নি। বরং ১৮৩০ থেকে ১৮৪০ সালেই 'হেগেলবাদ' প্রায় একচ্ছত্র রাজত্ব করেছে এবং এমনকি বিরোধীদের মধ্যেও তার প্রভাব কমবেশি সংক্রামিত হয়েছে। ঠিক এই পর্বেই, সচেতন বা অচেতন যেভাবেই হোক, বহু বিচিত্র বিজ্ঞানে হেগেলীয় মতবাদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে এবং যে জনবোধ্য সাহিত্য ও দৈনিকপত্র সাধারণ 'শিক্ষিত বিবেকের' খোরাক যোগায় তাকেও তা সুভাষিত করেছে। কিন্তু গোটা রণক্ষেত্র জুড়ে এই যে জয়, সেটাই হল এক অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের ভূমিকা।

আগেই দেখেছি, সামগ্রিকভাবে দেখলে হেগেলীয় মতবাদের মধ্যে অতি বিভিন্ন সব ব্যবহারিক পক্ষতামূলক মতামত ধারণ করার মতো প্রচুর অবকাশ আছে। অথচ তখনকার জার্মানির তত্ত্বগত পরিমণ্ডলে ব্যবহারিক তাৎপর্য ছিল সর্বোপরি দুটি জিনিসের: ধর্ম এবং রাজনীতির। হেগেলীয় **তন্ত্রের** ওপর প্রধান জোর দিলে যে কেউ উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট রক্ষণশীল হতে পারত; দ্বান্দ্বিক **পদ্ধতিকে** প্রধানতম বিবেচনা করলে যে কারোর পক্ষেই রাজনীতি ও ধর্ম উভয় ব্যাপারেই চরম বিরোধী দলের অন্তর্গত হওয়া সম্ভব। তাঁর রচনায় বৈপ্লবিক উষ্মার প্রভূত অভিব্যক্তি সত্ত্বেও মনে হয় হেগেল নিজে মোটের উপর রক্ষণশীলতারই পক্ষপাতী ছিলেন। বস্তুত পদ্ধতির তুলনায় তাঁর দর্শনতন্ত্রের জন্য হেগেলকে ঢের বেশি 'কঠিন মানসিক পরিশ্রম' করতে হয়েছিল। তিরিশের দশকের শেষাশেষি তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ক্রমশই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। গোঁড়া পিয়েটিস্ট (১০২) ও সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তথাকথিত তরুণ হেগেলপন্থীরা (১০৩) — বামপন্থীরা — একটু একটু করে তৎকালীন তীব্র সমস্যাবলির

প্রতি তাঁদের দার্শনিক-ভদ্রলোকী আচরণ পরিহার করলেন — এতদিন পর্যন্ত এই জন্যই তাঁদের মতবাদের প্রতি রাষ্ট্রের সহনশীলতা এমনকি আনুকূল্য জুটেছিল। এবং ১৮৪০ সালে চতুর্থ ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্মের সঙ্গে সঙ্গে গোঁড়া ভন্ডামি ও স্বৈরপন্থী-সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া সিংহাসনে আসীন হবার পর খোলাখুলি পক্ষগ্রহণ প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ল। তখনো দার্শনিক অস্ত্র নিয়েই সংগ্রাম চলেছে, কিন্তু তা আর অমূর্ত-দার্শনিক আদর্শের জন্য নয়। সরাসরি সাবেকী ধর্ম ও সমসাময়িক রাষ্ট্র উচ্ছেদের কথাই উঠল। *Deutsche Jahrbücher*-এ (১০৪) এখনো ব্যবহারিক লক্ষ্যের কথাটা দার্শনিক ছদ্মবেশে উপস্থাপিত হলেও ১৮৪২ সালের *Rheinische Zeitung*-এ তরুণ হেগেলপন্থী প্রচার সরাসরি উদীয়মান র‍্যাডিকেল বুর্জোয়ার দর্শন হিশেবেই আত্মপ্রকাশ করল, দার্শনিক আলখাল্লাটা ব্যবহৃত হত কেবল সেন্সরকে ছলনা করার জন্য।

সেসময়ে কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্র নেহাতই কণ্টকিত, তাই প্রধান সংগ্রাম ধর্মের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হল। অবশ্য এ সংগ্রাম পরোক্ষভাবে রাজনৈতিকও ছিল, বিশেষ করে ১৮৪০ থেকে। ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত স্ট্রাউসের 'যীশুর জীবন' তার প্রথম প্রেরণা জোগায়। এই গ্রন্থে খ্রীষ্টীয় পুরাকথার (gospel myths) উৎস সংক্রান্ত যে মতবাদ প্রস্তাবিত হয়েছিল পরে ব্রুনো বাউয়ের তার বিরোধিতা করেন এবং প্রমাণ দেন যে, বহু খ্রীষ্টীয় গল্পই শাস্ত্রকারদের উদ্ভাবনমাত্র। মতবাদদুটির মধ্যে সংঘর্ষ চলে 'আত্মচেতনা' ও 'বস্তুসত্তা' (substance) নিয়ে দার্শনিক বিতর্কের ছদ্মবেশে। বাইবেলের অলৌকিক উপাখ্যানগুলি গোষ্ঠীর গর্ভে অচেতন, চিরাচরিত পুরাকথা-উদ্ভাবন প্রবৃত্তির পরিণাম, না সেগুলি শাস্ত্রকারদেরই উদ্ভাবন, এই সমস্যাকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে প্রশ্ন তোলা হল: বিশ্ব ইতিহাসের ক্ষেত্রে নির্ধারক সক্রিয় শক্তি 'বস্তুসত্তা' না 'আত্মচেতনা'? শেষ পর্যন্ত এলেন সমসাময়িক নৈরাজ্যবাদের পয়গম্বর স্টিরনার — বাকুনিন তাঁর কাছে অনেক ঋণী — এবং তিনি সার্বভৌম 'আত্মচেতনার' মাথায় পরালেন তাঁর সার্বভৌম 'অহং'-এর মুকুট (১০৫)।

হেগেলীয় সম্প্রদায়ের ভাঙনের এই দিকটার বিস্তারিত আলোচনা আমরা আর তুলব না। আমাদের কাছে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই: তরুণ

হেগেলপন্থীদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁদের অনেকেই প্রত্যক্ষ ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বাস্তব প্রয়োজনে ইঙ্গ-ফরাসী বস্তুবাদে গিয়ে পে'ছিলেন। এখানে সংঘর্ষ ঘটল তাঁদের সম্প্রদায়গত দর্শনতন্ত্রের সঙ্গে। বস্তুবাদ অনুসারে প্রকৃতিই একমাত্র সত্য; পক্ষান্তরে হেগেলীয় তন্ত্র অনুসারে প্রকৃতি আসলে পরম ভাবসত্তার 'অনন্বয়' মাত্র, অর্থাৎ, বলতে কি, তা ভাবসত্তার অধঃপতন বিশেষ; যাই হোক, এখানে চিন্তা-প্রক্রিয়া ও তার চিন্তাফল, বা ভাবসত্তাই হল আদি এবং প্রকৃতি হল উৎপন্ন বস্তু, তার অস্তিত্ব রয়েছে কেবল ভাবসত্তার অনুমতিসাপেক্ষে। এবং এই অন্তর্বিরোধের মধ্যেই তরুণ হেগেলপন্থীরা নানারকম হাবুডুবু খেয়েছেন।

তারপর এল ফয়েরবাখের 'খ্রীষ্টধর্মের মর্মবস্তু', ঘোরপ্যাঁচ বাদ দিয়ে সরাসরি বস্তুবাদকে আবার প্রতিষ্ঠিত ক'রে তা এক ফুৎকারে ওই অন্তর্বিরোধকে ধুলো করে দিল। কোনো রকম দর্শনের অপেক্ষা না করেই প্রকৃতি বর্তমান। মানুষ আমরা নিজেরাই হলাম প্রকৃতির উৎপন্ন, বেড়ে উঠেছি প্রকৃতির এই ভিত্তির ওপরেই। প্রকৃতি এবং মানুষের বাইরে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই এবং আমাদের ধর্মীয় উৎকল্পনায় যেসমস্ত উচ্চতর সত্তা উদ্ভাবিত হয়েছে, তারা হল আমাদের নিজেদেরই সত্তার কাল্পনিক প্রতিবিম্বমাত্র। ভাঙল মোহ; 'দর্শনতন্ত্র' ফেটে গিয়ে পরিত্যক্ত হল। প্রমাণ হল, অন্তর্বিরোধটির অবস্থান মাত্র আমাদের কল্পনাতেই, অতএব তা বিলীন হয়ে গেল। এ গ্রন্থ যে কী মুক্তির আস্বাদ দিল, অভিজ্ঞতা ছাড়া তার ধারণা করা যায় না। সঞ্চারিত হল সর্বব্যাপী উৎসাহ: আমরা সকলে তৎক্ষণাৎ ফয়েরবাখপন্থী হয়ে গেলাম। এই নতুন ধারণাকে মার্কস যে কী উৎসাহে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং সমস্ত সমালোচনামূলক আপত্তি সত্ত্বেও তিনি এর দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তা 'পবিত্র পরিবার' বইটি পড়লে বোঝা যায়।

বইটির ত্রুটিগুলি পর্যন্ত তার আশু প্রভাবকে বাড়াতে সাহায্য করে। তার সাহিত্যসুলভ, কখনো কখনো এমনকি সাড়ম্বর, রচনারীতি ব্যাপক পাঠকসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল, এবং অনেক বছর ধরে অমূর্ত ও দুর্বোধ্য হেগেলপন্থার পর তা অন্তত স্বস্তিকর মনে হয়েছিল। বইটিতে প্রেম নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাস সম্বন্ধেও একই কথা; অবশ্য 'শুদ্ধ মননের' অধুনা অসহ্য

একাধিপত্যের পর তার যৌক্তিকতা যদিই বা না থাকে, অন্তত কৈফিয়ৎ ছিল। কিন্তু আমাদের পক্ষে কিছুতেই ভোলা চলবে না যে, ১৮৪৪ থেকে জার্মানির 'শিক্ষিত' সমাজে মহামারীর মতো যা সংক্রামিত হয়েছে সেই 'সাঁচ্চা সমাজতন্ত্র' শুরু করে ফয়েরবাখের ঠিক এই দুটি দুর্বলতা থেকেই। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বদলে তা সামনে আনে সাহিত্যিক বাণী, উৎপাদন-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রলেতারিয়েতের মুক্তির বদলে আনে 'প্রেমের' সাহায্যে মানবজাতির মুক্তি। সংক্ষেপে, ন্যক্কারজনক ফুলেল ভাষা ও প্রেমের উচ্ছ্বাসে তা আত্মহারা হয়। এই ধারার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কার্ল গ্রুন মশাই।

আরো একটি কথাও ভোলা চলবে না: হেগেলীয় সম্প্রদায়ে ভাঙন ধরলেও সমালোচনার সাহায্যে হেগেলীয় দর্শনের খন্ডন হয় নি। স্ট্রাউস এবং বাউয়ের তার এক-একটি দিক গ্রহণ করে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিতর্ক চালান। ফয়েরবাখ সেই দর্শনতন্ত্র ভেঙে বেরিয়ে আসেন এবং তা স্রেফ বর্জন করেন। কিন্তু কোনো একটি দর্শনকে শুধু ভুল বলে ঘোষণা করলেই তা খণ্ডিত হয় না। এবং হেগেল-দর্শনের মতো অমন শক্তিশালী যে কীর্তি জাতির মানসিক বিকাশের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছে, তাকে শুধু অবজ্ঞা দিয়ে দূর করা যায় না। তার নিজের অর্থেই তাকে 'মুছে দেওয়া' প্রয়োজন, অর্থাৎ সমালোচনার সাহায্যে তার আধার ধ্বংস করে তার লব্ধ নতুন আধেয়টিকে রক্ষা করা প্রয়োজন। এই কাজ কী করে সমাধা হয়েছিল তা আমরা পরে দেখব।

কিন্তু ফয়েরবাখ যেমন বিনা বাক্যব্যয়ে হেগেলকে ঠেলে সরিয়ে দেন, ইতিমধ্যে ১৮৪৮-এর বিপ্লবও তেমনি বিনা বাক্যব্যয়েই সমস্ত দর্শনকেই ঠেলে সরিয়ে দেয়। এবং সে প্রক্রিয়ার মধ্যে ফয়েরবাখ নিজেও আড়ালে পড়ে যান।

২

সমস্ত দর্শনের, বিশেষত সাম্প্রতিকতম দর্শনের বৃহৎ বনিয়াদী প্রশ্ন হল চিন্তা ও সত্তার সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্ন। খুব আদিম কাল থেকেই, মানুষ যখন নিজের দেহ গঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং স্বপ্নচ্ছায়ার ব্যাখ্যা করতে

না পেরে* তার বিশ্বাস হয়েছে যে, তার চিন্তা ও সংবেদনা তার নিজস্ব দৈহিক প্রক্রিয়া নয়, কোনো এক বিশিষ্ট আত্মার কাজ, সে আত্মা দেহতে বাস করে এবং মৃত্যুর সময় দেহকে পরিত্যাগ করে, সেই যুগ থেকেই মানুষকে এই আত্মার সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করতে হয়েছে। এ আত্মা যদি মৃত্যুর পর দেহকে পরিত্যাগ করেও বেঁচে থাকে, তাহলে তার আরো এক স্বতন্ত্র মৃত্যু সম্ভাবনা আবিষ্কার করবার কারণ থাকে না। এইভাবেই ধারণা জন্মাল আত্মা অমর; বিকাশের সে পর্যায়ে এই অমরত্বের কথাটা মোটেই সান্ত্বনা নয়, বরং এমনই এক নিয়তি যার বিরুদ্ধে যোঝবার প্রচেষ্টা নিষ্ফল, এবং প্রায়ই, যেমন গ্রীকদের মধ্যে, তাকে ধরা হত রীতিমতো এক দুর্ভাগ্য বলে। ধর্মমূলক সান্ত্বনার আকাঙ্ক্ষা থেকে নয়, বরং আত্মার অস্তিত্ব একবার স্বীকার করার পর দেহাবসানে আত্মা নিয়ে কী করা যাবে, এ বিষয়ে সাধারণ সীমাবদ্ধতাপ্রসূত বিহ্বলতা থেকে উদ্ভব হল ব্যক্তির অমরত্ব সংক্রান্ত বিরস ধারণার। ঠিক এইভাবেই বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিতে ব্যক্তিত্বারোপ করা প্রথম দেবতাদের উদ্ভব হল এবং ধর্মের আরো বিকাশের পর্যায়ে এই দেবতারা ক্রমশই অপ্রাকৃত রূপ লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যা দেখা দেয় সেই অমূর্তায়ন প্রক্রিয়ার — এমনকি বলতে পারি পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ার — মাধ্যমে বহু ন্যূনাধিক সীমাবদ্ধ এবং পরস্পরকে সীমাবদ্ধকারী দেবতাদের মধ্যে থেকে মানুষের মনে উদ্ভব হল একেশ্বরবাদী ধর্মগুলির (১০৬) একক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধারণা।

তাই, যে কোনো ধর্মের মতোই চিন্তা ও সত্তার, আত্মা ও প্রকৃতির সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্নের, সমগ্র দর্শনের সর্বপ্রধান প্রশ্নের মূলে আছে বন্য দশার সংকীর্ণ ও অজ্ঞ ধারণা। কিন্তু ইউরোপের মানুষ খ্রীষ্টীয় মধ্য যুগের সুদীর্ঘ আচ্ছন্নতা থেকে জেগে ওঠবার পরই প্রশ্নটি পুরো তীক্ষ্ণতার সঙ্গে প্রথম উত্থাপিত হতে, তার পূর্ণ তাৎপর্য অর্জন করতে পারল। চিন্তার

* বন্য এবং নিম্ন-বর্বর স্তরের মানুষের মধ্যে এখনও এই মর্মে একটা সর্বজনীন ধারণা আছে যে, স্বপ্নে দেখা দেয় যে-নরমূর্তি সেটা সাময়িকভাবে দেহ-ছেড়ে-আসা আত্মা; কাজেই, স্বপ্নের অপচ্ছায়া স্বপ্নদ্রষ্টার বিরুদ্ধে কিছু করলে সেজন্যে আদত মানুষটিকেই দায়ী করা হয়। এইভাবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, গিয়ানার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল বলে লক্ষ্য করেছিলেন ইম্‌ থার্ন ১৮৮৪ সালে। (এঙ্গেলসের টীকা।)

সঙ্গে সত্তার সম্পর্ক কী, — চৈতন্য ও প্রকৃতির মধ্যে কোন্‌টি আদি — এই প্রশ্নটি প্রসঙ্গত মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিকস-এর ক্ষেত্রেও একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল, আর খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত রূপে শাণিত হয়েছিল: ঈশ্বর কি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, না, চিরকালই জগতের অস্তিত্ব ছিল?

এ প্রশ্নের যে যেমন উত্তর দিয়েছেন সেই অনুসারে দার্শনিকেরা দুটি বৃহৎ শিবিরে বিভক্ত হয়েছেন; যাঁরা প্রকৃতির তুলনায় চৈতন্যকে আদি বলেছেন, অতএব কোনো না কোনো ভাবে শেষ পর্যন্ত মেনেছেন জগৎ সৃষ্টির কথা — এবং দার্শনিকদের মধ্যে, যেমন হেগেলের বেলায়, এই সৃষ্টির ব্যাপারটা খ্রীষ্টধর্মের চেয়েও প্রায়ই অনেক বেশি জট-পাকনো ও বিদ্‌ঘুটে হয়ে ওঠে — তাঁদের নিয়ে গড়ে উঠেছে ভাববাদীদের শিবির। অন্যেরা যাঁরা প্রকৃতিকে আদি মনে করেছেন তাঁরা বিভিন্ন বস্তুবাদী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ভাববাদ এবং বস্তুবাদ এই দুটি পরিভাষা শুরুতে এ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় নি, এবং এখানেও এগুলি অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। আমরা পরে দেখব এগুলির উপর অন্য কোনো অর্থ আরোপ করলে কী রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

কিন্তু চিন্তার সঙ্গে সত্তার সম্পর্কের প্রশ্নটির আরো একটা দিক আছে: যে জগৎ দ্বারা আমরা পরিবৃত সে সম্বন্ধে আমাদের চিন্তার সঙ্গে সেই জগতের সম্পর্ক কী রকম? আমাদের চিন্তা কি বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সক্ষম, বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণা, সেটা কি বাস্তবতার সঠিক প্রতিবিম্ব দিতে পারে? দর্শনের পরিভাষায় এই সমস্যাটিকে বলা হয় চিন্তা ও সত্তার অভিন্নতার সমস্যা। দার্শনিকদের বিপুল অধিকাংশই প্রশ্নটির ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। যেমন হেগেলের ক্ষেত্রে এই ইতিবাচক উত্তর স্বতঃসিদ্ধ: কেননা বাস্তব জগতের ক্ষেত্রে আমরা যার জ্ঞানলাভ করি তা হল সে জগতের মননসার, সেইটে যার কল্যাণে এ বিশ্ব হয়ে উঠছে পরম ভাবসত্তার ক্রমিক রূপায়ণ, যে ভাবসত্তা অনাদিকাল যাবৎ বিশ্ব থেকে স্বাধীনভাবে এবং বিশ্বের আগে থেকে কোথাও না কোথাও বর্তমান ছিল। একথা স্বতঃস্পষ্ট যে, মননপ্রক্রিয়া এমন একটা সারবস্তুকে জানতে সক্ষম, যা আগে থেকেই একটা মননসার। একথাও সমান সুস্পষ্ট যে, এখানে যা প্রতিপাদ্য সেটা মূল বাক্যের মধ্যেই সঙ্গোপনে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও চিন্তা ও সত্তার অভিন্নতা সংক্রান্ত তাঁর প্রমাণ থেকে আরো এই সিদ্ধান্ত করতে হেগেলের কোন বাধা হয় নি যে, তাঁর দর্শন তাঁর নিজের চিন্তার কাছে সঠিক বলেই সেটা একমাত্র সঠিক দর্শন, তাই চিন্তা ও সত্তার অভিন্নতার জন্য মানবজাতিকে তাঁর দর্শনকে তত্ত্বের ক্ষেত্র থেকে ব্যবহারে পরিবর্তিত করে সমগ্র জগৎকে হেগেলীয় মূলসূত্র অনুসারে রূপান্তরিত করতে হবে। প্রায় সমস্ত দার্শনিকের মতোই হেগেলও এই ভ্রান্তিটি পোষণ করেন।

এ ছাড়া আরো একদল দার্শনিক আছেন, যাঁরা বিশ্ব বিষয়ে কোনো জ্ঞানের সম্ভাবনা বা অন্তত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের সম্ভাবনা অস্বীকার করেন। আধুনিকদের মধ্যে এই দলে পড়েন হিউম এবং কাণ্ট এবং তাঁরা দর্শনের বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এই মতের খণ্ডনে চূড়ান্ত কথাটা ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যতটা সম্ভব তা হেগেল ইতিপূর্বেই বলে গেছেন। ফয়েরবাখ-সংযোজিত বস্তুবাদী আপত্তিগুলিতে গভীরতার চেয়ে চাতুর্য বেশি; অন্যান্য দার্শনিক উদ্ভটত্বের মতোই একথারও চূড়ান্ত খণ্ডন হল প্রয়োগ, অর্থাৎ পরীক্ষা ও শিল্প। আমরা যদি কোনো এক প্রাকৃতিক ঘটনা নিজেরাই ঘটাতে পারি, তার সমস্ত শর্ত পূরণ করে তাকে সম্ভব করে তুলতে পারি এবং তার উপরে তাকে আমাদের কাজে লাগাতে পারি, তাহলে সে ঘটনা বিষয়ে আমাদের ধারণার যাথার্থ্য প্রমাণ হবে ও তার ফলে কাণ্টের অজ্ঞেয় 'প্রকৃত-বস্তুর' অবসান ঘটবে। যতদিন না জৈব রসায়ন একের পর এক উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের রাসায়নিক বস্তুগুলি উৎপাদন করতে শুরু করে ততদিন পর্যন্ত এগুলিও ছিল ওই জাতীয় 'প্রকৃত-বস্তু'; 'প্রকৃত-বস্তুটি' তখন আমাদের বস্তুতে পরিণত হল, যেমন হয়েছে অ্যালিজারিন অর্থাৎ ম্যাডারের রং বস্তুটি — এখন আমরা ক্ষেতে চাষ করা ম্যাডারের শিকড় থেকে তা নিষ্কাশন করি না, অনেক সহজে আর সস্তায় তা উৎপাদন করি আলকাতরা থেকে। তিনশ' বছর ধরে কোপের্নিকাস বর্ণিত সৌরজগৎ ছিল একটি প্রকল্প, সেটা খুব সম্ভবপর হলেও তবুও শেষ পর্যন্ত প্রকল্প মাত্রই। কিন্তু যখন লেভেরিয়ে এই প্রণালীর তথ্য অনুসারে শুধু যে একটি অজ্ঞাত গ্রহের অস্তিত্বের প্রয়োজন অনুমান করলেন তাই নয়, এমনকি সেই গ্রহ আকাশের কোথায় থাকতে বাধ্য তাও হিসাব করে ঠিক করলেন, এবং যখন

গাল্লে বাস্তবিকই সেই গ্রহকে (১০৭) খুঁজে বার করলেন, তখন কোপের্নিকাসের প্রণালী প্রমাণিত হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি জার্মানিতে নব্যকাণ্টপন্থীরা কাণ্টের মতবাদ এবং ইংলণ্ডে অজ্ঞেয়তাবাদীরা (১০৮) হিউমের মতবাদ (যেখানে বস্তুত এ মতবাদ কখনো নিশ্চিহ্ন হয় নি) পুনরুজ্জীবিত করবার প্রচেষ্টা করেন, তাহলে বহুকাল আগেই উভয় মতের তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত খণ্ডন হয়ে যাবার পর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ হল পশ্চাদপসরণ মাত্র এবং কার্যক্ষেত্রে এ হল কেবল বস্তুবাদকে জগতের সামনে অস্বীকার করে গোপনে তা গ্রহণ করার এক লজ্জিত ধরন মাত্র।

কিন্তু দেকার্ত থেকে হেগেল এবং হব্‌স থেকে ফয়েরবাখ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল ধরে দার্শনিকেরা মোটেই বিশুদ্ধ মননের শক্তিতে পরিচালিত হন নি, যদিও তাঁরা তাই মনে করেছেন। পক্ষান্তরে, যা তাঁদের প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বেশি ঠেলে এগিয়ে দিয়েছে তা হল প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং শিল্পের দ্রুত অগ্রগতির জোয়ার। বস্তুবাদীদের বেলায় সেটা এমনিতেই পরিষ্কার। কিন্তু ভাববাদী দার্শনিকদের তন্ত্রগুলিও ক্রমবর্ধমানভাবে বস্তুবাদী আধেয় দিয়ে নিজেদের পূর্ণ করতে লাগল এবং সর্বভূতেশ্বরবাদ (১০৯) ধরনে আত্মা ও পদার্থের বিরোধ সমন্বয়ের প্রয়াস পেল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত হেগেলীয় দর্শনতন্ত্র হল পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ভাববাদী ভঙ্গিতে উল্টো করে দাঁড় করানো বস্তুবাদ।

অতএব বুঝতে পারা যায় স্টার্কে কেন ফয়েরবাখের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে প্রথমেই চিন্তা ও সত্তার সম্পর্ক সংক্রান্ত এই মৌলিক সমস্যাটির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কী তাই অনুসন্ধান করেছেন। একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় পূর্ববর্তী দার্শনিকদের, বিশেষত কাণ্টপরবর্তী দার্শনিকদের কথা অনাবশ্যক গুরুত্বগম্ভীর দার্শনিক ভাষায় আলোচনার পর, হেগেলের রচনার কয়েকটি অনুচ্ছেদের প্রতি অতিরিক্ত রকমের ফর্মালিস্ট মনোযোগ অর্পণ করে তাঁর প্রকৃত প্রাপ্য না দিয়ে ফয়েরবাখের প্রাসঙ্গিক সব রচনা-পারম্পর্যে প্রতিফলিত তাঁর 'অধিবিদ্যার' ক্রমবিকাশ খুঁটিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বর্ণনা সযত্নে ও প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যাত, কেবল স্টার্কে-র সমগ্র গ্রন্থের মতোই তা দার্শনিক পরিভাষায় কণ্টকিত, যা সর্বত্র অপরিহার্য নয়। এই পরিভাষা আরো বিরক্তিকর লাগে এই কারণে যে, লেখক কোনো একটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের

এমনকি ফয়েরবাখেরও বাগ্‌ধারা অনুসরণ করে যান নি, অতি বিভিন্ন সব ধারার, বিশেষত আজকাল দর্শনমন্য যেসব ধারার বহুল প্রচলন, সেগুলির পরিভাষা তার মধ্যে গুঁজে দিয়েছেন।

যদিও অবশ্য ফয়েরবাখ কখনো ঠিক গোঁড়া হেগেলপন্থী ছিলেন না, তবু তাঁর বিবর্তনধারা হল জনৈক হেগেলপন্থীর বস্তুবাদীতে পরিণতির বিবর্তন। এই বিকাশের কোনো এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে তাঁর পূর্বসূরির ভাববাদী দর্শনতন্ত্রের সঙ্গে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ প্রয়োজন হয়। শেষ পর্যন্ত অনিবার্যভাবেই তাঁর উপলব্ধি হয় যে, হেগেলীয় 'পরম ভাবসত্তার' প্রাক্-বিশ্ব অস্তিত্ব, বিশ্বের অস্তিত্বের আগেই 'যৌক্তিক বর্গসমূহের পূর্বস্থিতি' আসলে বিশ্ববহির্ভূত এক স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসের আজগুবি জের ছাড়া আর কিছুই নয়; আমরা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক জগতের অন্তর্গত সেটাই একমাত্র সত্য, এবং আমাদের চেতনা ও চিন্তা যতই অতীন্দ্রিয় বলে প্রতীত হোক না কেন তা একটি পদার্থময় অঙ্গ — মস্তিষ্কের সৃষ্টি। চৈতন্য থেকে পদার্থ উৎপন্ন নয়, বরং চৈতন্য হল পদার্থের সর্বোচ্চ সৃষ্টি। নিঃসন্দেহেই একথা হল বিশুদ্ধ বস্তুবাদ। কিন্তু এই পর্যন্ত অগ্রসর হয়েই ফয়েরবাখ হঠাৎ থেমে যান। তিনি প্রচলিত দার্শনিক কুসংস্কার উত্তীর্ণ হতে পারেন না, যদিও সে কুসংস্কার জিনিসটার বিরুদ্ধে নয়, 'বস্তুবাদ' নামটির বিরুদ্ধে। তিনি বলেন:

> 'আমার কাছে বস্তুবাদ হল মানবিক সত্তা ও জ্ঞানরূপী ইমারতটির ভিত্তি; কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে শারীরবৃত্তবিদের কাছে, প্রকৃতিবিজ্ঞানীর কাছে, যেমন মলেশট-এর কাছে বস্তুবাদ যা, আমার কাছে তা নয় — তাদের পেশা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ঐ ইমারতটাই হল বস্তুবাদ। বস্তুবাদীদের সঙ্গে পেছনের দিকে আমি সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু সামনের দিকে নয়।'

পদার্থ ও চৈতন্যের সম্পর্ক বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সাধারণ বিশ্ববীক্ষা রূপে বস্তুবাদ এবং ইতিহাসের কোন এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে যথা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বিশ্ববীক্ষা যে বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়েছিল, এই দুটি জিনিসকে এখানে ফয়েরবাখ গুলিয়ে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, আজও প্রকৃতিবিজ্ঞানী এবং শারীরবৃত্তবিদদের মাথায় অষ্টাদশ

শতাব্দীর বস্তুবাদটি যে অগভীর ও স্থূল রূপে বিরাজমান, এবং পঞ্চাশের দশকে ব্যুখনার, ফগ্‌ট ও মলেশট তাঁদের সফরকালে তার যে রূপটি প্রচার করেছেন, ফয়েরবাখ সেটাকেও এর সঙ্গে তাল পাকিয়েছেন। কিন্তু ভাববাদ যেমন পরপর নানা স্তরের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে, বস্তুবাদও তাই। এমনকি প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রতিটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তারও রূপ বদল করতে হয়েছে। এবং ইতিহাসের উপরও বস্তুবাদ প্রযুক্ত হবার পর এখানেও তার বিকাশের একটি নতুন পথ উন্মোচিত হয়েছে।

গত শতাব্দীর বস্তুবাদ ছিল প্রধানতই যান্ত্রিক, কেননা সেসময়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মধ্যে শুধুমাত্র বলবিজ্ঞান একটা নির্দিষ্ট উপসংহারে পেশছেছে, তাও আবার সে হল শুধু কঠিন (পার্থিব ও নভোচারী) বস্তুর বলবিজ্ঞান, অর্থাৎ সংক্ষেপে অভিকর্ষের বলবিজ্ঞান। রসায়ন তখন নেহাতই তার শৈশবে — ফ্লজিস্টন (১১০) তত্ত্বের পর্যায়ে। জীববিজ্ঞানের তখনো কাঁথামোড়া নবজাতকের মতো অবস্থা: উদ্ভিদ ও প্রাণীজীব-সত্তা নিয়ে স্থূল ধরনের পরীক্ষা করা হয়েছে এবং শুধু যান্ত্রিক কারণের সাহায্যে সেগুলির ব্যাখ্যা হচ্ছে। দেকার্তের কাছে জীবজন্তু যা, অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদীদের কাছে মানুষও তাই, যন্ত্রমাত্র। চিরায়ত ফরাসী বস্তুবাদের প্রথম বিশিষ্ট এবং সেকালের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী ত্রুটি হল রাসায়নিক ও জৈব প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বলবিদ্যার মাপকাঠি প্রয়োগ — এই সব প্রক্রিয়ায় অবশ্য বলবিদ্যার নিয়মাবলিও বৈধ, কিন্তু তা অন্য উন্নততর নিয়মের চাপে পিছনে হটে গিয়েছে।

এই বস্তুবাদের দ্বিতীয় বিশিষ্ট সীমাবদ্ধতা হল বিশ্বকে একটা প্রক্রিয়া হিশেবে, অবিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যাওয়া পদার্থ হিশেবে উপলব্ধির অক্ষমতা। এই অক্ষমতার সঙ্গে সেসময়কার প্রকৃতিবিজ্ঞানের মাত্রা ও তৎসংযুক্ত অধিবিদ্যামূলক অর্থাৎ দ্বন্দ্বতত্ত্ববিরোধী দার্শনিকতার সঙ্গতি ছিল। তখনো এটুকু জানা ছিল যে, প্রকৃতি অন্তত গতিময়। কিন্তু তখনকার ধারণা অনুসারে এই গতি অনন্তকাল ঘটে চলেছে একই বৃত্তে এবং অতএব একই স্থানে আবদ্ধ, বারবার একই ফলাফল সৃষ্টি করছে। এই ধারণা তখন অনিবার্য ছিল। সৌরজগতের উদ্ভব বিষয়ে কাণ্টের মতবাদ (১১১) তখন সবেমাত্র প্রস্তাবিত হয়েছে এবং

তখনো মতবাদটি শুধুমাত্র কৌতুকাবহ। পৃথিবীর বিকাশের ইতিহাস বা ভূতত্ত্ব তখনো একান্তভাবেই অজ্ঞাত এবং সেসময়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এ ধারণা হাজির করাই সম্ভব হয় নি যে, আজকের দিনের জীবন্ত প্রাণীগুলি সরল থেকে জটিলে বিবর্তনের এক সুদীর্ঘ ধারার পরিণাম। অতএব, প্রকৃতি সংক্রান্ত অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনিবার্য ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিকদের এ নিয়ে দোষারোপ করা এই কারণে আরো অসঙ্গত হবে যে, হেগেলের মধ্যেও একই ব্যাপার দেখা যায়। তাঁর মতে ভাবসত্তার মাত্র 'অনন্বয়' হিশাবে প্রকৃতির কোনো কালগত বিকাশ সম্ভব নয়; তার শুধুমাত্র দেশগত (space) বৈচিত্র্য প্রসারিত হতে পারে, অতএব তার মধ্যে বিবৃত বিকাশের সমস্ত স্তর তা একই সময়ে এবং পাশাপাশি উদ্‌ঘাটিত করে দেয় এবং একই প্রক্রিয়ার অন্তত পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য। দেশগত, কিন্তু কালবহির্ভূত — অথচ সেটা হল যে কোনো বিকাশের মূল শর্ত — বিকাশের এই আজগুবি ধারণাটা হেগেল প্রকৃতির উপর আরোপ করেন ঠিক এমন এক সময়ে যখন কিনা ভূতত্ত্ব, ভ্রূণতত্ত্ব, উদ্ভিদ ও জীবের শারীরবৃত্ত এবং জৈব রসায়ন যথেষ্ট বিকশিত হয়েছে এবং যখন এই নতুন বিজ্ঞানগুলির ভিত্তিতে সর্বত্রই বিবর্তনের ভবিষ্যৎ তত্ত্বের উজ্জ্বল পূর্বাভাস দেখা দিচ্ছে (যথা গ্যেটে এবং লামার্ক)। কিন্তু এটা তাঁর দর্শনতন্ত্রের জন্য দরকার; অতএব সেই দর্শনতন্ত্রের খাতিরে তাঁর পদ্ধতির কপটতা প্রয়োজন।

ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একই অনৈতিহাসিক ধারণা প্রচলিত ছিল। সেখানে মধ্য যুগের জেরের সঙ্গে সংগ্রামে দৃষ্টি আবিল হয়েছিল। মধ্য যুগকে ধরা হত যেন হাজার বছরের সর্বাত্মক বর্বরতা দিয়ে ইতিহাসের একটা ছেদ। মধ্য যুগে ঘটা বিরাট অগ্রগতি — ইউরোপীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্র বিস্তার, পাশাপাশি মহান প্রাণবান জাতিগুলির উদ্ভব এবং সর্বোপরি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর বিরাট টেকনিকাল অগ্রগতি, এসব কিছুই লক্ষ্য করা হত না। এইভাবে ইতিহাসের বিরাট অন্তর্সম্পর্ক প্রসঙ্গে একটা যুক্তিসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি অসম্ভব হয়েছিল এবং ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল বড়ো জোর যেন দার্শনিকদের কাজে লাগবার মতো দৃষ্টান্ত ও উদাহরণের সংকলন।

পঞ্চাশের দশকের জার্মানিতে যে বিকৃতিকারকেরা বস্তুবাদ-ফেরিওয়ালাদের ভূমিকা নিতেন, তাঁরা তাঁদের গুরুদেবদের এই সংকীর্ণতা কোনমতেই উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। ইতিমধ্যে প্রকৃতিবিজ্ঞানের যা-কিছু অগ্রগতি হয়েছিল সেগুলি তাঁদের কাজে লাগত কেবল জগৎস্রষ্টার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নতুন প্রমাণ হিশেবে। বস্তুত, মতবাদটিকে উন্নততর করার কাজে তাঁদের কোনই আগ্রহ ছিল না। যদিও ভাববাদের ক্ষমতা শেষ সীমায় পেঁাছেছিল এবং ১৮৪৮-এর বিপ্লব তার উপর মৃত্যুবাণ হানল, তবুও তার এটুকু সান্ত্বনা ছিল যে, বস্তুবাদের পতন ঘটেছে তখন আরো নিচে। এধরনের বস্তুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ফয়েরবাখ নিঃসন্দেহেই ঠিক কাজ করেছিলেন; তবে এই ভ্রাম্যমাণ প্রচারকদের মতবাদকে সাধারণভাবে বস্তুবাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা তাঁর পক্ষে উচিত হয় নি।

এখানে কিন্তু দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, ফয়েরবাখের জীবদ্দশাতে প্রকৃতিবিজ্ঞানে প্রচণ্ড আলোড়নের অবস্থা চলেছে, মাত্র গত পনেরো বছরেই তা একটা বোধবিধায়ক, আপেক্ষিক উপসংহারে উপনীত হয়েছে। তখন আগের তুলনায় অভাবনীয় পরিমাণ নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে; কিন্তু সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং তারই সাহায্যে একের পর এক ঘটে চলা আবিষ্কারগুলির বিশৃঙ্খলায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা কেবলমাত্র সাম্প্রতিক কালেই সম্ভব হয়েছে। একথা সত্য যে, ফয়েরবাখের জীবদ্দশাতেই তিনটি চূড়ান্ত আবিষ্কার ঘটেছিল — জীবকোষ, শক্তির রূপান্তর এবং ডারউইনের নামাঙ্কিত বিবর্তনের তত্ত্ব আবিষ্কার। কিন্তু তখন পর্যন্ত স্বয়ং প্রকৃতিবিজ্ঞানীরাই যেসব আবিষ্কার নিয়ে হয় বিতর্ক করছেন, নয় তার পর্যাপ্ত ব্যবহার কীভাবে হতে পারে তা বুঝতে পারছেন না, সেসব আবিষ্কারের পূর্ণমূল্য উপলব্ধি করতে হলে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি যে পরিমাণ অনুসরণ করতে হয় তা গ্রামাঞ্চলের নির্জনে নিঃসঙ্গ দার্শনিকটির পক্ষে কীভাবে সম্ভব হতে পারে? জার্মানির দুরবস্থাই এর জন্য দায়ী; তারই ফলে একলেকটিক ঊর্ণাজাল বিস্তারকারীরাই দর্শন-অধ্যাপনার প্রধান পদগুলি দখল করে রেখেছিলেন, অথচ তাঁদের চেয়ে ঢের বড়ো হলেও

ফয়েরবাখকে একটি ছোট্ট পল্লীতে বসে গ্রাম্য ও নীরস হয়ে উঠতে হয়েছিল। অতএব, এখন প্রকৃতি বিষয়ে যে ঐতিহাসিক বোধ সম্ভব হয়েছে এবং যার সাহায্যে ফরাসী বস্তুবাদের সমস্ত একপেশেমি দূর করা যায়, তা যে ফয়েরবাখের পক্ষে অনধিগম্য ছিল সেটা তাঁর দোষ নয়।

দ্বিতীয়ত, ফয়েরবাখ সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই বলেছেন যে, নিছক প্রকৃতিবিজ্ঞানমূলক বস্তুবাদই 'মানবিক জ্ঞানরূপী ইমারতটি নয়, সে ইমারতের ভিত্তিমাত্র', কেননা, আমাদের জীবন চলে শুধুমাত্র প্রকৃতিতেই নয়, মানব-সমাজেও, এবং প্রকৃতির মতো তারও বিকাশের ইতিহাস আছে, বিজ্ঞান আছে। অতএব প্রশ্ন ছিল সমাজের বিজ্ঞানের সঙ্গে, অর্থাৎ তথাকথিত ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বিজ্ঞানগুলির যোগফলের সঙ্গে বস্তুবাদী ভিত্তির সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এই ভিত্তির উপর এই বিজ্ঞানের পুনর্গঠন করা। কিন্তু ফয়েরবাখের পক্ষে এই কাজ সম্পাদনের ভাগ্য হয় নি। এই 'ভিত্তিটি' সত্ত্বেও তিনি সাবেকী ভাববাদের বন্ধনে আবদ্ধ রইলেন, যে কথা তিনি এই বলে স্বীকার করেছেন যে, 'বস্তুবাদীদের সঙ্গে পেছনের দিকে আমি সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু সামনের দিকে নয়।' কিন্তু এ ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে স্বয়ং ফয়েরবাখই 'সামনের দিকে' অগ্রসর হন নি, ১৮৪০ বা ১৮৪৪-এ তাঁর যে মতবাদ ছিল তা ছাড়িয়ে এগোন নি। এবং এরও কারণ আবার প্রধানতই তাঁর নিঃসঙ্গ জীবন, যার ফলে সামাজিক মেলামেশার ব্যাপারে দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে আগ্রহশীল হয়েও তিনি বাধ্য হয়েছিলেন অন্যান্য সমতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রতিবাদী আদানপ্রদানের বদলে শুধুমাত্র নিজের নিঃসঙ্গ মাথা থেকেই চিন্তা উৎপাদন করতে। আমরা পরে বিশদে দেখব, এই ক্ষেত্রে তিনি কতখানি ভাববাদী হয়ে থেকেছেন।

এখানে শুধু আরো এটুকু বলা দরকার যে, স্টার্কে ভুল জায়গায় ফয়েরবাখের ভাববাদ অনুসন্ধান করেছেন।

'ফয়েরবাখ ভাববাদী; তিনি মানব অগ্রগতিতে বিশ্বাসী' (পৃঃ ১৯)। 'সমগ্রের ভিত্তিটি, বনিয়াদটি তবুও ভাববাদী রয়ে গেছে। আমাদের কাছে বাস্তববাদ (realism) বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ মাত্র, আসলে আমরা আমাদের ভাববাদী ধারাই অনুসরণ করে যাই। করুণা, প্রেম, সত্যোৎসাহ এবং ন্যায়ানুসরণ কি ভাববাদী শক্তি নয়?' (পৃঃ VIII)।

প্রথমত, এখানে ভাববাদের অর্থ আদর্শ লক্ষ্যপ্রবণতা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সেগুলি বড়ো জোর কাণ্টীয় ভাববাদ ও তাঁর 'পরম নির্দেশের' (categorical imperative) পক্ষে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু স্বয়ং কাণ্ট তাঁর দর্শনকে 'তুরীয় ভাববাদ' আখ্যা দিয়েছিলেন — তার কারণ মোটেই এই নয় যে, তিনি এ দর্শনে নৈতিক আদর্শেরও আলোচনা করেছেন। স্টার্কে-র নিশ্চয়ই মনে পড়বে, তার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। নৈতিক অর্থাৎ সামাজিক আদর্শে বিশ্বাস হল দার্শনিক ভাববাদের সারমর্ম, এই কুসংস্কারের উৎস দর্শনের বাইরে, জার্মান কূপমন্ডূকদের মধ্যে, যাঁরা কিনা তাঁদের প্রয়োজনীয় দার্শনিক জ্ঞান মুখস্থ করে রেখেছেন শিলারের পদ্য থেকে। কাণ্টের অক্ষম 'পরম নির্দেশকে' (অক্ষম কেননা তার দাবিটা অসম্ভব এবং অসম্ভব বলেই তা কখনো একটুও বাস্তব হয় না) পরিপূর্ণ ভাববাদী হেগেলের চেয়ে বেশি কঠোর সমালোচনা আর কেউ করেন নি, অবাস্তব আদর্শ নিয়ে কূপমন্ডূকসুলভ ভাবালু যে উৎসাহ শিলার মারফত পরিবেশিত হয়েছে, তাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে উপহাস আর কেউ করেন নি (দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'Phenomenology' দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়ত, একথা অস্বীকার করবার কোনই উপায় নেই যে, মানুষকে যা কর্মে চালিত করে তা সবই আসে তার মস্তিষ্কের মাধ্যমেই, আহার ও পানের ক্ষেত্রেও, যেটা শুরু হয় মস্তিষ্কের মাধ্যমে সঞ্চারিত ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধের ফল হিশেবে এবং শেষ হয় একইভাবে মস্তিষ্কের মাধ্যমে সঞ্চারিত তৃপ্তি বোধের ফল হিশেবে। মানুষের উপর বহির্জগতের প্রভাব অভিব্যক্ত হয় তার মস্তিষ্কেই; অনুভূতি, চিন্তা, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা রূপে সেখানে প্রতিফলিত হয়, সংক্ষেপে, প্রতিফলিত হয় 'আদর্শ প্রবণতার' রূপে, এবং এই রূপেই তা 'আদর্শ শক্তিতে' পরিণত হয়। অতএব, কেউ 'আদর্শ প্রবণতার' অনুগামী বলেই এবং 'আদর্শ শক্তি' তার উপর প্রভাবশীল, একথা স্বীকার করলেই যদি সে ভাববাদী বলে প্রতিপন্ন হয়, তাহলে যে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তিই তো জন্ম-ভাববাদী হবেন এবং সে ক্ষেত্রে আদৌ কোন বস্তুবাদী কি সম্ভব হতে পারে?

তৃতীয়ত, মানবতা — অন্তত বর্তমানে — মোটের উপর প্রগতির অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, এই বিশ্বাসের সঙ্গে বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের সংঘর্ষের

কোন সম্পর্ক নেই। ডীইস্ট (১১২) ভল্টেয়র এবং র‍ুসোর মতো ফরাসী বস্তুবাদীরাও সমানে এই বিশ্বাস পোষণ করতেন প্রায় একটা উগ্রান্ধ মাত্রায় এবং সেজন্য অনেক সময়েই ব্যক্তিগতভাবে মহান স্বার্থত্যাগও করেছেন। যেমন, যদি কেউ ভাল অর্থে 'সত্যোৎসাহ ও ন্যায়ানুসরণে' সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে থাকেন তাহলে তিনি দিদরোই। অতএব, স্টার্কে যদি এ সমস্তকেই ভাববাদ বলে ঘোষণা করেন তাহলে শুধু প্রমাণ হবে যে, 'বস্তুবাদ' শব্দটি এবং উভয় চিন্তাধারার মধ্যে গোটা বিরোধটির এখানে সমস্ত তাৎপর্য তাঁর কাছে লুপ্ত হয়ে গেছে।

আসল কথা হল 'বস্তুবাদ' শব্দটির বিরুদ্ধে পুরোহিতদের সুদীর্ঘকালব্যাপী কটূক্তির ফলে এর বিরুদ্ধে যে সাবেকী ফিলিস্টাইন সংস্কার সৃষ্টি হয়েছে, স্টার্কে এখানে — যদিও হয়ত অচেতনভাবেই — সেই সংস্কারের প্রতি মার্জনাহীন আনুকূল্য প্রকাশ করেছেন। বস্তুবাদ শব্দটা বলতে ফিলিস্টাইন বোঝে ভোজনবিলাস, মাতলামি, অহমিকা, দেহকাম, ঔদ্ধত্য, লোভ, কৃপণতা, লালসা, মুনাফা শিকার এবং ফাটকাবাজি জোচ্চুরি, সংক্ষেপে, সেই সমস্ত নোংরা কদভ্যাস যা সে নিজে আচরণ করে গোপনে। ভাববাদ বলতে সে বোঝে সদাচার, সমস্ত মানব-সমাজের প্রতি প্রেম এবং সাধারণভাবে এক 'উন্নততর পৃথিবীতে' বিশ্বাস, যা নিয়ে সে অপরের কাছে বড়াই করে বটে, কিন্তু নিজে তাতে বিশ্বাস রাখে বড়ো জোর তখন, যখন অত্যধিক মদ্যপানের পর সকালে মাথা ধরেছে অথবা দেউলে হতে হয়েছে—এককথায়, তার নিত্য 'বস্তুবাদী' আতিশয্যের ফল ভোগ হবার পর। সেই সময়েই সে তার প্রিয় গানটি ধরে: মানুষ কে? অর্ধ-পশু, অর্ধ-দেবশিশু।

এটুকু ছাড়া আর যা আছে তাতে আজ জার্মানিতে যেসব প্রগল্ভ উপ-অধ্যাপকেরা দার্শনিক নামে খ্যাত তাঁদের আক্রমণ ও মতবাদের বিরুদ্ধে ফয়েরবাখকে সমর্থন করবার উদ্দেশ্যে স্টার্কে বিশেষ আয়াস করেছেন। চিরায়ত জার্মান দর্শনের গর্ভস্রাবে যাঁদের উৎসাহ আছে তাঁদের কাছে এসব অবশ্যই মূল্যবান; স্টার্কে-র কাছে হয়ত এসব প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। আমরা কিন্তু পাঠকদের এ থেকে নিষ্কৃতি দেব।

৩

ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ে ফয়েরবাখের দর্শন দেখলেই তাঁর আসল ভাববাদটি স্পষ্ট ধরা পড়ে। তিনি কোনো মতেই ধর্মের উচ্ছেদ চান না; তিনি ধর্মকে উন্নত করতে চান। ধর্মের মধ্যে দর্শনকেই বিলীন হতে হবে।

'মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগকে শুধুমাত্র ধর্মের পরিবর্তন দিয়েই পৃথক করতে হবে। মূল যখন থাকে মানবহৃদয়ে, শুধুমাত্র তখনই কোনো ঐতিহাসিক আন্দোলন গভীর ভিত্তি পায়। হৃদয় ধর্মের একটা আধার নয়, যাতে ধর্ম হৃদয়ের মধ্যেও থাকবে; হৃদয়ই ধর্মের সারার্থ।' (পৃঃ ১৬৮-এ স্টার্কে উদ্ধৃত করেছেন।)

ফয়েরবাখের মতে, মানুষে-মানুষে প্রীতিমূলক সম্পর্কই, হৃদয়ভিত্তিক সম্পর্কই হল ধর্ম; এতদিন পর্যন্ত এ সম্পর্ক বাস্তবের এক কাল্পনিক প্রতিবিম্বের মধ্যেই, মানবগুণের কাল্পনিক প্রতিবিম্বস্বরূপ এক বা বহু দেবতার মাধ্যমে তার সত্য অন্বেষণ করেছে; কিন্তু এখন প্রত্যক্ষভাবে এবং অপর কিছুর মাধ্যম ছাড়াই 'আমি' এবং 'তুমি'র মধ্যে প্রেমেই সে সত্য খুঁজে পেয়েছে। অতএব, শেষ পর্যন্ত ফয়েরবাখের কাছে এই নতুন ধর্মের সর্বোচ্চ যদিই বা না হয় তাহলেও অন্তত একটি উচ্চতম রূপ হল যৌনপ্রেম।

যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষ আছে ততদিন পর্যন্ত মানুষে-মানুষে প্রীতির, বিশেষত স্ত্রী-পুরুষে প্রীতির সম্পর্ক বর্তমান। বিশেষত যৌনপ্রেমের গত আটশ' বছরের মধ্যে যে বিকাশ ঘটেছে ও যে স্থানে তা পৌঁছেছে তার ফলে এই যুগটায় সে প্রেম সমস্ত কাব্যের অনিবার্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে প্রবর্তিত ধর্মাবলি (positive religions) রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত-যৌনপ্রেমের অর্থাৎ বিবাহ বিধির উপর একটা উচ্চতর পবিত্রতা অর্পণ করার কাজেই সীমাবদ্ধ; এবং প্রেম ও বন্ধুত্বের আচরণে এতটুকু বদল না ঘটিয়েই আগামীকালই এসব বিলুপ্ত হতে পারে। যেমন, ১৭৯৩-১৭৯৮ সালে ফ্রান্সে খ্রীষ্টধর্ম কার্যত এমন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছিল যে, এমনকি নেপোলিয়নও বিনা বাধাবিঘ্নে তা পুনঃপ্রচলিত করতে পারেন নি। অথচ তার জন্য এই মধ্যবর্তী সময়টুকুতে ফয়েরবাখের অর্থে কোন বদলির প্রয়োজন অনুভূত হয় নি।

এখানে ফয়েরবাখের ভাববাদটা হল এই যে, যৌনপ্রেম, বন্ধুত্ব, করুণা, আত্মত্যাগ, প্রভৃতি পারস্পরিক আকর্ষণের উপর নির্ভরশীল সম্পর্কগুলিকে মাত্র তাদের যথার্থ সত্তায়, অর্থাৎ এমনকি তাঁর মতে পর্যন্ত যা কিনা অতীতের ব্যাপার, সেই ধর্মের স্মৃতির সঙ্গে সম্বন্ধহীনভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না। তিনি দাবি করেন যে, শুধুমাত্র 'ধর্মের' নামে পবিত্রীকৃত হলেই এই সম্পর্কগুলির পূর্ণমূল্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর কাছে প্রধান কথা এই নয় যে, এই একান্ত মানবীয় সম্পর্কাবলির অস্তিত্ব আছে; তার বদলে বড়ো কথা হল এগুলিকে নতুন ও প্রকৃত ধর্ম বলে বিবেচনা করতে হবে। ধর্মের একটা ছাপ মারবার পরই তিনি এগুলির মূল্য স্বীকার করবেন। রিলিজিয়ন (ধর্ম) শব্দটি এসেছে religare ক্রিয়া থেকে এবং তার আদি-অর্থ হল বন্ধন। অতএব দুটি মানুষের মধ্যে যে কোনো বন্ধনই হল ধর্ম। এ জাতীয় ব্যুৎপত্তিগত কায়দাই ভাববাদী দর্শনের শেষ সম্বল। কথাটার আসল প্রয়োগের ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে কী বোঝাচ্ছে সেটা নয়, ব্যুৎপত্তির দিক থেকে শব্দটির পক্ষে কী বোঝানো উচিত এটাই যেন আসল কথা। অতএব যৌনপ্রেম ও নরনারীর মিলনকেই ধর্মের স্তরে উন্নীত করা হোক যাতে ভাববাদী স্মৃতির পক্ষে অমন প্রিয় একটা শব্দ — ধর্ম — ভাষা থেকে মুছে না যায়। চল্লিশের দশকে প্যারিসের লুই ব্লাঁ ধারার সংস্কারকেরা ঠিক একইভাবে কথা বলতেন। ধর্ম ছাড়া মানুষ বলতে তাঁরাও নেহাতই দানব বুঝতেন এবং আমাদের বলতেন: Donc, l'athéisme c'est votre religion!* ফয়েরবাখ যদি প্রকৃতির মূলত বস্তুবাদী ধারণার উপর প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চান, তবে সেটা হবে আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানকে খাঁটি এ্যালকেমি বলে বিবেচনা করারই সমান। ঈশ্বর ছাড়াও যদি ধর্ম সম্ভব হয় তাহলে পরশপাথর বাদ দিয়েও এ্যালকেমি হতে পারে। প্রসঙ্গত, ধর্ম এবং এ্যালকেমির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পরশপাথরের নানা ঐশী শক্তি আছে এবং কপ্প ও বের্তেলো-র তথ্যে প্রমাণ হয়েছে, খ্রীষ্টীয় মতবাদ গড়ে তোলায় প্রথম দুই শতাব্দীর মিশরীয়-গ্রীক এ্যালকেমিস্টদের হাত ছিল।

---

* তার মানে, নাস্তিকতাই আপনাদের ধর্ম। — সম্পাঃ

'মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগকে শুধু ধর্মের পরিবর্তন দিয়েই পৃথক করতে হবে' —ফয়েরবাখের এই দাবি একান্তই ভ্রান্ত। আজ পর্যন্ত যে তিনটি বিশ্ব ধর্ম বর্তমান আছে, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলামধর্ম, শুধু সেই তিনটির বেলায় বলা যায়, ধর্মমূলক পরিবর্তন বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তনের **সহচর ছিল।** প্রাচীন উপজাতীয় ও জাতীয় ধর্ম — যেগুলির স্বতঃস্ফূর্ত উদয় হয়েছিল — সেগুলির চরিত্র প্রচারমূলক ছিল না এবং সেই সব উপজাতি ও জনগণের স্বাধীনতা লোপ পাওয়া মাত্র সেগুলি প্রতিরোধের সমস্ত শক্তি হারাল। ক্ষয়িষ্ণু রোমক সাম্রাজ্য ও সেখানে সদ্য গৃহীত, তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ খ্রীষ্টীয় বিশ্ব ধর্মের সঙ্গে সহজ সংযোগই জার্মানদের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল। কমবেশি কৃত্রিমভাবে উত্থিত শুধু এই বিশ্ব ধর্মগুলির ক্ষেত্রেই, বিশেষত খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামধর্মের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, ব্যাপকতর ঐতিহাসিক আন্দোলনের উপর ধর্মের ছাপ পড়েছে। এমনকি খ্রীষ্টধর্মের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, প্রকৃতই বিশ্ব তাৎপর্যের বিপ্লবের ক্ষেত্রে ধর্মের ছাপটুকু ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বুর্জোয়ার মুক্তি সংগ্রামের শুধুমাত্র প্রথমাবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ; এবং তার প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় পূর্বেকার সমগ্র মধ্যযুগীয় ইতিহাসের মধ্যে, যেখানে কিনা ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব ছাড়া আর কোনো ধরনের ভাবাদর্শ ছিল না, ফয়েরবাখ যে মনে করেছিলেন, এর কারণ মানুষের হৃদয় ও ধর্মমূলক প্রয়োজনের মধ্যে, তা নয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুর্জোয়াও যখন আপন শ্রেণীসঙ্গত ভাবাদর্শ গড়ে তোলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হল তখন সে নিজের মহান ও চূড়ান্ত বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব সম্পন্ন করল শুধু আইনগত ও রাজনৈতিক ধারণার কাছেই আবেদন জানিয়ে, ধর্ম নিয়ে তখন তার শুধু ততটুকুই মাথাব্যথা যতটুকু কিনা এই ধর্ম তার পথে বাধা হয়েছে। কিন্তু একথা সে কখনো ভাবে নি যে, পুরনো ধর্মের স্থানে একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তন করতে হবে। এধরনের প্রচেষ্টায় রবেস্‌পিয়ের (১১৩) কীভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন তা সকলের জানা আছে।

যে সমাজে আমাদের বাস করতে হচ্ছে, যে সমাজ শ্রেণী-সংঘর্ষ ও শ্রেণী-শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের

ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মানবীয় ভাবাবেগের সম্ভাবনা আজকাল বহুলাংশেই হ্রাস পেয়েছে। এই ভাবাবেগগুলিকে ধর্ম হিশেবে গৌরবান্বিত করে আরো হ্রস্ব করার আমাদের কারণ নেই। একইভাবে, বিশেষত জার্মানিতে প্রচলিত ইতিহাসতত্ত্ব বিরাট ঐতিহাসিক শ্রেণী-সংগ্রামকে যথেষ্ট অস্পষ্ট করেছে; অতএব, এইসব সংগ্রামের ইতিহাসকে গির্জা-ইতিহাসের লেজুড়ে পরিণত করে ঐ ইতিহাসবোধকে একেবারে অসম্ভব করে তোলার প্রয়োজনও আমাদের নেই। এ থেকেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, আজ আমরা ফয়েরবাখকে ছাড়িয়ে কতখানি অগ্রসর হয়েছি। তাঁর প্রেমমূলক নবধর্মের গৌরব-কীর্তনে নিবেদিত 'সর্বশ্রেষ্ঠ' রচনাংশও আজ একেবারে অপাঠ্য।

একমাত্র যে ধর্মকে ফয়েরবাখ গুরুত্বসহকারে বিচার করেছেন তা হল খ্রীষ্টধর্ম, একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্যের বিশ্ব ধর্ম। তিনি প্রমাণ করেছেন, খ্রীষ্টীয় ঈশ্বর হল মানুষের অতিকল্পিত প্রতিবিম্ব, মুকুর-চিত্র। এখন এই ঈশ্বর কিন্তু স্বয়ং হলেন এক ক্লান্তিকর অমূর্তায়ন পদ্ধতির পরিণাম, অসংখ্য পুরাতন উপজাতীয় ও জাতীয় দেবতাদের ঘনীভূত সারনির্যাস। অতএব, এই ঈশ্বর যে মানুষের প্রতিবিম্ব সেই মানুষও বাস্তব মানুষ নয়, তাও একইভাবে অসংখ্য বাস্তব মানুষের সারনির্যাস, অমূর্ত অর্থে মানুষ, অতএব নিজেও সে এক ভাবমূর্তি মাত্র। যে ফয়েরবাখ প্রতি পৃষ্ঠায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, প্রত্যক্ষ বাস্তব জগতে বিভোরতার প্রচার করেন, তিনি নিজেই মানুষে-মানুষে মাত্র যৌন-সম্পর্কটুকু ছাড়া বাকি যে কোনো সম্পর্কের কথাই তুলুন না কেন, সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণই অমূর্তপন্থী হয়ে যান।

সমস্ত সম্পর্কের মাত্র একটি দিকই তাঁকে আকৃষ্ট করে, তা হল নৈতিক দিক। এবং এইদিক থেকেও হেগেলের তুলনায় আমরা ফয়েরবাখের আশ্চর্য দৈন্য দেখে স্তম্ভিত হই। হেগেলের নীতিশাস্ত্র বা নৈতিক আচরণের মতবাদ হল অধিকার-দর্শন (philosophy of right) এবং তার অন্তর্গত হল: ১) বিমূর্ত অধিকার, ২) নৈতিকতা, ৩) সুনীতি (Sittlichkeit); আবার এই শেষটির অন্তর্গত হল: পরিবার, নাগরিক সমাজ এবং রাষ্ট্র। এখানে আধারটি যেমন ভাববাদী, আধেয়টি তেমনিই বাস্তববাদী। নৈতিকতা ছাড়াও আইন, অর্থনীতি ও রাজনীতির সমগ্র ক্ষেত্র এর অন্তর্গত। ফয়েরবাখের বেলায় ঠিক এর

বিপরীত। আধারের দিক থেকে তিনি বাস্তববাদী, শুরু করছেন মানুষ থেকে, কিন্তু এ মানুষের বাস কোন্ জগতে তাঁর কোনো উল্লেখ নেই, সুতরাং এ মানুষ সর্বদাই সেই বিমূর্ত মানুষই থেকে যাচ্ছে, যে আধিপত্য করেছে ধর্মের দর্শনে। এ মানুষকে কোন নারী জন্ম দেয় নি; যেন গুটি ভেঙে এ মানুষ বেরিয়ে এসেছে একেশ্বরবাদী ধর্মের ঈশ্বর থেকে। তাই সে ঐতিহাসিকভাবে উৎপন্ন এবং ইতিহাস নির্ধারিত কোনো বাস্তব জগতের বাসিন্দা নয়। অবশ্য অন্য মানুষের সঙ্গে তার আদানপ্রদান আছে সত্য, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেও আবার তারই মতন অমূর্ত মানুষ। ফয়েরবাখের ধর্ম সংক্রান্ত দর্শনে আমরা তবু নর ও নারী পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর নীতিশাস্ত্র থেকে এই শেষ পার্থক্যটুকুও মুছে গিয়েছে। অবশ্যই ফয়েরবাখ সুদীর্ঘ ব্যবধানের পর পর এ জাতীয় কথাও বলেছেন যে,

'প্রাসাদে ও কুটীরে মানুষের চিন্তা বিভিন্ন।' — 'ক্ষুধা ও ক্লেশের ফলে যদি তোমার দেহে খোরাক কিছু না থাকে, তাহলে তোমার মস্তিষ্ক, মানস ও হৃদয়েও নৈতিকতার জন্যও কোনো খোরাক থাকবে না।' — 'রাজনীতিই আমাদের ধর্ম হওয়া উচিত।' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু এ জাতীয় বচনের সাহায্যে ফয়েরবাখ একেবারে কিছুই লাভ করতে পারেন নি, এগুলি নেহাতই বাক্য হয়ে থেকে যায় এবং এমনকি স্টার্কেকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, ফয়েরবাখের কাছে রাজনীতি ছিল অলংঘনীয় সীমান্ত এবং

'সমাজ সংক্রান্ত বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, তাঁর কাছে ছিল terra incognita (না-জানা ভূমি)।'

হেগেলের তুলনায় সু-কু বিচারেও তিনি সমান অগভীর বলে প্রতীয়মান হন।

হেগেল বলেছেন, 'লোকের বিশ্বাস, মানুষ স্বভাবতই ভাল, একথা বললে বুঝি একটা মস্ত কিছু বলা হয়। কিন্তু লোকে ভুলে যায়, এর চেয়ে ঢের কথা হল, মানুষ স্বভাবতই মন্দ।'

হেগেলের মতে, ঐতিহাসিক বিকাশের চালিকা-শক্তি যে রূপে দেখা দেয় সেটা মন্দ। একথার দুটি অর্থ আছে। একদিকে বুঝতে হবে, প্রতিটি

নতুন অগ্রগতি প্রতিভাত হয় পবিত্রের অপবিত্রকরণ হিশেবেই, যে অবস্থা পুরনো এবং পচা হলেও লোক-ব্যবহার দ্বারা পবিত্রীকৃত তার বিরুদ্ধে বিপ্লব হিশেবে। এবং অপরপক্ষে, শ্রেণী-সংঘর্ষ শুরু হবার পর থেকে মানুষের কু-প্রবৃত্তিগুলিই — লোভ ও ক্ষমতা-লালসা ঐতিহাসিক বিকাশের হাতল হিশেবে কাজ করেছে। সামন্ততন্ত্র এবং বুর্জোয়ার ইতিহাস তার একক একটানা প্রমাণ। কিন্তু নৈতিক কু'য়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা অনুসন্ধান করার কথা ফয়েরবাখের মাথায় আসে নি। তাঁর কাছে ইতিহাস একেবারে এক ভুতুড়ে রাজ্য, যেখানে তিনি অস্বস্তি ভোগ করেন।

'মানুষ যখন প্রকৃতিতে প্রথম উদ্ভূত হল তখন সে নেহাতই প্রকৃতির জীব, মানুষ নয়; মানুষ হল মানুষেরই সৃষ্টি, সংস্কৃতির সৃষ্টি, ইতিহাসের সৃষ্টি' —

এমনকি তাঁর নিজের এই বাণীও তাঁর কাছে রয়ে গেল সম্পূর্ণ বন্ধ্যা।

অতএব, নীতির ব্যাপারে ফয়েরবাখ আমাদের যাকিছু বলেছেন তা নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। সুখানুসন্ধান মানুষের মধ্যে সহজাত, অতএব সমস্ত নৈতিকতার তা ভিত্তি হতে বাধ্য। কিন্তু এই সুখানুসন্ধান দ্বিবিধ সংশোধনসাপেক্ষ। প্রথমত, আমাদের কাজের স্বাভাবিক পরিণাম দ্বারা: পানাধিক্যের পর মাথা ধরে এবং ক্রমাগত বাড়াবাড়ির পর রোগ হয়। দ্বিতীয়ত, তার সামাজিক পরিণাম দ্বারা: আমরা যদি অপরের সমজাতীয় সুখাকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা না দিই তাহলে তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে, এবং অতএব আমাদের সুখাকাঙ্ক্ষার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। ফলে, আমাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে হলে আমাদের আচরণের পরিণাম ঠিকমতো বিচার করতে পারা চাই এবং অপরকেও সমানভাবেই সুখাকাঙ্ক্ষার অধিকার দিতে আমরা বাধ্য। নিজেদের সম্বন্ধে যুক্তিসিদ্ধ আত্মসংযম এবং অপরের প্রতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রেম — বারবার এই প্রেম! — ফয়েরবাখের নৈতিকতার এই দুটিই হল মৌলিক নিয়ম; অন্যান্য সমস্ত নিয়মই এ দুটির অনুসিদ্ধান্ত। এবং এ কয়েকটি কথার শূন্যতা ও স্থূলতা ফয়েরবাখের চতুরতম যুক্তি বা স্টার্কের সবচেয়ে জোরালো স্তুতিও ঢাকা দিতে পারে না।

শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকে মানুষ তার সুখাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে পারে নেহাতই ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে, এবং তাতে লাভ না তার, না

অপরের। বরং তার দরকার বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক, তার প্রয়োজন মেটাবার উপায়গুলি, অর্থাৎ খাদ্য, বিরুদ্ধ লিঙ্গের ব্যক্তি, বই, আলাপ তর্কবিতর্ক, কাজকর্ম এবং ব্যবহার করা ও বানিয়ে তোলার মতো বস্তু। ফয়েরবাখের নৈতিকতায় হয় ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, চরিতার্থতার এই উপকরণ এবং বস্তুগুলি প্রত্যেকেরই নিঃসন্দেহেই আছে, আর না হয় এতে এক অকেজো সদুপদেশই দেওয়া হচ্ছে মাত্র, অতএব যারা এই উপকরণগুলি থেকে বঞ্চিত তাদের কাছে এর কানাকড়িও মূল্য নেই। আর সেকথা ফয়েরবাখ নিজেই স্পষ্টভাবে বলেছেন:

'প্রাসাদে ও কুটীরে মানুষের চিন্তা বিভিন্ন।' — 'ক্ষুধা ও ক্লেশের ফলে যদি তোমার দেহে খোরাক কিছু না থাকে, তাহলে তোমার মস্তিষ্ক, মানস ও হৃদয়েও নৈতিকতার জন্যও কোনো খোরাক থাকবে না।'

অপরের সুখাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার সমান অধিকার প্রসঙ্গেও কি ব্যাপারটা বেশি ভাল দাঁড়ায়? দাবিটাকে ফয়েরবাখ এক পরম দাবি হিশেবে পেশ করেছেন, যা সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। কিন্তু কবে থেকে এ দাবি স্বীকৃত হয়েছে? প্রাচীনকালে দাস ও প্রভুর মধ্যে, কিংবা মধ্য যুগে ভূমিদাস ও ব্যারনের মধ্যে কোনকালেই কি সুখাকাঙ্ক্ষায় সমান অধিকারের কোন কথা ছিল? শাসক শ্রেণীর সুখাকাঙ্ক্ষার কাছে নিপীড়িত শ্রেণীর এই আকাঙ্ক্ষা কি নির্মমভাবে এবং 'আইন-বলে' বলি দেওয়া হয় নি? — হ্যাঁ, সেটা অবশ্য দুর্নীতিই ছিল; কিন্তু আজকাল সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। — যখন থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামে ও পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশের খাতিরে সামাজিক বর্গের সমস্ত বিশেষ অধিকার অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকার বিলোপ করতে এবং আইনের সামনে, প্রথমত ব্যক্তিগত আইন এবং তারপর ক্রমশ রাষ্ট্রীয় আইনের সামনে সকলের সাম্য প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে, তখন থেকে নেহাতই কথার কথা হিশেবে ঐ সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এই ভাবাদর্শগত অধিকারকে অবলম্বন করে সুখাকাঙ্ক্ষা বাঁচতে পারে খুবই কম। বৈষয়িক উপকরণ অবলম্বন করলেই সে বাঁচে সবচেয়ে বেশি; এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে সযত্নে এই ব্যবস্থাই করা হয়, যাতে এই সমানাধিকারীদের মধ্যে

বিপুল সংখ্যাগুরুর দল নিছক বাঁচবার পক্ষে যতটুকু অপরিহার্য শুধু ততটুকুই পায়। অতএব, দাসপ্রথা বা ভূমিদাসপ্রথায় সংখ্যাগুরুর পক্ষে সুখাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার সমান অধিকার যেটুকু ছিল, পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থায় তার চেয়ে আদৌ বেশি হলে তা নেহাত যৎসামান্য বেশি মাত্র। আর, মানসিক সুখের উপায়ের, অর্থাৎ শিক্ষার সুযোগের দিক থেকেই কি আমাদের অবস্থা বিশেষ ভাল? এমনকি 'সাদোভার স্কুল মাস্টার'ও (১১৪) কি একান্তই এক কল্পিত ব্যক্তি নয়?

আরো কথা আছে। ফয়েরবাখের নীতিশাস্ত্র অনুসারে নৈতিক চরিত্রের শ্রেষ্ঠ মন্দির হল ফাটকাবাজার, কেবল অবশ্য ঠিকমতো ফাটকাবাজি করা চাই। আমার সুখাকাঙ্ক্ষা যদি আমাকে ফাটকাবাজারের দিকে পরিচালিত করে এবং আমি যদি আমার কাজের পরিণামকে সঠিকভাবে বিচার করতে পারি যাতে শুধু প্রীতিকর ফলাফলই ঘটে, অপ্রীতিকর কিছু না হয়, অর্থাৎ আমি যদি শুধু জিতেই চলি, তাহলে সেটা ফয়েরবাখের উপদেশ পালনই হবে। তাছাড়া, এতে আমি অপর কারুর সুখাকাঙ্ক্ষা অনুসরণে হস্তক্ষেপ করছি না, কেননা আমি যেমন স্বেচ্ছায় ফাটকাবাজারে গিয়েছিলাম তেমনি স্বেচ্ছায় সেও গিয়েছিল। আমার সঙ্গে ফাটকাবাজি করে সেও তার সুখাকাঙ্ক্ষারই অনুসরণ করেছে, যেমন কিনা আমিও করেছি। তার যদি টাকা খোয়া যায় তাহলে স্বতঃই প্রমাণ হবে যে, বেহিসেবের কারণে কাজটি তার নীতিগর্হিত হয়েছিল, এবং যেহেতু আমি তাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিলাম সেইহেতু আমি এমনকি এক আধুনিক রাদামানথস-এর মতোই সগর্বে বুক চাপড়াতে পারি। প্রেম শব্দটি যদি নেহাতই ভাবালু শব্দালংকার না হয়, তাহলে বলতে হবে ফাটকাবাজারে প্রেমেরও রাজত্ব রয়েছে, কেননা সেখানে প্রত্যেকেই অপরের সাহায্যে সুখাকাঙ্ক্ষার সার্থকতা অনুসন্ধান করে। প্রেমের উদ্দেশ্যই ঠিক এই-ই এবং প্রেমের বাস্তব ক্রিয়া বলতেও তাই। সুতরাং, আমার কাজের ফলাফল সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নিয়ে আমি যদি সাফল্যের সঙ্গে জুয়া খেলতে পারি, তাহলে আমি ফয়েরবাখের নৈতিকতার কঠোরতম বিধি-নির্দেশই পালন করব, তাছাড়া বড়োলোকও হয়ে যাব। অন্য কথায়, ফয়েরবাখের নৈতিকতা ঠিক আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজেরই ছাঁচে ঢালা, ফয়েরবাখ স্বয়ং তা না চাইলেও বা কল্পনা না করলেও।

কিন্তু প্রেম! — হ্যাঁ, ফয়েরবাখের কাছে সর্বত্রই এবং সর্বকালে প্রেমই হল সেই অলৌকিক দেবতা যে বাস্তব জীবনের সমস্ত বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ করে দেয়, আবার তাও কিনা এমন এক সমাজে যা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত! এইখানে তাঁর দর্শনের শেষ বৈপ্লবিক রেশটুকুও উপে যায়, বাকি থাকে শুধু সেই পুরনো কীর্তন: পরস্পরকে ভালবেসো, স্ত্রী পুরুষ এবং পদ নির্বিচারে পরস্পরকে আলিঙ্গন করো, — মিলমিশের এক সার্বজনীন মাতলামি!

সংক্ষেপে, ফয়েরবাখের নৈতিকতার দশা তাঁর পূর্ববর্তী সকলের মতোই। তার উদ্দেশ্য হল সব যুগের, সব মানুষের এবং সব অবস্থার পক্ষে উপযোগী হওয়া এবং ঠিক এই কারণেই তা কখনো কোথাও প্রযুক্ত হতে পারে না। বাস্তব জগতের ক্ষেত্রে তা কান্টের পরম নির্দেশের মতোই অক্ষম। বাস্তবে প্রতিটি শ্রেণী, এমনকি প্রতিটি পেশার নিজস্ব নৈতিক আদর্শ আছে, এবং শাস্তির ভয় না থাকামাত্র তাও লঙ্ঘিত হয়। আর যে প্রেমে সকলকে মেলাবার কথা তার প্রকাশ ঘটে যুদ্ধ, কলহ, মামলা, গৃহবিবাদ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং এক কর্তৃক অপরকে সম্ভবপর সমস্ত শোষণে।

কিন্তু ফয়েরবাখ যে প্রবল প্রেরণা সঞ্চার করে যান, সেটা কী করে অমনভাবে তাঁর নিজের পক্ষে নিষ্ফল হল? তার সোজা কারণ, যে অমূর্তায়নের প্রতি তাঁর অমন ভয়ংকর ঘৃণা তারই এলাকা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি কখনই প্রাণবান বাস্তবে পেঁছবার পথ খুঁজে পান নি। তিনি প্রাণপণে প্রকৃতি আর মানুষকে আঁকড়ে থাকতে চান, কিন্তু তাঁর কাছে প্রকৃতি আর মানুষ শব্দমাত্রই। বাস্তব প্রকৃতি ও বাস্তব মানুষ সম্বন্ধে তিনি আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে পারেন না। ফয়েরবাখের অমূর্ত মানুষ থেকে বাস্তব জীবন্ত মানুষে পেঁছবার একমাত্র উপায় হল, তাকে ইতিহাসের অংশী হিশেবে দেখা। কিন্তু ফয়েরবাখের ঠিক এতেই আপত্তি। ফলে ১৮৪৮ সালটি, যার তাৎপর্য তিনি বুঝতে পারেন নি, তাঁর কাছে শুধু বাস্তব জগতের সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ এবং নির্জনে অবসর গ্রহণ বলেই প্রতিপন্ন হল। এ ক্ষেত্রেও ফের দোষটা প্রধানত জার্মানির তখনকার অবস্থার যা তাঁকে অমন শোচনীয়ভাবে ক্ষয়ে যেতে বাধ্য করে।

কিন্তু ফয়েরবাখ না করলেও সে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই হল।

ফয়েরবাখের নবধর্মের কেন্দ্র অমূর্ত মানবপূজার পরিবর্তে আনতে হল বাস্তব মানব ও তার ঐতিহাসিক বিকাশের বিজ্ঞান। ফয়েরবাখ ছাড়িয়ে ফয়েরবাখের দৃষ্টিকোণের এই পরবর্তী বিকাশের সূত্রপাত করেন মার্কস ১৮৪৫ সালে 'পবিত্র পরিবার' গ্রন্থে।

৪

স্ট্রাউস, বাউয়ের, স্টিরনার, ফয়েরবাখ এঁরা সকলেই যতক্ষণ না দর্শনের ক্ষেত্র ত্যাগ করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত হেগেলীয় দর্শনেরই শাখাপ্রশাখা। 'যীশুর জীবন' এবং 'আপ্তবাক্য' গ্রন্থের পর স্ট্রাউস শুধুই রেনাঁ-র কায়দায় দার্শনিক ও যাজক-ঐতিহাসিক সাহিত্য রচনায় নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। বাউয়ের কেবল খ্রীষ্টধর্মের উৎস সংক্রান্ত ইতিহাসের ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য লাভ করেছেন, যদিও এই ক্ষেত্রে তাঁর কীর্তিটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাকুনিন স্টিরনারকে প্রুধোঁর সঙ্গে মিলিয়ে এই মিশ্রণটিকে 'নৈরাজ্যবাদ' আখ্যা দিলেও স্টিরনার একটা কৌতুকাবহ বস্তু হিশেবেই রয়ে গেলেন। দার্শনিক হিশেবে তাৎপর্য ছিল একমাত্র ফয়েরবাখের। কিন্তু যে দর্শন হতে চায় সমস্ত বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে এবং তাদের সকলের যোগসূত্র হিশেবে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, — সে দর্শন তাঁর কাছে একটা পবিত্র বস্তু হিশেবেই রয়ে গেল — তাঁর সীমানা তিনি যে শুধু পার হতে পারেন নি তা নয়, দার্শনিক হিশেবেও তিনি মাঝপথে থেমে গিয়েছিলেন, নিচের দিকটায় বস্তুবাদী, উপরের দিকটায় ভাববাদী। সমালোচনার মাধ্যমে হেগেলকে প্রত্যাখ্যান করার সামর্থ্য তাঁর ছিল না; তিনি শুধুই হেগেলকে নিষ্প্রয়োজন বলে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন, যদিও হেগেলীয় দর্শনতন্ত্রের বিশ্বকোষসুলভ ঐশ্চর্যের তুলনায় তিনি নিজে এক গালভরা প্রেমধর্ম এবং এক ক্ষীণ নির্বীর্য নৈতিকতা ছাড়া সদর্থক বেশি কিছু পেশ করতে পারেন নি।

কিন্তু হেগেলীয় সম্প্রদায়ের ভাঙন থেকে আরো একটা ধারার উদ্ভব হয় এবং একমাত্র সেইটিই প্রকৃত ফলপ্রসূ হয়েছে। এই ধারাটি মূলত মার্কসের নামের সঙ্গে জড়িত।*

* এখানে আমি একটা ব্যক্তিগত জবাবদিহি করতে চাইছি। মার্কসের তত্ত্বে

এ ক্ষেত্রেও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে। তার মানে ভাববাদী উৎকেন্দ্রিকতার প্রাক্-সংস্কারবাদ থেকে মুক্ত হয়ে দেখলে বাস্তব জগৎ — অর্থাৎ প্রকৃতি ও ইতিহাস — যেভাবে প্রতীত হয় তাকে সেইভাবেই জানবার জন্য এ ধারা কৃতসংকল্প। স্থির করা হল, কাল্পনিক অন্তঃসম্পর্কে নয়, তাদের স্বকীয় অন্তঃসম্পর্কে দেখা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে যে ভাববাদী উদ্ভাবন খাপ খায় না, তাকে নির্মমভাবে পরিহার করতে হবে। বস্তুবাদ বলতে এ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। নতুন ধারায় বস্তুবাদী দর্শনকে এই প্রথম সত্যই গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হয়েছে এবং অন্তত তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে সমস্ত প্রাসঙ্গিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে সুসঙ্গতভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

হেগেলকে নিছক পাশে ঠেলে দেওয়া হল না। বরং, ইতিপূর্বে তাঁর যে বৈপ্লবিক দিকটি বর্ণিত হয়েছে, তাঁর সেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি থেকেই শুরু করা হল। কিন্তু হেগেলীয় রূপে সেটা ছিল অকেজো। হেগেলের মতে, দ্বন্দ্বতত্ত্ব হল ধারণার আত্মবিকাশ। পরম ধারণা শুধুই যে অনন্তকাল অজ্ঞাত কোথাও বর্তমান তাই নয়, অস্তিত্বশীল সমগ্র বিশ্বের প্রকৃত জীবন্ত আত্মাও

আমার অংশীদারির কথা ইদানীং বারবার উল্লেখ করা হয়েছে — কাজেই, বিষয়টার মীমাংসার জন্য এখানে কয়েকটা কথা না-বলে পারছি নে। মার্কসের সঙ্গে চল্লিশ বছরের সহযোগের আগেও এবং তার মধ্যেও এই তত্ত্বের ভিত্তিস্থাপনে এবং আরো বিশেষভাবে এর বিশদীকরণে আমার কিছুটা স্বতন্ত্র অংশ ছিল, তা আমি অস্বীকার করতে পারি নে। কিন্তু, এর প্রধান মূলনীতিগুলির অধিকাংশ, বিশেষত অর্থবিদ্যা আর ইতিহাসের ক্ষেত্রে, আর সর্বোপরি সেগুলির চূড়ান্ত প্রখর উপস্থাপনা মার্কসেরই। যা-ই হোক, অল্প কয়েকটা বিশেষ ক্ষেত্রে আমার কাজ বাদে আমার যা অবদান তা মার্কস আমাকে ছাড়াও বেশ করতে পারতেন। মার্কসের যা সাধনসাফল্য তা আমি কখনই সাধন করতে পারতাম না। আমাদের বাদবাকি আর সবার চেয়ে মার্কস দাঁড়িয়ে ছিলেন আরো উপরে, তিনি দেখতেন আরো দূর অবধি, তাঁর বিবেচনা-পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র ছিল আরো প্রশস্ত, সেটা হত আরো দ্রুত। মার্কস ছিলেন মহাপ্রতিভাধর; আমরা অন্যান্যেরা ছিলাম বড়োজোর বিশেষ কর্মদক্ষতাসম্পন্ন। তিনি না হলে এই তত্ত্ব আজ যা ততখানি হত না। কাজেই, এই তত্ত্ব তাঁর নাম বহন করছে সঙ্গত কারণেই। (এঙ্গেলসের টীকা।)

হল তাই। যে সমস্ত প্রাথমিক পর্যায়ের মাধ্যমে তার আত্মবিকাশ, 'যুক্তিতত্ত্ব' গ্রন্থে সেগুলি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এবং সেগুলি সবই সে ধারণার মধ্যেই নিহিত। তারপর প্রকৃতি রূপে পরিবর্তিত হয়ে সেই ধারণা নিজেকে 'অনন্বিত' করে; সেখানে আত্ম-চেতনাহীনভাবে, প্রাকৃতিক আবশ্যিকতার ছদ্মবেশে তার এক নববিকাশ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে পুনরায় তা আত্ম-চেতনায় প্রত্যাবর্তন করে। তারপর ইতিহাসের ক্ষেত্রে সেই আত্ম-চেতনা আবার স্থূলরূপ থেকে নিজেকে বিকশিত করতে করতে শেষ পর্যন্ত হেগেলীয় দর্শনে সেই পরম ধারণা সম্পূর্ণভাবে নিজেতে প্রত্যাবর্তন করে। অতএব, প্রকৃতি ও ইতিহাসে যে দ্বান্দ্বিক বিকাশ দেখা দেয় অর্থাৎ নিচুর থেকে উঁচুর দিকে যে অগ্রগতি সমস্ত আঁকাবাঁকা পথে ও সাময়িক পশ্চাদগতি সত্ত্বেও অব্যাহত থাকে, হেগেলের মতে সেই কার্যকারণ সম্পর্ক হল আসলে অনন্তকাল থেকে গতিশীল ধারণার শোচনীয় অনুমুদ্রণ মাত্র; কোথায় তা জানা নেই, কেবল এটুকু স্পষ্ট যে, তা কোনো চিন্তাশীল মানব মস্তিষ্ক থেকে স্বতন্ত্র। ভাবাদর্শগত এই বিকার পরিহারের প্রয়োজন ছিল। আমরা আবার বস্তুবাদীভাবে আমাদের মাথার মধ্যেকার ধারণাগুলিকে বুঝলাম, বাস্তব বস্তুকে পরম ধারণার বিকাশের কোনো পর্যায়ের প্রতিরূপ বলে না ধরে ধারণাগুলিকে বুঝলাম বাস্তব বস্তুর প্রতিরূপ হিশেবে। এইভাবে দ্বন্দ্বতত্ত্ব পরিণত হল বহির্জগৎ ও মানবচিন্তা উভয় ক্ষেত্রেই গতির সাধারণ নিয়ম সংক্রান্ত বিজ্ঞানে: দুই সারি এই নিয়মাবলির সারবস্তু অভিন্ন, কিন্তু মানব-মন যে পরিমাণে এগুলিকে সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে পারে, সেই পরিমাণে তাদের প্রকাশে পার্থক্য ঘটে; প্রকৃতিতে এবং এ পর্যন্ত মানব-ইতিহাসের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নিয়মাবলি অচেতনভাবে আপাত আকস্মিকতার এক অনন্ত পরম্পরার মধ্যে বাহ্য আবশ্যিকতা রূপে কার্যকর থাকে। এইভাবে ধারণার দ্বান্দ্বিকতাটা নিজেই পরিণত হল বাস্তব জগতের দ্বান্দ্বিক গতির সচেতন প্রতিবিম্বে এবং ফলে হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বকে উলটিয়ে দেওয়া হল, কিংবা বলা ভাল, তা যেভাবে মাথার ওপর দাঁড়িয়েছিল তা ঘুরিয়ে তাকে পায়ের উপর দাঁড় করানো হল। এবং লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব বহু বছর ধরে আমাদের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ও তীক্ষ্মতম অস্ত্রের কাজ করেছে তাকে শুধু আমরাই আবিষ্কার করেছি তাই নয়;

আমাদের, এমনকি হেগেলের অপেক্ষা না রেখেই স্বতন্ত্রভাবে তা আবিষ্কার করেছেন এক জার্মান শ্রমিক — ইয়োসেফ ডিট্স্গেন।*

যাই হোক, এইভাবে আবার পুনঃস্থাপিত করা হল হেগেলীয় দর্শনের বৈপ্লবিক দিকটি এবং সেই সঙ্গেই তার যেসব ভাববাদী ভূষণের ফলে হেগেলের পক্ষে তার সুসঙ্গত প্রয়োগ ব্যাহত হয়েছিল তা বাদ দেওয়া হল। বিশ্বকে তৈরি জিনিসের যৌগিক সমাহার না ভেবে প্রক্রিয়ার যৌগিক সমাহার বলে বিবেচনা করতে হবে, যেখানে আপাত-স্থির জিনিসগুলি তথা আমাদের মাথায় সেইগুলির মানস প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ধারণাগুলি এক অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, উদ্ভব ও বিলয়ের মধ্য দিয়ে চলেছে, যেখানে সমস্ত আপাত-আপাতন ও সাময়িক পশ্চাদগতি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এক ক্রমাগ্রসর বিকাশই জয়ী হয় -- এই মূল মহান চিন্তা বিশেষত হেগেলের সময় থেকে সাধারণের চেতনায় এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে যে, তার সাধারণ রূপটি আজ আর বড়ো একটা অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু মুখে এই মূল চিন্তা স্বীকার করা এবং বাস্তবে অনুসন্ধানের প্রতি ক্ষেত্রে খুঁটিয়ে তার প্রয়োগ করা, এ দুটি আলাদা ব্যাপার। কিন্তু যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সর্বদা অন্বেষণ অগ্রসর হয় তাহলে চরম সমাধান এবং সনাতন সত্যের দাবি চিরকালের মতো শেষ হয়; সমস্ত অর্জিত জ্ঞানের অনিবার্য সীমাটা সম্বন্ধে সবসময়েই হুঁশ থাকে, হুঁশ থাকে যে, যে-পরিস্থিতিতে জ্ঞানটি অর্জিত হয়েছে তার দ্বারাই সে জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত। অপরপক্ষে, এখনো প্রচলিত প্রাচীন অধিবিদ্যার কাছে সত্য ও মিথ্যা, ভাল ও মন্দ, অভিন্ন ও ভিন্ন, আবশ্যিক ও আপতিকের মধ্যে যে বিরোধ দুর্লঙ্ঘ্য বলে বিবেচিত হয় তার সামনে আর সশ্রদ্ধ হবার প্রয়োজন হয় না। বোঝা যায় যে, এই বিরোধগুলির নেহাতই আপেক্ষিক সত্যতা বর্তমান, এখন যা সত্য বলে স্বীকৃত তারই মধ্যে মিথ্যার দিক নিহিত আছে এবং তা ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে; ঠিক যেমন এখন যা মিথ্যা বলে বিবেচিত তার মধ্যেও সত্যের দিক নিহিত বলেই অতীতে তা সত্য বলে বিবেচিত হয়েছিল; যাকে আবশ্যিক বলা হয় তা নিছক আপতিকতা দ্বারাই

---

* 'মানব মস্তিষ্কের কাজের প্রকৃতি একজন কায়িক-শ্রমিকের বিবরণ', হাম্বুর্গ, ১৮৬৯। — সম্পাঃ

গঠিত এবং তথাকথিত আপাতিকতা হল একটা রূপ যার পিছনে লুকিয়ে আছে আবশ্যিকতা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অনুসন্ধান ও চিন্তার যে সাবেকী পদ্ধতিকে হেগেল 'অধিবিদ্যামূলক' আখ্যা দিয়েছেন, যে পদ্ধতি প্রধানত **জিনিসগুলিকে সমাপ্ত** অনড় ও অপরিবর্তনীয় হিশেবে অনুসন্ধান করত এবং যে পদ্ধতির জের মানুষের মনকে এখনো তীব্রভাবে প্রভাবিত করে, সেই পদ্ধতিরও তখনকার কালে যথেষ্ট ঐতিহাসিক ন্যায্যতা ছিল। প্রক্রিয়াকে বিচার করার আগে প্রথমে জিনিসগুলি পরীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। একটি নির্দিষ্ট জিনিস কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা দেখবার আগে জানা দরকার জিনিসটি ঠিক কী। এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের অবস্থা তখন এইরকমই। যে প্রকৃতিবিজ্ঞান তখন পরিসমাপ্ত বস্তু হিশেবে জীবন্ত ও জড় বস্তুর অনুসন্ধান করত, তা থেকেই দেখা দেয় সাবেকী অধিবিদ্যা, যাতেও জিনিসগুলি পরিসমাপ্ত বস্তু বলেই বিবেচিত। কিন্তু এই অনুসন্ধান যখন এতদূর অগ্রসর হল যে, প্রকৃতিতেই এই জিনিসগুলির যে পরিবর্তন চলেছে সে সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ অনুসন্ধানের পর্যায়ে উৎক্রমণের মতো চূড়ান্ত পদক্ষেপ সম্ভবপর হল, তখন দর্শনের ক্ষেত্রেও পুরনো অধিবিদ্যার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। এবং বস্তুত গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিবিজ্ঞান যে ক্ষেত্রে ছিল মূলতই **সংগ্রহের** বিজ্ঞান, পরিসমাপ্ত জিনিসের বিজ্ঞান, সে ক্ষেত্রে আমাদের শতাব্দীতে তা মূলতই **শৃংখলা সাধনের** বিজ্ঞান, পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান, এই জিনিসগুলির উৎস এবং বিকাশ তথা যে পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে এই সমস্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এক বিরাট সমগ্রতার সৃষ্টি করে, তার বিজ্ঞান। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের মধ্যে যেসব প্রক্রিয়া চলে তার অনুসন্ধান করে শারীরবৃত্ত; বীজ থেকে পরিণতাবস্থা পর্যন্ত ব্যক্তি-শরীরের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে ভ্রূণবিদ্যা; পৃথিবীর উপরিতল কীভাবে ক্রমশ গঠিত হয়েছে তার আলোচনা করে ভূতত্ত্ব — এই সবকটি বিজ্ঞানই আমাদের শতাব্দীতে জন্মেছে।

কিন্তু সর্বোপরি তিনটি বিরাট আবিষ্কারের ফলে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞান হু হু করে বেড়ে গিয়েছে:

প্রথমত, জীবকোষ আবিষ্কার, যে এককটির বহুলীভবন ও

পৃথকীভবনের ফলে গোটা উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ গড়ে ওঠে। তাতে করে সমস্ত উন্নত জীবের দেহ একই সাধারণ নিয়ম অনুসারে গড়ে ওঠে শুধু এই স্বীকৃতিই নয়, তাছাড়াও জীবকোষের পরিবর্তন ক্ষমতার ফলে কীভাবে দেহসত্তার প্রজাতি পরিবর্তন হয় এবং সেইহেতু ব্যক্তিগত বিকাশের অতিরিক্ত একটা বিকাশের মধ্য দিয়ে তা যায়, এটা বোঝবারও পথনির্দেশ পাওয়া গেল।

দ্বিতীয়ত, তেজের রূপান্তর, এতে প্রমাণিত হল, যে তথাকথিত শক্তিগুলি প্রথমত অজৈব প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল — যান্ত্রিক শক্তি ও তার পরিপূরক, তথাকথিত স্থৈতিক (potential) তেজ, তাপ, বিকিরণ (আলো বা বিকীর্ণ তাপ), বিদ্যুৎ, চৌম্বক তেজ ও রাসায়নিক তেজ — এসবই হল সার্বিক গতির অভিব্যক্তির বিভিন্ন রূপ এবং এগুলি নির্দিষ্ট এক-একটা অনুপাতে পরস্পরে পরিণত হয়, যার ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণের একটি তেজ অন্তর্হিত হলে তার জায়গায় নির্দিষ্ট পরিমাণের অপর একটি তেজ আবির্ভূত হয়; অতএব প্রকৃতির সমগ্র গতিই এক রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণের এক অবিরাম প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়।

শেষত, ডারউইনের সর্বপ্রথম দেওয়া এই সুসংবদ্ধ প্রমাণ যে, আজকের দিনে আমাদের চারপাশে মানুষসুদ্ধ যে-জীবজগৎ রয়েছে তা আদিতে কয়েকটি এককোষী বীজ থেকে সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের পরিণাম এবং সেই আদি জীবকোষগুলিও আবার রাসায়নিক উপায়ে উদ্ভূত প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ বা অ্যালবুমেন থেকে জাত।

এই তিনটি বিরাট আবিষ্কার এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানে অন্যান্য বিপুল অগ্রগতির ফলে আমরা এমন জায়গায় পৌঁছেছি যেখানে আমরা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তঃসম্পর্কটা দেখতে পারি এবং তা শুধু এক-একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নয়, তাছাড়াও সমগ্রের সঙ্গে এইসব নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের অন্তঃসম্পর্কেও। অতএব, প্রয়োগমূলক প্রকৃতিবিজ্ঞানই যে সমস্ত তথ্য দিয়েছে, তার সাহায্যে আমরা মোটামুটি সুসংবদ্ধভাবে প্রকৃতির অন্তঃসম্পর্কের একটা সামগ্রিক পরিচয় দিতে পারি। এই সামগ্রিক দৃষ্টিটা জোগাবার ভার ইতিপূর্বে ছিল তথাকথিত প্রকৃতি-দর্শনের উপর। কিন্তু প্রকৃতি-দর্শন সে দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারত কেবল বাস্তব কিন্তু তখনো অজানা অন্তঃসম্পর্কের স্থানে ভাবময় ও কাল্পনিক অন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করে, তথ্যের অভাব মনের খেয়াল

দিয়ে পূরণ করে এবং বাস্তব ফাঁকগুলির উপর কল্পনার সেতুবন্ধন করে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে তা নানা চমৎকার ধারণায় উপনীত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালের নানা আবিষ্কারের পূর্বাভাস দিয়েছিল, কিন্তু তাছাড়াও উদ্ভাবন করেছিল বহু বাজে কথা; যা অবশ্য না হয়ে পারত না। আজকের দিনে আমাদের কালোপযোগী একটা 'প্রকৃতি ব্যবস্থায়' উপনীত হবার জন্য যখন প্রাকৃতিক গবেষণার ফলাফলগুলির উপর শুধু দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ তাদের নিজস্ব অন্তঃসম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে দৃষ্টিপাত করলেই যথেষ্ট, যখন এমনকি প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের অধিবিদ্যারঞ্জিত মনের উপর তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এই অন্তঃসম্পর্কের দ্বান্দ্বিক চরিত্র আত্মপ্রতিষ্ঠা করছে, তখন আজ প্রকৃতি-দর্শন চূড়ান্তভাবে খারিজ হয়ে যায়। তাকে পুনরুদ্ধার করবার প্রতিটি প্রচেষ্টা শুধু অবান্তরই নয়, **পশ্চাদগতিই হবে।**

কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে যে কথা সত্য, যাকে এখন আমরা বিকাশের একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বলে মানছি, সেই কথা সমাজ ইতিহাসের প্রতিটি শাখায় এবং মানবীয় (তথা স্বর্গীয়) বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত সমস্ত বিজ্ঞানের সমষ্টির ক্ষেত্রেও সমান সত্য। প্রকৃতি-দর্শনের মতো ইতিহাস, অধিকার এবং ধর্মের দর্শনের ক্ষেত্রেও — ঘটনার মধ্যে প্রমাণিত বাস্তব অন্তঃসম্পর্কের স্থান নিয়েছিল দার্শনিকের নিজস্ব মন-গড়া এক অন্তঃসম্পর্ক; সামগ্রিকভাবে ইতিহাস ও তার বিভিন্ন অংশকে বোঝা হত ভাবসত্তার ক্রমিক রূপায়ণ বলে এবং স্বভাবতই সে ভাবসত্তাটি হল দার্শনিকেরই নিজস্ব প্রিয় ভাবসত্তা। এই মতে, ইতিহাসের ক্রিয়া অচেতন হলেও তা অবশ্যই আগে থেকে নির্ধারিত একটা আদর্শ লক্ষ্য সাধনের দিকে চলে, যেমন, হেগেলের কাছে, সে উদ্দেশ্য হল পরম ভাবসত্তার রূপায়ণ এবং ওই পরম ভাবসত্তার অভিমুখে অবিচল প্রবণতাই হল ঐতিহাসিক ঘটনাবলির অভ্যন্তরীণ অন্তঃসম্পর্ক। এইভাবে বাস্তব কিন্তু তখনো অজানা পারস্পরিক সম্পর্কের স্থানে এল এক নতুন, রহস্যময় অচেতন অথবা ক্রমচেতন ভবিতব্য। অতএব প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেরকম, এখানেও সেইভাবেই কাল্পনিক ও কৃত্রিম অন্তঃসম্পর্ক দূর করে বাস্তব অন্তঃসম্পর্কের আবিষ্কার প্রয়োজন এবং এই কর্তব্যটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় মানব সমাজের ইতিহাসে গতির যেসব সাধারণ নিয়ম প্রাধান্য করে সেগুলির আবিষ্কার।

কিন্তু একদিক থেকে সমাজ এবং প্রকৃতির বিকাশের ইতিহাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রকৃতির উপর মানুষের প্রতিক্রিয়ার কথা বাদ দিলে প্রকৃতির ক্ষেত্রে কেবল অন্ধ অচেতন শক্তিগুলি পরস্পরের উপর সক্রিয় এবং সেগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে দেখা দেয় সাধারণ নিয়মাবলি। ভাসা ভাসা ভাবে দেখা অসংখ্য আপাত-আপাতনের ক্ষেত্রেই হোক, বা যে চরম ফলাফলের মধ্যে এই আপতনগুলির অভ্যন্তরীণ নিয়মানুবর্তিতা প্রমাণিত হচ্ছে সেখানেই হোক, কোনো ঘটনাই সচেতন বাঞ্ছিত লক্ষ্যানুসারী নয়। পক্ষান্তরে, মানব-সমাজে প্রতিটি কর্মকর্তা চেতনাবিশিষ্ট, তারা সংকল্প নিয়ে বা আবেগবশে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে ক্রিয়াশীল; সচেতন উদ্দেশ্য ছাড়া, বাঞ্ছিত লক্ষ্য ছাড়া এখানে কোনো কিছুই ঘটে না। কিন্তু বিশেষ করে কোনো নির্দিষ্ট যুগ বা ঘটনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাতে এই মূল সত্য বদলে যায় না যে, অভ্যন্তরীণ সাধারণ নিয়ম দ্বারাই ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত। কেননা, এখানেও সমস্ত ব্যক্তিমানুষের সচেতন উদ্দেশ্য সত্ত্বেও উপরিভাগে বাহ্যত আপাতিকতারই রাজত্ব। যা চাওয়া যায় তা নেহাত কালেভদ্রেই ঘটে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসংখ্য বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যের মধ্যে পরস্পর প্রতিকূলতা ও সংঘাত দেখা যায়, কিংবা শুরু থেকেই এই উদ্দেশ্যগুলির চরিতার্থতা সম্ভব নয় বা সে চরিতার্থতার উপায় অপর্যাপ্ত। অতএব, ইতিহাসের ক্ষেত্রে অসংখ্য ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও ব্যক্তিগত ক্রিয়ার মধ্যে সংঘাতের পরিণামে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার সঙ্গে অচেতন প্রাকৃতিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। কর্মের পেছনে বাঞ্ছিত লক্ষ্য থাকলেও তার যে আসল ফলাফল দাঁড়ায় সেটা বাঞ্ছিত নয়; অথবা সে ফলাফল বাঞ্ছিত লক্ষ্যের অনুকূল বলেই মনে হলেও তার চরম পরিণামটা হয় বাঞ্ছিতের চেয়ে একেবারে অন্য রকম। অতএব, ঐতিহাসিক ঘটনাও আপাতিকতার শাসনাধীন বলে মনে হয়, কিন্তু যেখানে ওপরে-ওপরে যা আপাতিকতার ক্রিয়া মনে হয় সেখানে সর্বদাই প্রকৃতপক্ষে তা অভ্যন্তরীণ নিগূঢ় নিয়মাবলি দ্বারাই শাসিত এবং সমস্যা হল শুধু সেই নিয়মাবলির আবিষ্কার।

শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের পরিণাম যাই হোক না কেন, মানুষই তার স্রষ্টা, যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সচেতন উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করে, এবং

বিভিন্ন দিকে সক্রিয় তাদের এই বহু ইচ্ছা এবং বহির্বিশ্বের উপর বিবিধ প্রভাবের সারফলটাই হল ইতিহাস। অতএব, প্রশ্নটা হল বহু ব্যক্তি কী ইচ্ছা করে। ইচ্ছা নির্ধারিত হয় রিপু অথবা বিচারের দ্বারা। কিন্তু যে কারিকা দ্বারা রিপু ও বিচার প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তা বহুবিধ। আংশিকভাবে তা বহির্বস্তু হতে পারে, হতে পারে আদর্শমূলক প্রেরণা: উচ্চাকাঙ্ক্ষা, 'সত্য ও ন্যায়ের উৎসাহ', ব্যক্তিগত ঘৃণা এবং এমনকি রকমারি বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত খামখেয়াল। কিন্তু অপরপক্ষে আমরা দেখেছি যে, ইতিহাসে ক্রিয়াশীল বহু ব্যক্তিগত ইচ্ছা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ফলাফল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, অনেক সময় একেবারে বিপরীত ফলাফল সৃষ্টি করে; অতএব সামগ্রিক ফলের তুলনায় এই প্রেরণার গুরুত্ব নেহাতই গৌণ। অপরপক্ষে, আরো প্রশ্ন ওঠে, এই প্রেরণাও আবার কোন চালিকা-শক্তি দ্বারা পরিচালিত, কী কী সেই ঐতিহাসিক কারণ যা কর্মরত মানুষদের মস্তিষ্কে গিয়ে এই সব প্রেরণার রূপ নেয়?

পুরনো বস্তুবাদ কখনো এ প্রশ্ন তোলে নি। ইতিহাস সংক্রান্ত তার যেটুকু বা ধারণা তা ছিল নেহাত প্রায়োগিক। এই ধারণা অনুসারে সমস্ত ক্রিয়াকেই তার পেছনকার উদ্দেশ্য দিয়ে বিচার করা হত, ইতিহাসের অংশগ্রহণকারী মানুষদের ভাল আর মন্দ দুভাগে ভাগ করা হত আর তারপর দেখা যেত, সাধারণতই যারা ভাল তারা ঠকছে, যারা মন্দ তারা হচ্ছে জয়ী। অতএব, পুরনো বস্তুবাদের কাছে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে খুব কিছু শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা নেই এবং আমাদের কাছে দাঁড়ায় এই যে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে পুরনো বস্তুবাদ নিজের প্রতিই মিথ্যাচরণ করছে, কেননা সে বস্তুবাদ অনুসারে ইতিহাসের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল আদর্শমূলক চালিকা-শক্তিগুলির মূল অন্বেষণ করার বদলে, এই শক্তিগুলির পিছনে রয়েছে কোন চালিকা-শক্তি সেকথা আবিষ্কার করার পরিবর্তে, আদর্শমূলক চালিকা-শক্তিগুলিকেই চরম কারণ বলে ধরা হয়। তার অসঙ্গতিটা এইখানে নয় যে, **আদর্শমূলক** চালিকা-শক্তিকে স্বীকার করা হচ্ছে, বরং এইখানে যে, এই আদর্শমূলক প্রেরণার পিছনকার চালক হেতু পর্যন্ত অন্বেষণ চালানো হচ্ছে না। অপরপক্ষে, ইতিহাসের দর্শন অনুসারে, বিশেষত হেগেল যার প্রতিনিধি, এইটে মানা হয় যে, ইতিহাসে ক্রিয়াশীল মানুষদের বাহ্যিক এবং

আসল উদ্দেশ্যাবলিও কোনো মতেই ঐতিহাসিক ঘটনার চরম কারণ নয়, এই উদ্দেশ্যের পিছনে অন্য কোনো চালিকা-শক্তি বর্তমান এবং তারই আবিষ্কার প্রয়োজন। কিন্তু সে দর্শন ইতিহাসের মধ্যেই এই সব শক্তির সন্ধান করে নি, বাইরে থেকে, দার্শনিক মতাদর্শ থেকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে সেগুলি আমদানি করেছে। যেমন হেগেল প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসকে তার অভ্যন্তরীণ অন্তঃসম্পর্ক দিয়ে ব্যাখ্যা করার বদলে শুধুই বলেছেন যে, এ ইতিহাস 'সুন্দর ব্যক্তিত্বের রূপকে' পরিস্ফুট করা ছাড়া আর কিছুই নয়, তা এক নিছক 'শিল্পকর্মের' রূপায়ণ মাত্র। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীকদের সম্পর্কে তিনি এমন অনেক কথা বলেছেন যা চমৎকার ও গভীরতার পরিচায়ক, কিন্তু তাই বলে আজ আমাদের পক্ষে এই ধরনের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করায় বাধা নেই, যা কথার প্যাঁচ ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতএব, যখন চালিকা-শক্তিগুলিকে অনুসন্ধান করবার প্রশ্ন ওঠে, যে শক্তি ইতিহাসে ক্রিয়াশীল মানুষদের প্রেরণার পিছনে সচেতন বা অচেতন ভাবে এবং আসলে প্রায়ই অচেতনভাবে বর্তমান এবং যেগুলি হল ইতিহাসের প্রকৃত চরম চালিকা-শক্তি, তখন প্রশ্নটা আসলে ব্যক্তি বিশেষদের উদ্দেশ্য নিয়ে ততটা নয়, তাঁরা যত বড়োই হোন না কেন যতটা সেই সব প্রেরণা নিয়ে যা বিপুল জনগণকে, সমগ্র জাতিকে এবং জাতির অভ্যন্তরস্থ সমগ্র শ্রেণীকে সচল করে তোলে এবং তা খড়ের আগুন যেমন দাউদাউ করে জ্বলে উঠে হঠাৎ নিভে যায় সেরকম ক্ষণিক নয়, বরং বিরাট ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটানোর মতো একটা স্থায়ী কর্মের জন্য। কর্মরত জনগণ ও তাদের নেতা তথাকথিত মহাপুরুষদের মনে যা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ বা মতাদর্শগত ও এমনকি মহিমান্বিতরূপে সচেতন প্রেরণা হিশেবে প্রতিফলিত হয়, সেই চালক হেতুগুলিকে নিরূপণ করাই হল একমাত্র পথ এবং এই পথে অগ্রসর হয়ে আমরা সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে এবং নির্দিষ্ট এক-একটা যুগে ও নির্দিষ্ট এক-একটা দেশের ক্ষেত্রে সক্রিয় নিয়মগুলির খোঁজ পাব। যাকিছু মানুষকে সচল করে তোলে সেটা তার মনের মধ্য দিয়ে সক্রিয় হতে বাধ্য; কিন্তু তার মনে এর কী রূপ দাঁড়াবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর। শ্রমিকেরা এখনো পুঁজিবাদী যন্ত্রশিল্পকে মোটেই মেনে নিতে পারে

নি, যদিও তারা ১৮৪৮ সালেও রাইন অঞ্চলে যা করত সেভাবে এখন যন্ত্রগুলি স্রেফ চূর্ণ করতে শুরু করে না।

কিন্তু ইতিহাসের এই চালক হেতুগুলির সঙ্গে তার ফলাফলের অন্তঃসম্পর্ক জটিল ও প্রচ্ছন্ন বলে ইতিপূর্বের সমস্ত যুগে এগুলিকে আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব ছিল, তবে আমাদের বর্তমান যুগ এই অন্তঃসম্পর্কগুলিকে এমন সরল করে দিয়েছে যে, এখন ধাঁধার সমাধান সম্ভব হয়েছে। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা থেকে, অর্থাৎ অন্তত ১৮১৫ সালের ইউরোপীয় শান্তি থেকে (১১৫), ইংলন্ডের কারুর কাছেই আর একথা গোপন নেই যে, সেখানে সমগ্র রাজনৈতিক সংগ্রাম চলেছে দুটি শ্রেণীর মধ্যে, ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণী (landed aristocracy) ও বুর্জোয়ার (middle class) মধ্যে প্রাধান্যের দাবি নিয়ে। ফরাসী দেশে বুর্‌বোঁ বংশের ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে একই ব্যাপার অনুভূত হয়েছে। তিয়েরি থেকে গিজো, মিনিয়ে ও তিয়েরে পর্যন্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠা পর্বের (১১৬) ঐতিহাসিকেরা মধ্য যুগের পরবর্তী সমগ্র ফরাসী ইতিহাস প্রসঙ্গে সর্বত্রই মূলসূত্র হিশেবে তার উল্লেখ করেন। এবং ১৮৩০ সাল থেকে উভয় দেশেই শ্রমিক শ্রেণী, প্রলেতারিয়েত, ক্ষমতার তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হিশেবে স্বীকৃত হয়েছে। পরিস্থিতি এতই সরল হয়েছে যে, অন্তত সবচেয়ে অগ্রগামী দুটি উপরোক্ত দেশের ক্ষেত্রে এই তিন বিরাট শ্রেণীর সংগ্রাম, তাদের স্বার্থসংঘাতের মধ্যে আধুনিক ইতিহাসের চালিকা-শক্তি না দেখতে হলে ইচ্ছে করেই চোখ বুজে থাকা দরকার।

কিন্তু এই শ্রেণীগুলির আবির্ভাব হল কী করে? অন্তত প্রথম দৃষ্টিতে যদিই বা ইতিপূর্বের সামন্ততান্ত্রিক বৃহৎ জমিদারির উদ্ভবকে রাজনৈতিক কারণ দিয়ে জুলুমদারি অধিকার হিশেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়, তবুও বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত সম্বন্ধে তা সম্ভব নয়। এই দুটি বিরাট শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের কারণ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ভাবেই বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক বলে দেখা গেল। এবং একথাও সমান স্পষ্ট হল যে, যেমন ভূমি-মালিকানার বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার, তেমনি বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের ক্ষেত্রেও প্রথম ও প্রধানতম প্রশ্ন হল অর্থনৈতিক স্বার্থ, রাজনৈতিক ক্ষমতা শুধু তা হাসিল করার উপায়মাত্র। অর্থনৈতিক অবস্থার, কিংবা আরো

নিখুঁতভাবে বললে, উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলেই বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত উভয়েরই আবির্ভাব। প্রথমে গিল্ড কায়িক শিল্প থেকে হস্তশিল্প-কারখানা এবং তারপর হস্তশিল্প-কারখানা থেকে বাষ্পশক্তি এবং যন্ত্রশক্তিসহ বৃহৎ শিল্পে উৎক্রমণের ফলেই ওই দুটি শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে। বিকাশের এক পর্যায়ে বুর্জোয়া শ্রেণী যে নতুন উৎপাদন-শক্তিকে চালু করে -- প্রথমত শ্রমবিভাগ ও সামগ্রিকভাবে একই সাধারণ কারখানা-ব্যবস্থায় অংশোৎপাদক বহু মেহনতীর মিলন — তার সঙ্গে এবং এই উৎপাদন-শক্তির মাধ্যমে বিকশিত বিনিময়-ব্যবস্থার শর্ত ও প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে পাওয়া ও আইন-মারফত পবিত্র করা উৎপাদন-পদ্ধতি, অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গিল্ডগত বিশেষাধিকার এবং অসংখ্য ব্যক্তিগত ও স্থানীয় বিশেষাধিকার (বিশেষাধিকারহীন সম্প্রদায়গুলির কাছে এগুলি তখন কতকগুলি নিগড় মাত্র) আর খাপ খায় না। বুর্জোয়া শ্রেণীর মারফত সূচিত উৎপাদন-শক্তি বিদ্রোহ করল সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ও গিল্ড মালিকদের দ্বারা সূচিত উৎপাদন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তার ফলাফল সকলেই জানেন: ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে ক্রমশ এবং ফ্রান্সে এক আঘাতে সামন্ততান্ত্রিক বাধাগুলি চুরমার হয়ে গেল। জার্মানিতে এ প্রক্রিয়া এখনো শেষ হয় নি। কিন্তু ঠিক যেমন বিকাশের একটি পর্যায়ে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে কারখানা-শিল্পের সংঘাত বাধে, ঠিক তেমনি তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে আজ ইতিমধ্যেই বৃহদায়তন উৎপাদনের সংঘাত দেখা দিয়েছে। এই ব্যবস্থার মধ্যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ এই শিল্প একদিকে জনসাধারণের বৃহত্তম অংশকে ক্রমশই প্রলেতারিয়ানে পরিণত করে এবং অপরদিকে উৎপন্ন করে ক্রমবর্ধমান অবিক্রেয় উৎপন্ন। পারস্পরিক হেতুস্বরূপ অতি-উৎপাদন ও ব্যাপক দুর্দশা এই বিদ্ঘুটে স্ববিরোধই হল বৃহৎ শিল্পের পরিণাম এবং তারই ফলে উৎপাদন-শক্তিকে মুক্তি দেবার জন্য উৎপাদন-ব্যবস্থায় এক পরিবর্তনের প্রয়োজন অনিবার্যভাবেই দেখা দেয়।

অতএব, অন্তত আধুনিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রমাণ হয় যে, সমস্ত রাজনৈতিক সংগ্রামই হল শ্রেণী-সংগ্রাম, এবং মুক্তিকামী সমস্ত শ্রেণী-সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপ অনিবার্য হলেও — কেননা সমস্ত শ্রেণী-সংগ্রামই

রাজনৈতিক সংগ্রাম — তা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নেই আবর্তিত। অতএব, অন্তত এই ইতিহাসের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল গৌণ, এবং নাগরিক সমাজ (civil society), অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রটাই হল নির্ধারক। হেগেলও যে চিরাচরিত ধারণাকে শ্রদ্ধা করেছেন, সেই ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রই হল নির্ধারক বস্তু এবং নাগরিক সমাজ হল তার দ্বারা নির্ধারিত। বাহ্য রূপটা সেইরকমই। যেমন, ব্যক্তি-বিশেষের কর্মের সমস্ত চালিকা-শক্তি তার মস্তিষ্কের মাধ্যমে অবশ্য চালিত এবং তাকে সক্রিয় করার জন্য তার ইচ্ছা প্রেরণা রূপে পরিণত হতে বাধ্য, তেমনই নাগরিক সমাজের সমস্ত প্রয়োজন — যে শ্রেণীই সেখানে শাসক শ্রেণী হোক না কেন — আইন হিশেবে সাধারণ বৈধতা লাভের জন্য রাষ্ট্রের ইচ্ছার মাধ্যমে অগ্রসর হতে বাধ্য। এটা হল অবস্থাটির আনুষ্ঠানিক দিক এবং সেই দিকটিই স্বতঃসিদ্ধ। তবুও প্রশ্ন ওঠে, এই নিছক অনুষ্ঠানমূলক ইচ্ছার — তা ব্যক্তিরই হোক আর রাষ্ট্রেরই হোক — সারবস্তু কী, এবং সেই সারবস্তু এল কোথা থেকে, আর কিছু না হয়ে ঠিক এই ইচ্ছাটাই বা কেন? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে, আধুনিক ইতিহাসে রাষ্ট্রের ইচ্ছা মোটের উপর নিয়ন্ত্রিত হয়েছে নাগরিক সমাজের পরিবর্তনশীল চাহিদার দ্বারা, এই শ্রেণী বা ওই শ্রেণীর কর্তৃত্ব দ্বারা, শেষ বিচারে উৎপাদন-শক্তির ও বিনিময়-সম্পর্কের বিকাশ দ্বারা।

কিন্তু যদি বিশাল উৎপাদন-উপায় ও যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ আমাদের এই আধুনিক কালেও রাষ্ট্রটা স্বাধীন বিকাশের এক স্বাধীন ক্ষেত্র না হয়, যদি শেষ পর্যন্ত সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক শর্ত দ্বারাই তার সত্তা ও বিকাশের ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে পূর্ববর্তী সমস্ত যুগেই একথা আরো বেশি সত্য হতে বাধ্য যখন মানুষের বৈষয়িক জীবনোৎপাদনের এত প্রচুর উপায় ছিল না, এবং অতএব, যখন এই জাতীয় উৎপাদনের আবশ্যিকতা মানুষের উপর অনেক বেশি প্রভুত্ব বিস্তার করে থেকেছে। যদি আজকের দিনেও, বৃহৎ শিল্প ও রেলপথের যুগেও, রাষ্ট্র মোটের উপর উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণীরই অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ঘনীভূত প্রকাশমাত্র হয়, তাহলে যে যুগে প্রত্যেক পুরুষই তাদের সামগ্রিক আয়ুষ্কালের অনেক বেশি অংশ বৈষয়িক প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে ব্যয় করতে বাধ্য ছিল এবং

অতএব আজ আমাদের তুলনায় তার উপর ঢের বেশি নির্ভরশীল হতে বাধ্য ছিল, সে যুগে একথা নিশ্চয়ই অনেক বেশি সত্য হতে বাধ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাসকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করলেই কথাটা সম্পূর্ণ পর্যাপ্তভাবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু অবশ্যই এখানে সে বিচারের অবতারণা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় আইন যদি অর্থনৈতিক সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে অবশ্যই নাগরিক আইনের বেলাতেও একই কথা, — প্রকৃতপক্ষে সেগুলি মূলতই কোনো এক নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যা স্বাভাবিক, ব্যক্তি-বিশেষদের মধ্যে সেই ধরনের প্রচলিত অর্থনৈতিক সম্পর্কের অনুমোদন মাত্র। কিন্তু যেভাবে এই অনুমোদন দেওয়া হয় তার রূপ অবশ্য নানারকম হতে পারে। সমগ্র জাতীয় বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ইংলণ্ডে যেমন ঘটেছে, তেমনিভাবে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক আইনের রূপগুলিকে মোটের উপর অক্ষুণ্ণ রেখে তার মধ্যে বুর্জোয়া বিষয়বস্তু পুরে দেওয়া, বস্তুত সামন্ততান্ত্রিক নামটার মধ্যে সরাসরি বুর্জোয়া অর্থ ধরে নেওয়া সম্ভব। কিংবা পশ্চিম মহাদেশীয় ইউরোপে যেমন ঘটেছে তাও হতে পারে, অর্থাৎ রোমক আইন, যা কিনা পৃথিবীতে পণ্য-উৎপাদকদের প্রথম বিশ্ব আইন এবং যে আইনে সরল পণ্যের মালিকদের মূল আইনগত সম্পর্কের অপরূপ সূক্ষ্ম পরিব্যাখ্যান বর্তমান (ক্রেতা-বিক্রেতা, উত্তমর্ণ-অধমর্ণ, চুক্তি, বাধ্যবাধকতা, প্রভৃতি), তাকে ভিত্তি হিশেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ছোট বুর্জোয়ার ও তখনো আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উপকারার্থে, শুধুমাত্র আইনগত ব্যবহারের মাধ্যমে (সারা-জার্মান আইন) এই আইনকে সেই সমাজের স্তরে নিয়ে আসা সম্ভব; কিংবা তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত ও নীতিবাগীশ ব্যবহারজীবীদের সহায়তায় এই আইনকে এ জাতীয় সমাজ স্তরের উপযোগী করে ঢেলে সেজে একটা বিশেষ আইনসংহিতায় পরিণত করা যায় — সে পরিস্থিতিতে এ সংকলন অবশ্য আইনের দৃষ্টিকোণ থেকেও হবে খারাপ (যথা, প্রাশিয়ার Landrecht)। আবার সে ক্ষেত্রে বিরাট বুর্জোয়া বিপ্লবের পর এই একই রোমক আইনের ভিত্তিতে ফরাসী 'Code civile'-এর মতো বুর্জোয়া সমাজের চিরায়ত আইনসংহিতাও রচনা করা সম্ভব। অতএব, নাগরিক আইন যদি আইনগত রূপে সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের অভিব্যক্তি মাত্র হয়, তাহলে

অবস্থার তারতম্য অনুসারে সে অভিব্যক্তি ভালভাবেও হতে পারে, খারাপভাবেও হতে পারে।

রাষ্ট্রকে আমরা দেখি মানুষের উপর একটা প্রথম মতাদর্শগত শক্তি হিশেবে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সমাজের সাধারণ স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য সমাজ একটি সংস্থা গড়ে নেয়। সেই সংস্থা হল রাষ্ট্রশক্তি। গড়ে উঠতে না উঠতেই এ সংস্থা সমাজের প্রসঙ্গে নিজেকে স্বতন্ত্র করে নেয় এবং অবশ্য যতই তা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর সংস্থায় পরিণত হয়, যতই প্রত্যক্ষভাবে সেই শ্রেণীর প্রাধান্য কায়েম করে, ততই বেশি করে রাষ্ট্রের এই স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয়। শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিপীড়িত শ্রেণীর সংগ্রাম অনিবার্যভাবেই রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়, এ সংগ্রাম সর্বাগ্রে শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে তার অর্থনৈতিক ভিত্তির অন্তঃসম্পর্কের চেতনা ম্লান হয়ে যায় এবং এমনকি তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে পারে। সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের বেলায় সম্পূর্ণভাবে তা না হলেও সে সংগ্রামের ঐতিহাসিকদের বেলায় প্রায় সর্বত্রই তা ঘটে। রোমক প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম সংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থকারদের মধ্যে একমাত্র আপিয়নই সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার করে আমাদের জানিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা কী ছিল, অর্থাৎ ভূমি-সম্পত্তিই।

কিন্তু সমাজের সম্পর্কে রাষ্ট্র একবার স্বাধীন শক্তিতে পরিণত হবার পরই তা আরো একটি মতাদর্শের সৃষ্টি করে। বস্তুত পেশাদার রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় আইনের (Public Law) তত্ত্বকার এবং নাগরিক আইনের (Private Law) আইনবিদদের কাছেই অর্থনৈতিক তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কটা একেবারে হারিয়ে যায়। যেহেতু প্রতিটি ক্ষেত্রেই আইনের সমর্থন লাভের জন্য অর্থনৈতিক ঘটনার পক্ষে আইনগত প্রেরণার রূপ পরিগ্রহ প্রয়োজন, এবং তাতে করে যেহেতু প্রচলিত সামগ্রিক আইন ব্যবস্থার কথা মনে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন, তাই আইনগত রূপটিই হয়ে ওঠে সর্বেসর্বা এবং অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুটি শূন্য হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় আইন ও নাগরিক আইন স্বতন্ত্র দুটি ক্ষেত্র হিশেবে বিবেচিত হয়, যাদের উভয়েরই যেন নিজস্ব ও স্বাধীন ঐতিহাসিক বিকাশ আছে, সমস্ত অভ্যন্তরীণ বিরোধের সুসঙ্গত সমাধান ঘটিয়ে উভয়েরই যেন একটা ধারাবাহিক উপস্থাপন সম্ভব ও প্রয়োজন।

আরো উন্নত অর্থাৎ কিনা বৈষয়িক-অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে আরো দূরে সরে যাওয়া মতাদর্শ গ্রহণ করে দর্শন ও ধর্মের রূপ। এ ক্ষেত্রে ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তাদের বৈষয়িক অস্তিত্বের অন্তঃসম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হয়ে দাঁড়ায় এবং মধ্যবর্তী যোগসূত্রগুলির দরুন হয়ে ওঠে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর। অথচ এ পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান। যেমন, পঞ্চদশ শতকের মধ্য থেকে সমগ্র রেনেসাঁস যুগ মূলতই নগরের অতএব বার্গারদের (নাগরিকদের) অবদান, তেমনি পরবর্তী নব জাগ্রত দর্শনের বেলাতেও একই কথা। তার বিষয়বস্তু মূলতই হল ছোট ও মাঝারি বার্গারদের পক্ষে বড়ো বুর্জোয়ায় বিকশিত হবার পর্যায়োপযোগী চিন্তার দার্শনিক অভিব্যক্তি মাত্র। গত শতাব্দীর ইংরেজ ও ফরাসী দার্শনিকদের বেলায়, যাঁরা বহু ক্ষেত্রে ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ হিশেবে সমান, একথা সুস্পষ্ট; এবং ইতিপূর্বে হেগেলীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমরা একথা প্রমাণ করেছি।

এখন আমরা সংক্ষেপে ধর্মের কথা আলোচনা করব, কেননা তা বৈষয়িক জীবন থেকে সবচেয়ে দূরে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বাস্তব জীবনের সঙ্গে সবচেয়ে সম্পর্কহীন। অত্যন্ত আদিম যুগে মানুষের নিজের প্রকৃতি ও তার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি বিষয়ে ভ্রান্ত ও আদিম ধারণা থেকে ধর্মের উৎপত্তি। কিন্তু প্রতিটি ভাবাদর্শের একবার উদ্ভব হবার পর তা চলতি ধারণা-সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিকশিত হয় এবং সেগুলিকে আরো বিকশিত করে। না হলে তা ভাবাদর্শই হত না, অর্থাৎ চিন্তার তেমন একটা কারবার হত না, যেখানে চিন্তাকে স্বাধীনভাবে বিকাশমান, নিজস্ব নিয়মাধীন একটা স্বাধীন সত্তা হিশেবে দেখা হচ্ছে। যাদের মাথার মধ্যে এই চিন্তাপদ্ধতি ক্রিয়াশীল সেই মানুষদের বৈষয়িক জীবনের অবস্থাই যে শেষ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার গতি নিয়ন্ত্রণ করে, সেকথা অনিবার্যভাবেই এই ব্যক্তিদের কাছে অজ্ঞাত থাকে, কেননা তা না হলে সমস্ত ভাবাদর্শটাই শেষ হয়ে যায়। ধর্মের এই আদি ধারণাগুলি প্রতিটি জ্ঞাতি-সম্পর্কমূলক জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই মোটের ওপর সাধারণ, কিন্তু গোষ্ঠীগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে প্রতিটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর ভাগ্যে জীবন-ধারণের যে অবস্থা ঘটে সেই অবস্থা অনুসারে বিশেষ এক-একটা গোষ্ঠীগত ধরনে তা বিকশিত হতে থাকে। কয়েকটি জাতিগোষ্ঠী প্রসঙ্গে, বিশেষত আর্য (তথাকথিত ইন্দো-ইউরোপীয়) গোষ্ঠীর প্রসঙ্গে এই বিকাশ

পদ্ধতি খংটিয়ে বিচার করা হয়েছে তুলনামূলক পুরাণতত্ত্বে। প্রতিটি জাতির মধ্যে এই যে দেবতাদের বানানো হল তাঁরা জাতীয় দেবতা; যে জাতীয় সীমানা রক্ষা করা তাঁদের দায়িত্ব তার বাইরে তাঁদের প্রভাব যায় নি। এ সীমানার অন্যদিকে অন্য দেবতাদের অক্ষুণ্ণ প্রতিপত্তি। যতদিন পর্যন্ত একটি জাতির সত্তা বর্তমান শুধুমাত্র ততদিন পর্যন্তই লোকেদের কল্পনায় এই দেবতাদের অস্তিত্ব চলতে পারত; জাতির পতনের সঙ্গে দেবতাদেরও পতন হত। রোমক বিশ্ব সাম্রাজ্যের আঘাতে পুরনো জাতিসত্তাগুলির পতন ঘটেছিল, — এখানে এই সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন নেই। ম্লান হয়ে গেল পুরনো জাতীয় দেবতাগুলি, এমনকি রোম নগরের সংকীর্ণ পরিধির পক্ষে উপযোগী রোমক দেবতারাও ক্ষয় পেল। বিশ্ব সাম্রাজ্যের পরিপূরক হিশেবে যে বিশ্ব ধর্মেরও প্রয়োজন, সেকথা স্পষ্ট প্রকাশ পেল রোমে স্থানীয় দেবতাদের সঙ্গে যেসব বিদেশী দেবতাদের সামান্যমাত্র সম্মান ছিল তাঁদের জন্য স্বীকৃতি এবং দেবী জোগানোর প্রচেষ্টায়। কিন্তু এইভাবে সম্রাটের আজ্ঞায় কোন বিশ্ব ধর্ম সৃষ্ট হয় না। ইতিমধ্যেই নিঃশব্দে সাধারণীকৃত প্রাচ্য এবং বিশেষত ইহুদী ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে স্থূল গ্রীক, বিশেষত স্টোইক দর্শনের মিশ্রণ থেকে নতুন বিশ্ব ধর্মের অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাব হয়ে গেছে। আজ পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করেই খ্রীষ্টধর্মের আদিরূপ আবিষ্কার করা সম্ভব, কেননা ধর্মটি আমাদের কাছে যে সরকারী চেহারায় এসে পৌঁছেছে সেটা হল তার সেই রাষ্ট্রধর্ম চেহারা, যাতে তাকে নিকাই সম্মেলন (১১৭) ঢেলে সাজে। কিন্তু ২৫০ বছর পরে ধর্মটি যে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হল তা থেকেই প্রমাণ হয় ধর্মটি ছিল তখনকার অবস্থার কত অনুরূপ। মধ্য যুগে যে পরিমাণে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটে চলল, সেই পরিমাণেই তার ধর্মগত পরিপূরক হিশেবে, সামন্ততান্ত্রিক সোপান ব্যবস্থাসহ, খ্রীষ্টধর্মও বিকশিত হতে লাগল। এবং বার্গাররা সতেজ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ক্যাথলিকবাদের বিরুদ্ধে প্রটেস্টান্ট ধর্মদ্রোহ বেড়ে ওঠে, যা প্রথম দেখা দয়ে ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে আলবিগেঁসদের (১১৮) মধ্যে, যখন সেখানকার নগরগুলির চূড়ান্ত সমৃদ্ধি চলছে। দর্শন, রাজনীতি, আইন — ভাবাদর্শের বাকি সবকিছুকে মধ্য যুগ ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং সেগুলিকে ধর্মতত্ত্বেরই অঙ্গ করে দেয়।

তাই সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনই ধর্মতত্ত্বমূলক রূপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জনগণের অনুভূতির পুষ্টি হত শুধুমাত্র ধর্মের পথ্য দিয়ে। অতএব উদ্দাম কোনো আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল তাদের নিজেদের স্বার্থকে ধর্মের সাজে সাজিয়ে পরিবেশন করা। এবং ঠিক যেমনভাবে বার্গাররা শুরু থেকেই বিত্তহীন নাগরিক প্লেব, দিনমজুর ও নানাবিধ চাকরবাকরদের এক লেজুড় সৃষ্টি করেছিল, যারা কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যারা উত্তরকালের প্রলেতারিয়েতের অগ্রদূত, তেমনি অচিরে ধর্মদ্রোহও নরমপন্থী বার্গার ধর্মদ্রোহ এবং প্লেবীয় বৈপ্লবিক ধর্মদ্রোহ এই দুই ভাগে বিভক্ত হল, দ্বিতীয়টি এমনকি বার্গার ধর্মদ্রোহীদের কাছেও ঘৃণাই।

প্রটেস্টান্ট ধর্মদ্রোহের দুর্মরতা ছিল উঠতি বার্গারদের দুর্জয়তারই সহগ। বার্গাররা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের বিরুদ্ধে তাদের যে সংগ্রাম এ পর্যন্ত ছিল প্রধানতই স্থানীয়, তা জাতীয় আয়তন গ্রহণ করতে লাগল। প্রথম বড়ো সংগ্রাম ঘটল জার্মানিতে অর্থাৎ তথাকথিত রিফর্মেশন। বার্গাররা তখনো নিজেদের পতাকাতলে অবশিষ্ট বিপ্লবী সামাজিক বর্গকে — শহরের প্লেবীয়দের এবং গ্রামাঞ্চলের নিম্ন স্তরের অভিজাত শ্রেণী এবং কৃষকদের — মেলাবার মতো শক্তিশালী বা বিকশিত হয় নি। অভিজাত শ্রেণী প্রথমটায় পরাজিত হয়; বিদ্রোহী হয়ে ওঠে কৃষকেরা এবং সমগ্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের সেইটিই হল সর্বোচ্চ বিন্দু। কিন্তু নগরগুলি তাদের অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করে এবং এইভাবে ভূস্বামী রাজাদের সেনাবাহিনীর সামনে পরাজিত হয় বিপ্লব। এই রাজারাই আহরণ করে সবটুকু লাভ। তারপর তিন শতাব্দী ধরে ইতিহাসে স্বাধীন ও সক্রিয় অংশগ্রহণকারী জাতিগুলির মধ্য থেকে জার্মানি অদৃশ্য হয়। কিন্তু জার্মান লুথারের পাশে আবির্ভূত হন ফরাসী কালভাঁ। খাঁটি ফরাসীসুলভ তীক্ষ্নতায় তিনি রিফর্মেশনের বুর্জোয়া চরিত্রটিকে পুরোভাগে আনেন, গির্জাগুলিকে প্রজাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রূপ দেন। জার্মানিতে লুথারের রিফর্মেশন যখন অধঃপতিত হয়েছে এবং দেশকে ছারখার করেছে, তখন জেনেভা, হল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে প্রজাতন্ত্রবাদীদের ধ্বজা হয়ে দাঁড়িয়েছে কালভাঁ-র রিফর্মেশন, হল্যান্ডকে তা মুক্তি দিয়েছে স্পেন ও জার্মান সাম্রাজ্যের

আধিপত্য থেকে এবং ইংলণ্ডে তখন বুর্জোয়া বিপ্লবের যে দ্বিতীয় অংক অভিনীত হচ্ছে তার জন্য জুগিয়েছে মতাদর্শগত সাজপোশাক। সেইখানেই কালভাঁবাদ তখনকার বুর্জোয়া স্বার্থের সত্যকার ধর্মমূলক ছদ্মবেশ হিশেবে দেখা দেয় এবং এই কারণেই অভিজাত শ্রেণীর একাংশের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর আপসে যখন ১৬৮৯ সালের বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটল তখন তা পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করতে পারে নি (১১৯)। ইংরেজদের রাষ্ট্রীয় গির্জা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু তা আর আগেকার ক্যাথলিকদের রূপে নয়, যেখানে রাজা পোপের ভূমিকা পালন করে, — প্রতিষ্ঠিত হল কালভাঁবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত রূপে। পুরনো রাষ্ট্রীয় গির্জায় ক্যাথলিক রবিবারে ফুর্তির উৎসব পালন করা হত এবং তা নিরানন্দ কালভাঁ-র রবিবারের বিরোধী ছিল। নতুন বুর্জোয়াভাবাপন্ন গির্জা শেষোক্ত প্রথাটি প্রবর্তিত করল, আজো তা ইংলণ্ডের শোভা হয়ে আছে।

ফ্রান্সে ১৬৮৫ সালে সংখ্যালঘিষ্ঠ কালভাঁপন্থীদের দমন করা হল এবং হয় তাদের ক্যাথলিকপন্থী করা হল আর না হয় বিতাড়ন করা হল দেশ থেকে (১২০)। কিন্তু তাতে কীই বা লাভ হল? ইতিমধ্যেই স্বাধীন চিন্তাশীল পিয়ের বেল তাঁর কর্মজীবনের শীর্ষস্থানে পেঁছেছেন এবং ১৬৯৪ সালে জন্ম হল ভল্টেয়রের। চতুর্দশ লুই-এর জবরদস্ত ব্যবস্থার ফলে ফরাসী বুর্জোয়ার পক্ষে অধার্মিক এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক রূপে তাদের বিপ্লব সংঘটন আরো সহজই হয়ে দাঁড়াল, বিকশিত বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে একমাত্র এই রূপটিই উপযোগী। জাতীয় পরিষদের আসনগুলি অধিকার করলেন প্রটেস্টান্টদের পরিবর্তে স্বাধীন চিন্তাশীলেরা। এইভাবে খ্রীষ্টধর্ম উপনীত হল তার চরম অবস্থায়। ভবিষ্যতে কোনো প্রগতিশীল শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার মতাদর্শগত ভূষণ যোগাবার যোগ্যতা আর তার রইল না। ক্রমশই তা শুধু শাসক শ্রেণীগুলির একমাত্র সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াল এবং এটা তারা নেহাতই শাসনের উপায় হিশেবে, নিম্নতর শ্রেণীদের বন্ধনে রাখবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। তাছাড়া বিভিন্ন শাসক শ্রেণী তাদের নিজের নিজের উপযোগী ধর্ম ব্যবহার করে: ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণী ব্যবহার করে ক্যাথলিক জেসুইটবাদ বা প্রটেস্টাণ্ট গোঁড়ামি; উদারপন্থী ও র‍্যাডিকেল বুর্জোয়া শ্রেণী ব্যবহার করে যুক্তিবাদ (rationalism)। এবং এইসব ভদ্রলোকেরা নিজেরা নিজেদের

নির্দিষ্ট ধর্মগুলিতে বিশ্বাস করেন কি না করেন, তাতে কিছুই এসে যায় না।

অতএব, আমরা দেখছি: ধর্ম একবার গড়ে ওঠার পর তার মধ্যে ঐতিহ্যগত উপাদান বর্তমান থাকে, কারণ মতাদর্শের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঐতিহ্য হল একটি মস্ত রক্ষণশীল শক্তি। কিন্তু এই উপাদানের যে রূপান্তর ঘটে তা আসে শ্রেণী-সম্পর্ক থেকে, অর্থাৎ যে মানুষেরা এই রূপান্তর ঘটায় তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে। এবং বর্তমানে এইটুকু কথাই যথেষ্ট।

উপরে ইতিহাস সংক্রান্ত মার্কসীয় ধারণার শুধুমাত্র একটি সাধারণ খসড়া দেওয়াই সম্ভব, বড়ো জোর তার সঙ্গে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্তও। তার প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে ইতিহাস থেকেই, এবং এই প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে, অন্যান্য রচনায় তা পর্যাপ্তভাবেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এই ধারণা থেকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে দর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটে, ঠিক যেমন প্রকৃতি সংক্রান্ত দ্বান্দ্বিক ধারণার ফলে সমস্ত প্রকৃতি-দর্শন অপ্রয়োজনীয় এবং অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এখন আর কোথাওই আমাদের মস্তিষ্ক থেকে অন্তঃসম্পর্ক আবিষ্কারের প্রশ্ন থাকে না, তার পরিবর্তে এগুলিকে আবিষ্কার করতে হয় বাস্তব ঘটনা থেকেই। প্রকৃতি এবং ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত হয়ে দর্শনের জন্য যেটুকু ক্ষেত্র বাকি থাকে, — সেটুকু যদি আদৌ থাকে — সেটা হল বিশুদ্ধ চিন্তার ক্ষেত্র: চিন্তাপদ্ধতির নিয়মের তত্ত্ব, যুক্তিতত্ত্ব ও দ্বন্দ্বতত্ত্ব।

* * *

১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর থেকে 'শিক্ষিত' জার্মানি তত্ত্বকে বিদায় জানিয়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। কায়িক শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র উৎপাদন এবং হস্তশিল্প-কারখানার স্থানে এল খাঁটি বৃহৎ শিল্প। আবার বিশ্ববাজারে আবির্ভূত হল জার্মানি। ছোট ছোট রাষ্ট্র, সামন্ততন্ত্রের জের এবং আমলাতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থার ফলে এই বিকাশের বিরুদ্ধে প্রধানতম যেসব প্রতিবন্ধক ছিল, অন্তত সেগুলিকে নতুন ক্ষুদ্র জার্মান সাম্রাজ্য (১২১) দূর করেছে। কিন্তু স্পেকুলেশন যতই দার্শনিকের পাঠাগার ছেড়ে ফাটকাবাজারে গিয়ে মন্দির স্থাপন করতে লাগল ততই শিক্ষিত জার্মানি হারাল তার তত্ত্বের মহান আগ্রহ — লব্ধ ফলাফল ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য

হবে কিনা, তা পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অপ্রিয় হবে কিনা, এসব চিন্তার অপেক্ষা না করে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের প্রবণতা। অথচ গভীরতম রাজনৈতিক অবমাননার দিনেও এই শক্তিই ছিল জার্মানির গৌরব। একথা ঠিক যে, বিশেষত খুঁটিনাটি গবেষণার ক্ষেত্রে জার্মানির সরকারী প্রকৃতিবিজ্ঞান তখনো প্রথম শ্রেণীতেই তার স্থান অধিকার করে রইল। কিন্তু মার্কিন পত্রিকা *Science* ন্যায্যতই মন্তব্য করেছে যে, বিচ্ছিন্ন সব তথ্যের মধ্যে ব্যাপক সম্পর্কসূত্র স্থাপন এবং সেগুলি থেকে সাধারণ নিয়ম টানার ক্ষেত্রে আগে যেমন জার্মানিতে প্রধান কাজ হত, তার বদলে এখন ইংলণ্ডে প্রধান কাজ হচ্ছে। এবং ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের তথা দর্শনেরও ক্ষেত্রে চিরায়ত দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে আগেকার সেই নির্ভীক তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের উৎসাহ। তার স্থান অধিকার করেছে শূন্যগর্ভ পল্লবগ্রাহিতা এবং পদ ও রোজগার নিয়ে সশঙ্ক ভাবনা, এমনকি ইতরতম চাকুরি মনোবৃত্তি পর্যন্ত। এই বিজ্ঞানগুলির সরকারী প্রতিনিধিরা হয়ে দাঁড়িয়েছেন বুর্জোয়া শ্রেণীর এবং বর্তমান রাষ্ট্রের অনাবৃত মতাদর্শগত প্রতিনিধি, কিন্তু তা এমন একটা যুগে যখন উভয়ই হল শ্রমিক শ্রেণীর প্রকাশ্য বিরোধী।

একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে তত্ত্বের প্রতি জার্মান আগ্রহ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এখান থেকে তাকে কোনোভাবে উচ্ছেদ করা যায় না। এখানে উচ্চ পদের জন্য, মুনাফার জন্য বা উপর মহল থেকে সদয় দাক্ষিণ্যলাভের জন্য কোনো মাথাব্যথা নেই। অপরপক্ষে, বিজ্ঞান যতই নির্ভয় ও নিরাসক্তভাবে অগ্রসর হয়, ততই দেখা দেয় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার সঙ্গতি। যে নব ধারা অনুসারে সমগ্র সমাজ-ইতিহাস ব্যাখ্যার মূলসূত্র পাওয়া যাবে শ্রমবিকাশের ইতিহাসের মধ্যেই, তা শুরু থেকেই প্রধানত শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিই আবেদন করেছে এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই যে সাড়া পেয়েছে, সরকারী বিজ্ঞানের কাছ থেকে তা এই সাড়া চায়ও নি, প্রত্যাশাও করে নি। জার্মান শ্রমিক আন্দোলনই জার্মান চিরায়ত দর্শনের উত্তরাধিকারী।

১৮৮৬ সালের গোড়ায় লিখিত

Die Neue Zeit পত্রিকার ৪ ও ৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে এবং স্বতন্ত্র পুস্তক হিশেবে প্রকাশিত হয় স্টুটগার্টে, ১৮৮৮ সালে

জার্মান থেকে ইংরেজী অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ফ্লোরেন্স কেলি-ভিশনেভেৎস্কায়া সমীপে

নিউ ইয়র্কে

লণ্ডন, ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৬

...গত দশ মাসে মার্কিন মেহনতী মানুষ যে বিরাট অগ্রগতি করেছে, আমার ভূমিকা* অবশ্যই পুরোপুরি তার প্রতি নিবদ্ধ হবে এবং স্বভাবতই হেনরি জর্জ ও তাঁর জমি সংক্রান্ত পরিকল্পনাকেও ছুঁয়ে যাবে। কিন্তু বিস্তারিতভাবে তা নিয়ে আলোচনা করার ভঙ্গি তা করতে পারে না। তার সময় হয়েছে বলেও আমি মনে করি না। অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে আন্দোলন শুরু থেকেই তত্ত্বগতভাবে একেবারে সঠিক খাতে আরম্ভ হওয়া ও এগিয়ে চলার চাইতে বরং আন্দোলন ছড়িয়ে পড়া উচিত, সুসমঞ্জসভাবে অগ্রসর হয়ে দৃঢ়মূল হওয়া উচিত এবং যথা সম্ভব সমগ্র মার্কিন প্রলেতারিয়েতকে তার আওতায় আনা উচিত। নিজের ভুলভ্রান্তি থেকে শেখার চাইতে, তিক্ত অভিজ্ঞতায় শেখার চাইতে অনুধাবনের তত্ত্বগত স্বচ্ছতার শ্রেয়তর পথ আর নেই। আর গোটা একটা বিরাট শ্রেণীর পক্ষে অন্য কোনো পথ নেই, বিশেষ করে মার্কিনদের মতো এমন বিশেষ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ও তত্ত্ব সম্পর্কে এমন অবজ্ঞাপূর্ণ একটি জাতির পক্ষে। বিরাট জিনিসটি হল শ্রমিক শ্রেণীকে একটি **শ্রেণী হিশেবে** চলতে দেওয়া; একবারও তা অর্জিত হলে তারা অচিরেই দেখতে পাবে সঠিক গতিমুখটিকে, আর যারা প্রতিরোধ করে, সেই হেনরি জর্জ বা পাওডারলি, তাদের নিজেদের ছোট ছোট গোষ্ঠী নিয়ে পড়ে থাকবে অসহায় অবস্থায়। সুতরাং আমি এই আন্দোলনে 'নাইটস অব লেবার'কেও (১২২) অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে

---

* ফ. এঙ্গেলস, 'আমেরিকায় শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন। 'ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' গ্রন্থের মার্কিন সংস্করণের ভূমিকা'। — সম্পাঃ

মনে করি, এই আন্দোলনকে বাইরে থেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়, বরং ভিতর থেকে বৈপ্লবিক করে তোলা উচিত, এবং আমি মনে করি যে, আমেরিকায় বসবাসকারী জার্মানদের অনেকেই যে বলিষ্ঠ ও গৌরবময় আন্দোলন তাঁদের সৃষ্টি নয় তার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের আমদানি-করা ও সর্বদা বোধ্যগম্য নয় এমন তত্ত্বকে একধরনের alleiuseligmachendes Dogma* করে তুলতে চেষ্টা করে, এবং যে আন্দোলন সেই গোঁড়া মতবাদকে গ্রহণ করে নি এমন যে কোনো আন্দোলন থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে মারাত্মক ভুল করেছিলেন। আমাদের তত্ত্ব গোঁড়া মতবাদ নয়, বরং বিবর্তনের এক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা, আর সেই প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক কতকগুলি পর্যায় জড়িত। প্রধানতর শিল্পোন্নত দেশগুলিতে তৈরি তত্ত্ব সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতনতা নিয়ে মার্কিনরা শুরু করবে, এমন প্রত্যাশা করা অসম্ভবেরই প্রত্যাশা করা। জার্মানদের যেটা করা উচিত তা হল তাঁদের নিজেদের তত্ত্ব অনুসারে কাজ করে — ১৮৪৫ ও ১৮৪৮ সালে আমরা যেমন বুঝেছিলাম তাঁরা যদি তা তেমন করে বোঝেন — যে কোনো প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়া, তার faktische** যাত্রাস্থলটি যেমন, তেমনভাবেই তাকে গ্রহণ করা এবং প্রত্যেকটি ভুল, প্রত্যেকটি বিপর্যয় কীভাবে মূল কর্মসূচির ভ্রান্ত তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিণতি ছিল তা দেখিয়ে তাকে ক্রমে ক্রমে তত্ত্বগত স্তরে তুলে আনা: তাঁদের উচিত, 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর ভাষায়, বর্তমানের আন্দোলনের মধ্যে সেই আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করা।*** কিন্তু সর্বোপরি আন্দোলনকে সংহত হওয়ার সময় দিন; জনগণ বর্তমানে যেসব জিনিস যথাযথভাবে বুঝতে পারে না, কিন্তু অচিরেই বুঝতে শিখবে সেসব জিনিস জোর করে জনগণের গলাধঃকরণ করিয়ে প্রথম আরম্ভের বিশৃঙ্খলাকে আরো বেশি জট পাকিয়ে তুলবেন না। মতবাদের দিক দিয়ে নিখুঁত একটা মঞ্চের সপক্ষে এক লক্ষ ভোটের চাইতে আগামী নভেম্বর মাসে প্রকৃত এক শ্রমিক পার্টির সপক্ষে দশ বা কুড়ি লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের ভোট বর্তমানে অপরিসীমভাবে অনেক বেশি মূল্যবান। চলমান জনসাধারণকে

* একমাত্র রক্ষাকারী গোঁড়া মতবাদ। — সম্পাঃ

** প্রকৃত। — সম্পাঃ

*** এই সংস্করণের ১ খণ্ড, ১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

জাতীয় ভিত্তিতে সংহত করার প্রথম প্রচেষ্টাই — আন্দোলনের অগ্রগতি হলে শীঘ্রই তা করতে হবে — মুখোমুখি নিয়ে আসবে তাঁদের সবাইকে — জর্জপন্থী, 'নাইটস অব লেবার', ট্রেড ইউনিয়নিস্ট এবং সকলকে; আর আমাদের জার্মান বন্ধুরা যদি তার মধ্যে আলোচনার প্রবৃত্ত হওয়ার মতো দেশের ভাষা যথেষ্ট শিখে থাকেন, তাহলে তখন তাঁদের সময় আসবে অপরের অভিমতের সমালোচনা করার এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের অসঙ্গতি তুলে ধরে তাঁদের ক্রমে ক্রমে নিজেদের প্রকৃত অবস্থা, পুঁজি এবং মজুরি-শ্রমের পরস্পরসম্পর্ক তাঁদের জন্য যে অবস্থা তৈরি করে দিয়েছে তা উপলব্ধি করাবেন। কিন্তু শ্রমিক পার্টির সেই জাতীয় সংহতিকে — তা যে মঞ্চেই হোক না কেন — বিলম্বিত বা রোধ করতে পারে এমন সবকিছুকেই আমি বিরাট ভুল বলে মনে করি, এবং তাই হেনরি জর্জ কিংবা 'নাইটস অব লেবার' কারও সম্পর্কেই সম্পূর্ণরূপে ও বিশদভাবে কিছু বলার মতো সময় হয়েছে বলে আমি মনে করি না...

পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী মুদ্রিত ইংরেজী থেকে অনূদিত

টীকা

(১) **'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'** নামক এঙ্গেলসের বইটি হল 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' থেকে নেওয়া তিনটি অধ্যায়ের সমষ্টি। কিছু অদল-বদল করে এটি লেখা হয়েছে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে: তা হল মার্কসীয় শিক্ষাকে অখণ্ড এক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি রূপে জনবোধ্য আকারে শ্রমিকদের কাছে হাজির করা। এই বইটিতে এঙ্গেলস মার্কসবাদের তিনটি অঙ্গের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এটিতে দেখিয়েছেন, কেমন করে গড়ে উঠেছে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, এবং কেমন করে মার্কসের দুটি মহান আবিষ্কার ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা বিশদীকরণ ও বাড়তি মূল্য সৃষ্টির কল্যাণেই সমাজতন্ত্র এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লাভ করেছে।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলি দেখিয়ে, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও তার ভুলত্রুটি নির্দেশ করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র উৎপত্তির বিভিন্ন পূর্বশর্তের বিশেষত্বের ব্যাখ্যা করেন এঙ্গেলস।

এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে এঙ্গেলস প্রমাণ করেন যে, পুঁজিতন্ত্রের প্রধান দ্বন্দ্বটি — উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর পুঁজিবাদী মালিকানার মধ্যেকার দ্বন্দ্বটি — দূর করা যেতে পারে কেবলমাত্র প্রলেতারীয় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

পৃঃ ৭

(২) **আইজেনাখপন্থী এবং লাসালপন্থী** — উনিশ শতকের ৬০-এর ও ৭০-এর বছরগুলির গোড়ার দিকে জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের দুটি পার্টি।

আইজেনাখপন্থী — ১৮৬৯ সালে আইজেনাখে উদ্বোধনী কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সদস্যরা।

লাসালপন্থী — জার্মান পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী ফ. লাসালের সমর্থক ও অনুগামীরা; ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত সারা-জার্মান শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য

ছিল তারা। সর্বজনীন ভোটাধিকার ও শান্তিপূর্ণ সংসদীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য সংগ্রামের মধ্যে নিজ উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ রেখে এই ইউনিয়ন সুবিধাবাদী রাজনীতি অনুসরণ করত।

১৮৭৫ সালের ২২-২৭ মে-তে গোথায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে এই দুই ধারার মিলন ঘটে। মিলিত এই পার্টির নাম হয় জার্মানির সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি। পৃঃ ৭

(৩) **দ্বিধাতুমান** (Bimetallism) —একটি মুদ্রা-ব্যবস্থা, যাতে মুদ্রার কাজ সম্পাদন করে দুটি মূল্যবান ধাতু — সোনা আর রুপো। পৃঃ ৮

(৪) *Vorwärts* ('আগুয়ান') — জার্মানির সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র, ১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত লাইপজিগে প্রকাশিত। পৃঃ ৮

(৫) **'মার্ক'** — প্রাচীন জার্মান লোকসমাজ। 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' বইয়ের প্রথম জার্মান সংস্করণের ক্রোড়পত্র হিশেবে 'মার্ক' শিরোনামে প্রাচীন কাল থেকে জার্মান কৃষককুলের ইতিহাস সম্বন্ধে এঙ্গেলস একটা সংক্ষিপ্ত খসড়া রচনা করেছিলেন। পৃঃ ৯

(৬) **অজ্ঞেয়বাদ** *(Agnosticism)* — গ্রীক উপসর্গ a — না; এবং gnosis — **জ্ঞান** থেকে। এই ভাববাদী দার্শনিক তত্ত্বে বলা হয় জগৎ অজ্ঞেয়, মানুষের মন সীমাবদ্ধ এবং অনুভূতির এলাকার বাইরে তা কিছু জানতে পারে না। পৃঃ ১০

(৭) **স্কলাস্টিক** — মধ্য যুগের স্কুলে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া ধর্মীয়-ভাববাদী দর্শনের ভিতরে আধিপত্যকারী ধারাগুলির একটি সাধারণ নাম।

স্কলাস্টিক দর্শন প্রকৃতি আর পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা অধ্যয়ন করে না এবং খ্রীষ্টান চার্চের উপদেশবাক্যের উপর ভিত্তি করে তার সাধারণ নীতি থেকে বুদ্ধিমত্তার নির্দিট সিদ্ধান্ত নেয় এবং মানুষের আচরণ নির্ধারণের চেষ্টা করে। পৃঃ ১১

(৮) **ধর্মতত্ত্ব** (Theology) — (গ্রীক থেকে আক্ষরিক অর্থে অনুবাদ করলে অর্থ হয় **ঈশ্বরচর্চা**) — ধর্মীয় শিক্ষা, যা কিনা এক পদ্ধতি রূপে এবং ধর্মীয় নৈতিকতা, উপদেশ-বাক্য আর ধর্মমতের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠার প্রয়াস পেয়েছিল। পৃঃ ১১

(৯) **নামবাদী** — মধ্যযুগীয় দর্শনের একটি মতধারার প্রতিনিধি; আলোচ্য দর্শনটি

এই মত পোষণ করত যে, সাধারণ ধারণাগুলো হল শুধু নাম, যা দিয়ে মানুষের চিন্তা ও ভাষার ব্যাখ্যা দেওয়া চলে এবং যা কিনা কেবলমাত্র আলাদা আলাদা বস্তুর রূপ নির্ধারণের পক্ষে উপযোগী। মধ্যযুগীয় বাস্তববাদীদের সঙ্গে নামবাদীদের পার্থক্য হল এই যে, শেষোক্তরা বস্তুর আদিরূপ ও গঠনমূলক উৎস হিশেবে ধারণার অস্তিত্বকে অস্বীকার করত। অর্থাৎ কিনা, তারা বস্তুকে মুখ্য এবং ধারণাকে গৌণ বলে বিবেচনা করত। এই অর্থে নামবাদ ছিল মধ্য যুগে বস্তুবাদের প্রথম প্রকাশ। পৃঃ ১১

(১০) Homoioméreia — প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক আনাক্সেইগরসের শিক্ষানুসারে অতি ক্ষুদ্র নির্দিষ্ট বস্তুময় কণিকা সীমাহীনভাবে বিভাজনযোগ্য। আনাক্সেইগরসের মতে হোমিওমিরিয়ে সমগ্র অস্তিত্বের আদি ভিত্তি এবং তা দিয়েই বিভিন্ন বস্তু গঠিত। পৃঃ ১১

(১১) **আস্তিক্যবাদ** (Theism) — ধর্মীয়-দার্শনিক শিক্ষা; এটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিশেবে, অতি বুদ্ধিমান আর ধরা-ছোঁয়ার নাগালের বাইরের এক অস্তিত্ব হিশেবে, সৃষ্টিকর্তা হিশেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। আস্তিক্যবাদের শিক্ষানুসারে ঈশ্বর সক্রিয়ভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক জীবনে অংশ নিয়ে থাকেন। পৃঃ১৩

(১২) **ইন্দ্রিয়বাদ** — জ্ঞানতত্ত্বের বিশেষ এক ধারা, তাতে ইন্দ্রিয়ই হল জ্ঞানের মুখ্য উপায়। পৃঃ ১৩

(১৩) **ডীইজম** (Deism) — সাকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত ভাব-ধারণা প্রত্যাখ্যানকারী দর্শন, যাতে ঈশ্বরকে জগতের নিরাকার আদি হেতু বলে ধরা হত। পৃঃ ১৩

(১৪) এখানে ১৮৫১ সালের মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত লণ্ডনে অনুষ্ঠিত প্রথম সারা-বিশ্ব বাণিজ্য ও শিল্প প্রদর্শনীর কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৪

(১৫) **ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় চার্চ (অ্যাংলিকান চার্চ)** — ১৬শ শতকের পোপের সঙ্গে ইংরেজ রাজবংশের সংঘর্ষের সময়ে উদ্ভূত হয়।

ইংলণ্ডের রাজা চার্চের প্রধান। ১৭শ শতকের গোড়া থেকে এটা ইংলণ্ডের রাজনৈতিক জীবনে রক্ষণশীল ধারণা সমর্থন করে। পৃঃ ১৪

(১৬) **ব্যাপটিস্টবাদ** — প্রটেস্টাণ্টবাদের রকমফের, উদ্ভূত হয় ১৭শ শতকের গোড়ায়। ধর্ম ও চার্চ সংগঠনের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন ব্যাপটিস্টরা সরল করেছিল; ধর্মদীক্ষা দেওয়া হত কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের। পৃঃ ১৪

(১৭) **'স্যালভেশন আর্মি'** — প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় এবং লোকহিতৈষী সংস্থা, ১৮৬৫ সালে ইংলণ্ডে গঠিত হয় এবং ১৮৮০ সালে সামরিক ধরনে এর পুনর্সংগঠনের

পর এই নাম দেওয়া হয়। বুর্জোয়াদের বিস্তৃত সমর্থন লাভ করে এই সংস্থা শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে শ্রমজীবী জনগণের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে নিজ জাল বিস্তার করে। পৃঃ ১৪

(১৮) **অধ্যাত্মবাদ** (ল্যাটিন শব্দ spiritus, অর্থাৎ **আত্মা** থেকে) — অস্তিত্বের আদি হেতু রূপে আত্মাকে মুখ্য বলে মানা হয় ভাববাদী এই শিক্ষায়। অধ্যাত্মবাদীদের মতানুসারে দেহের উপর নির্ভর না করে আত্মা একেবারে স্বতন্ত্রভাবে অনন্তকাল ধরে বিরাজ করছে। পৃঃ ১৭

(১৯) **ধর্ম-সংস্কার** — ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে বিপুল এক সামাজিক আন্দোলন; ১৬শ শতকে এটি ছড়িয়ে পড়েছিল জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ইংলন্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য বহু দেশে। যেসমস্ত দেশে এই রিফর্মেশন জয় লাভ করে, সেখানে এই সংস্কারের ধর্মীয় উত্তরাধিকার হিশেবে বহু নতুন ও তথাকথিত প্রটেস্টান্ট চার্চ গড়ে ওঠে (ইংলন্ডে, স্কটল্যান্ডে, নেদারল্যান্ডে, জার্মানি আর স্ক্যানডি-নেভিয়ান দেশগুলির কয়েকটি অঞ্চলে)। পৃঃ ২০

(২০) **'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব'** —১৬৮৮ সালের কু'দেতাটিকে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা এই নামে অভিহিত করেন; এর ফলে ইংলন্ডে স্টুয়ার্টের সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ভূস্বামী-অভিজাত শ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে উইলিয়ম অভ অরেঞ্জের নেতৃত্বে সংবিধানসম্মত রাজ (১৬৮৯) প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃঃ ২১

(২১) **সাদা ও লাল গোলাপের যুদ্ধ** (১৪৫৫-১৪৮৫) — এখানে সিংহাসনের জন্য সংগ্রামরত ইংলন্ডের সামন্তকুলের দুই প্রতিনিধির মধ্যেকার যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে; এই কুলদ্বয়ের একটি হল ইয়র্করা, যাদের প্রতীকচিহ্নে অঙ্কিত ছিল সাদা গোলাপ, আর ল্যাঙ্কেস্টারদের প্রতীকচিহ্নে ছিল লাল গোলাপ। ইয়র্কদের চারিপাশে দলবদ্ধ হয়েছিল দক্ষিণের অধিকতর বিত্তশালী বৃহৎ সামন্তদের এক অংশ, নাইট-সম্প্রদায় এবং শহুরে জনগণ; ল্যাঙ্কেস্টারদের সমর্থনে ছিল উত্তরের জমিদার-সম্প্রদায়ের অভিজাত সামন্তসমাজ। এই যুদ্ধের ফলে পুরনো সামন্ত পরিবারগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং যুদ্ধান্তে ক্ষমতায় আসে নতুন টিউডর বংশ, যার ফলে ইংলন্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র। পৃঃ ২২

(২২) **কার্থেজিয়ান দর্শন** (Cartesius) — ১৭শ শতকের ফরাসী দার্শনিক দেকার্তের অনুগামীদের শিক্ষা; তাঁরা তাঁর দর্শন থেকে বস্তুবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পৃঃ ২২

(২৩). **'মানবিক ও নাগরিক অধিকার ঘোষণাপত্র'** — এই বিলটি সংবিধান-সভা কর্তৃক গৃহীত হয় ১৭৮৯ সালে। এতে বর্ণিত হয়েছিল নতুন বুর্জোয়া ব্যবস্থার

রাজনৈতিক নীতিসমূহ। ১৭৯১ সালে ফরাসী সংবিধানে ঘোষণাটি সংযুক্ত হয়েছিল; এর উপরেই ভিত্তি করে ১৭৯৩ সালে জ্যাকোবিন 'মানবিক ও নাগরিক অধিকার ঘোষণাপত্র' নামের বিলটি রচিত হয়েছিল, যেটি ১৭৯৩ সালে জাতীয় কনভেনশন কর্তৃক গৃহীত ফ্রান্সের প্রথম রিপাবলিকান সংবিধানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। পৃঃ ২৪

(২৪) 'Code Civil'—এখানে এবং অন্যত্র উল্লিখিত **নেপোলিয়নের বিধির** মাধ্যমে এঙ্গেলস কেবল একটিমাত্র দেওয়ানী বিধি, তথা ১৮০৪ সালে প্রথম নেপোলিয়নের রাজত্বকালে গৃহীত ও 'নেপোলিয়নের বিধি' নামে খ্যাত বিধিটিরই উল্লেখ করছেন না, বরং তা উল্লেখ করছেন ব্যাপক অর্থে, অর্থাৎ ১৮০৪-১৮১০ সালে প্রথম নেপোলিয়নের রাজত্বকালে গৃহীত পাঁচটি বিধির (দেওয়ানী, দেওয়ানী-মোকদ্দমামূলক, বাণিজ্যিক, ফৌজদারি এবং ফৌজদারি-মোকদ্দমামূলক) বুর্জোয়া অধিকারের সমগ্র ব্যবস্থার। নেপোলিয়নের ফ্রান্স কর্তৃক বিজিত জার্মানির পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলগুলিতে এই বিধিসমূহ চালু করা হয়েছিল এবং ১৮১৫ সালে রাইন প্রদেশ প্রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পরেও ওই অঞ্চলে এই বিধিগুলি কার্যকর ছিল। পৃঃ ২৪

(২৫) এখানে **নির্বাচনী আইন সংস্কার** সম্পর্কে বলা হচ্ছে; এ সম্পর্কে বিলটি ইংলন্ডের সাধারণ সভায় গৃহীত হয় ১৮৩১ সালে এবং ১৮৩২ সালের জুনে লর্ডস-সভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। এই সংস্কারটি শিল্প-বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিবৃন্দের পার্লামেন্টে প্রবেশের পথ খুলে দেয়। এই সংস্কারের জন্য সংগ্রামের প্রধান শক্তি প্রলেতারিয়েত ও পেটি বুর্জোয়ারা উদারপন্থী বুর্জোয়াগণ কর্তৃক প্রতারিত হয় এবং নির্বাচনী অধিকার লাভে বঞ্চিত হয়। পৃঃ ২৬

(২৬) এখানে শস্য আইন নাকচ সংক্রান্ত ইংলন্ডের পার্লামেন্ট কর্তৃক ১৮৪৬ সালের জুনে গৃহীত বিলের কথা বলা হচ্ছে। বিদেশ থেকে শস্যের আমদানি সীমিত অথবা নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তথাকথিত এই **শস্য আইনটি** ইংলন্ডে প্রবর্তিত হয় বৃহৎ ভূস্বামী আর জমিদারদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে। ১৮৪৬ সালে এই বিলটি গৃহীত হবার ফলেই শিল্প-বুর্জোয়াদের বিজয় সূচিত হয়, তারাই অবাধ বাণিজ্যের স্লোগান তুলে শস্য আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছিল। পৃঃ ২৬

(২৭) শ্রমিকদের বিপুল আন্দোলনের চাপে পড়ে ১৮২৪ সালে ইংলন্ডের পার্লামেন্ট শ্রমিকদের সমিতি (ট্রেড ইউনিয়ন) নিষিদ্ধ করার নীতি নাকচ করে এক আইন প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়। পৃঃ ২৭

(২৮) **জনগণের সনদ** — চার্টিস্টদের দাবি সহ পার্লামেণ্টে বিবেচনার উদ্দেশ্যে খসড়া আইন হিশেবে এটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ সালের ৮ মে; এতে ছিল মোট ছ'টি দফা: সার্বজনীন ভোটাধিকার (২১ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের জন্য), প্রতিবছর পার্লামেণ্টের নির্বাচন, গোপন ভোটব্যবস্থা, ভোটকেন্দ্রের সমতাবিধান, পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হতে আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য আবশ্যক সম্পত্তির শর্ত নাকচ করা, পার্লামেণ্ট-সদস্যদের বেতন দেওয়া। জনগণের সনদটি গ্রহণ করার দাবি জানিয়ে পার্লামেণ্টের দরবারে চার্টিস্টরা মোট তিনটি আবেদন পেশ করে, কিন্তু প্রতিবারই, যথাক্রমে ১৮৩৯, ১৮৪২ ও ১৮৪৯ সালে পার্লামেণ্ট কর্তৃক তা অগ্রাহ্য হয়। পৃঃ ২৭

(২৯) **শস্য আইনবিরোধী লীগ** — ইংরেজ শিল্প-বুর্জোয়াদের একটি সংগঠন, ১৮৩৮ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের কারখানা-মালিক কবডেন ও ব্রাইট এর প্রতিষ্ঠা করেন। অবাধ বাণিজ্যের দাবি তুলে লীগ শস্য নিয়ন্ত্রণ আইন রদের চেষ্টা করে, যাতে শ্রমিকদের মজুরি কমানো যায় এবং ভূমি-সম্পত্তির মালিক অভিজাতদের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক অবস্থান দুর্বল করা যায়। শস্য আইন রদের পর (১৮৪৬) লীগের অস্তিত্ব লোপ পায়। পৃঃ ২৭

(৩০) এখানে ১৮৪৮ সালের ১০ এপ্রিল লণ্ডনে চার্টিস্টদের আয়োজিত বিরাট গণ-মিছিলের কথা বলা হচ্ছে; এটি আয়োজিত হয়েছিল জনগণের সনদ গ্রহণ সম্পর্কে এক আবেদন-পত্র পার্লামেণ্টে পেশ করার উদ্দেশ্যে। সংগঠকদের কঠিন মনোবলের অভাব ও দোদুল্যমানতার ফলে এটি ব্যর্থ হয়। এই মিছিলের ব্যর্থতাকে শ্রমিকদের উপর হামলা আর চার্টিস্টদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অস্ত্র হিশেবে ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা। পৃঃ ২৭

(৩১) এখানে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর লুই বোনাপার্ট কর্তৃক সংগঠিত রাষ্ট্রীয় কু'দেতার কথা বলা হচ্ছে; এর ফলে সূচিত হয় বোনাপার্ট শাসনের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের কাল। পৃঃ ২৭

(৩২) **'জোনাথান ভাই'** — ইংলণ্ডের উত্তর আমেরিকা উপনিবেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় (১৭৭৫-১৭৮৩) ইংরেজরা উত্তর আমেরিকাবাসীদের এই বিদ্রূপাত্মক নাম দেয়। পৃঃ ২৮

(৩৩) **রিভাইভ্যালিজ্‌ম্‌** — প্রটেস্টাণ্ট চার্চের একটি ধারা। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংলণ্ডে এর উদ্ভব হয় এবং পরে উত্তর আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে; ধর্মীয় প্রচার আর ঈশ্বরে বিশ্বাসী নতুন নতুন গোষ্ঠী গড়ে তোলার মাধ্যমে এর অনুগামীরা খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব সংহত ও বিস্তারের চেষ্টা করে। পৃঃ ২৮

(৩৪) ১৮৬৭ সালে ইংলন্ডে ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের চাপে **দ্বিতীয় সংসদীয় সংস্কার** সাধিত হয়। এই সংস্কারের জন্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেয় প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ। সংস্কারের ফলে ইংলন্ডে ভোটদাতাদের সংখ্যা দু'গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়, বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকদের বিপুল অংশও ভোটাধিকার লাভ করে। পৃঃ ৩০

(৩৫) **হুইগ ও টোরি** — ১৭শ শতকের ৮ম-৯ম দশকে গঠিত ইংলন্ডের রাজনীতিক পার্টি। হুইগ পার্টি পুঁজিপতিগোষ্ঠী আর ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের এবং সেইসঙ্গে 'বুর্জোয়া-বনে-যাওয়া' অভিজাতদের একাংশের স্বার্থ প্রকাশ করে। হুইগরাই লিবারেল (উদারনৈতিক) পার্টি সূচনা করে। টোরি পার্টি প্রতিনিধিত্ব করে বড়ো বড়ো জমিদার আর অ্যাংলিকান চার্চের যাজকমণ্ডলীর শীর্ষব্যক্তিদের; পরে তারাই কনসারভেটিভ (রক্ষণশীল) পার্টির সূচনা করে। পৃঃ ৩০

(৩৬) গোপন ব্যালট পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয় ১৮৭২ সালে। পৃঃ ৩৫

(৩৭) **ক্যাথিডার-সোশ্যালিজম** — ১৯শ শতকের অষ্টম-শেষ দশকের বুর্জোয়া ভাবাদর্শের একটি ধারা, এর প্রতিনিধিরা, সর্বপ্রথমে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপকরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা-মঞ্চ (জার্মান ভাষায় Katheder, এ থেকেই নাম) থেকে সমাজতন্ত্রের ছদ্মবেশে বুর্জোয়া সংস্কারবাদ প্রচার করেন। ক্যাথিডার-সোশ্যালিস্টরা বলেন যে, রাষ্ট্র হল শ্রেণী-উর্ধ্ব একটি প্রতিষ্ঠান, যা বৈর শ্রেণীগুলির মধ্যে শান্তি স্থাপনে এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থে ঘা না দিয়ে ধীরে ধীরে 'সমাজতন্ত্র' চালু করতে সক্ষম। ক্যাথিডার-সোশ্যালিজমের কর্মসূচি ছিল শ্রমিকদের রোগ আর দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে বীমার ব্যবস্থা করা, কারখানার আইন-কানুন গঠন, ইত্যাদি কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা। ক্যাথিডার-সোশ্যালিস্টরা মনে করতেন যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি যদি খুব ভালভাবে সংগঠিত থাকে, তাহলে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক পার্টির প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। ক্যাথিডার-সোশ্যালিজম ছিল সংশোধনবাদী ভাবাদর্শের অন্যতম উৎসস্বরূপ। পৃঃ ৩১

(৩৮) **পুজার্চনা** (অধিকতর প্রচারিত নাম হল — পিউজিইজম্) — অ্যাংলিকান চার্চের মধ্যেকার একটি ধারা, উদ্ভব হয় ১৯ শতকের ৩০-এর বছরগুলিতে; অ্যাংলিকান চার্চের মধ্যে ক্যাথলিক ধর্মাচার (এর থেকেই এই নামের উৎপত্তি) ও ক্যাথলিকবাদের অন্য কিছু রীতিনীতি পুনঃপ্রবর্তনের ডাক দেয় এই ধারার অনুগামীরা। পৃঃ ৩১

(৩৯) **ইস্ট-এন্ড** — লন্ডনের পূর্বাঞ্চল, শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা। পৃঃ ৩৩

(৪০) সমস্ত অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশে কেবল যুগপৎই প্রলেতারীয় বিপ্লব সমাধা হতে পারে, অতএব একটিমাত্র দেশে বিপ্লবের বিজয় অসম্ভব — এই সিদ্ধান্তটি সুসম্পূর্ণভাবে রূপ লাভ করে ১৮৪৭ সালে এঙ্গেলসের 'কমিউনিজমের মূল উপাদানসমূহ' (বর্তমান সংস্করণের ১ খন্ড, ১০৬-১২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) নামক রচনায়; এই সিদ্ধান্তটি ঠিক ছিল প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের কালে। নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের কালে, ভ. ই. লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিতন্ত্রের অসম অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেন এবং সেখান থেকে এগিয়ে নতুন সিদ্ধান্তে পেঁছান: একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের আমলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় প্রথমে কয়েকটি, এমনকি একটিমাত্র দেশেও সম্ভব এবং সব দেশে অথবা বেশির ভাগ দেশে বিপ্লবের যুগপৎ বিজয় অসম্ভব। এই থিসিস প্রথম তুলে ধরা হয় ভ. ই. লেনিনের 'ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র স্লোগান প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে (১৯১৫)। পৃঃ ৩৩

(৪১) **সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন** জার্মানিতে জারি করা হয় ১৮৭৮ সালের ২১ অক্টোবর। আইনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমস্ত সংস্থা, বড়ো বড়ো শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হয়, বাজেয়াপ্ত করা হয় সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের উপর চালানো হয় নির্যাতন। ১৮৯০ সালের ১ অক্টোবর বিপুল শ্রমিক আন্দোলনের চাপে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন রদ করা হয়। পৃঃ ৩৬

(৪২) রুসোর তত্ত্বানুসারে প্রথম প্রথম মানুষ বাস করত একেবারে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে, যেখানে সকলেই ছিল সমান। ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং সম্পত্তির ক্ষেত্রে অসমতা দেখা দেওয়ার ফলে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশ ছেড়ে নাগরিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস শুরু করে এবং এরই ফলে দেখা দেয় রাষ্ট্র, যা কিনা গড়ে উঠেছিল সামাজিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে। কিন্তু ভবিষ্যতে রাজনৈতিক অসমতা উদ্ভূত হবার ফলে সামাজিক এই বোঝাপড়া লঙ্ঘন করা হয় এবং অধিকারহীনতার এক নতুন পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়। শেষোক্ত এই ব্যাপারটির বিলোপসাধনের ডাক দেয় আরো উন্নত এক রাষ্ট্র, যা কিনা গড়ে উঠেছিল নতুন সামাজিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে। পৃঃ ৩৬

(৪৩) **আনাব্যাপটিস্টরা** অথবা পুনঃক্রসপন্থীরা — এই সম্প্রদায়ের সদস্যদের এই নামকরণ হয়েছিল এই কারণে যে, তারা প্রাপ্তবয়স্ক লোকেদের পুনরায় ক্রস করার (ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার) পক্ষপাতী ছিল। পৃঃ ৩৭

(৪৪) এঙ্গেলস এখানে **'সাচ্চা লেভেলারদের'** ('সমতাবাদী') অথবা 'ডিগেরদের ('অনুসন্ধানকারীদের') কথা বলছেন। এরা ছিল ১৭শ শতকের ইংরেজ বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়কার উগ্র বামপন্থী ধারার প্রতিনিধি। এরা গ্রাম ও শহরের গরীবতম স্তরের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করত। তারা জমির উপর মালিকানা বিলোপসাধনের দাবি উত্থাপন করেছিল, সেকেলে ঢালাও সমতাবাদী কমিউনিজমের সমর্থনে প্রচারকার্য চালিয়েছিল এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর জমিতে যৌথভাবে হাল কর্ষণের মাধ্যমে তাদের ভাবধারাগুলি বাস্তবায়িত করার প্রয়াস পেয়েছিল। পৃঃ ৩৭

(৪৫) এঙ্গেলস সর্বাগ্রে এখানে ইউটোপীয় কমিউনিজমের প্রতিনিধিবৃন্দ তথা ত. মোরের 'ইউটোপিয়া' এবং ত. কাম্পানেলার 'সূর্য শহর' নামক গ্রন্থদ্বয়ের কথা বলছেন। পৃঃ ৩৭

(৪৬) **জ্ঞানপ্রচারকরা** — ১৮শ শতকের ফ্রান্সের সামাজিক-রাজনৈতিক একটি ধারার প্রতিনিধিরা। মঙ্গল, ন্যায় আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রচারের মাধ্যমে তাঁরা সমাজের দোষ-ত্রুটি দূর করার, প্রচলিত রীতি ও রাজনীতি পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালান। ফরাসী জ্ঞানপ্রচারক ভল্টেয়র, রুসো, ম'তেস্কোর ক্রিয়াকলাপে ধর্মীয়-সামন্ততান্ত্রিক মতধারার প্রভাব হটাতে বহুল পরিমাণে সহায়তা করে, জ্ঞানপ্রচারকরা শুধু যে চার্চের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তাই নয়, একাধারে তাঁরা চার্চের রীতিনীতি, চিন্তাভাবনার স্কলাস্টিক ধারার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। পৃঃ ৩৮

(৪৭) **'সন্ত্রাসের শাসন'** -- জ্যাকোবিনদের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের পর্যায় (জুন ১৭৯৩ — জুলাই ১৭৯৪) (৭৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩৮

(৪৮) **ডিরেক্টরেট** (মোট পাঁচ জন সভাপতিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল, যাদের একজনকে নির্বাচিত করা হত প্রতি বছরে) — ১৭৯৫-১৭৯৯ সালে ফ্রান্সে কার্যনির্বাহী ক্ষমতার পরিচালন সংস্থা; গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক নীতিকে সমর্থন জানাত এবং বড়ো বড়ো বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা করত। পৃঃ ৩৮

(৪৯) এখানে ১৮শ শতকের শেষ ভাগের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের এই সূত্রবাণীর কথা বলা হচ্ছে: 'স্বাধীনতা, সমতা, সৌভ্রাত্র্য'। পৃঃ ৩৯

(৫০) **নিউ ল্যানার্ক** (New Lanark) — স্কট্ল্যাণ্ডের ল্যানার্ক শহরের অদূরে অবস্থিত সুতাকল, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৪ সালে। কারখানা সংলগ্ন অঞ্চলে ছোট্ট একটি বসতিও ছিল। পৃঃ ৪০

(৫১) ফ্রান্স-বিরোধী ষষ্ঠ যুক্তফ্রন্টে অংশগ্রহণকারী দেশের (রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ইংলন্ড, প্রাশিয়া এবং অন্যান্য রাষ্ট্র) সম্মিলিত সেনাবাহিনী প্যারিসে প্রবেশ করে ১৮১৪ সালের ৩১ মার্চ। প্রথম নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, আর সিংহাসন হারানোর পর স্বয়ং নেপোলিয়ন বিতাড়িত হয়ে এলবা দ্বীপে নির্বাসিত হতে বাধ্য হন। ফ্রান্সে সেই প্রথম বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে।

একশ' দিন — প্রথম নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের স্বল্পকালীন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্ব, টিকে ছিল ১৮১৫ সালের ২০ মার্চ থেকে সেই বছরেরই ২২ জুন পর্যন্ত। ২০ মার্চ তিনি এলবা দ্বীপের নির্বাসন ছেড়ে প্যারিস প্রত্যাবর্তন করেন আর ২২ জুন তাঁকে দ্বিতীয় বারের জন্য সিংহাসন পরিত্যাগ করতে হয়। পৃঃ ৪৩

(৫২) **ওয়াটার্লুতে** (বেলজিয়ম) ১৮১৫ সালের ১৮ জুন ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে ইংরেজ-হল্যান্ড বাহিনী এবং ব্লুখেরের নেতৃত্বে প্রুশীয় সেনাবাহিনীর কাছে প্রথম নেপোলিয়ন বাহিনী পরাজিত হয়। ১৮১৫ সালের যুদ্ধে এ লড়াই চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে, এর ফলে ফ্রান্স-বিরোধী সপ্তম যুক্তফ্রন্টের (ইংলন্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন, স্পেন এবং অন্যান্য রাষ্ট্র) চূড়ান্ত জয় ও নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের পতন সম্ভব হয়ে ওঠে। পৃঃ ৪৩

(৫৩) ১৮৩৩ সালের অক্টোবর মাসে লন্ডনে ওয়েনের সভাপতিত্বে বিভিন্ন সমবায়-সমিতি ও ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় **ব্রিটেন এবং আয়ার্ল্যান্ডের শিল্পোৎপাদনমূলক মহান জাতীয় ঐক্যবদ্ধ ইউনিয়ন**। বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের তরফ থেকে কঠিন বাধা-বিপত্তি দেখা দেওয়ার ফলে ১৮৩৪ সালে আগস্টে এ ইউনিয়নের পতন ঘটে। পৃঃ ৪৮

(৫৪) এঙ্গেলস এখানে উৎপাদিত বিভিন্ন বস্তুর ন্যায্যজনক লেনদেনের জন্য গঠিত তথাকথিত বাজারের কথা বলছেন; এ বাজারগুলি শ্রমিকদের ওয়েনপন্থী সমবায়-সমিতির উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল ইংলন্ডের বিভিন্ন শহরে। এই সমস্ত বাজারে মাল লেনদেন করা হত মেহনত-নোটের সাহায্যে, যা গণনা করা হত এক ঘন্টার কাজ হিশেবে। এই সংগঠনগুলি অবশ্য অচিরেই দেউলিয়া হয়ে যায়। পৃঃ ৪৯

(৫৫) ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবের সময় প্রুধোঁ এক বিনিময়-ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার চেষ্টা চালান। ১৮৪৯ সালের ৩১ জানুয়ারি প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর 'Banque de peuple' ('জনগণের ব্যাঙ্ক')। এই ব্যাঙ্ক কোনরকমে টিকে ছিল

মাত্র দু'মাস, বাস্তবে এর ক্রিয়াকলাপ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এপ্রিল মাসের গোড়ায় ব্যাঙ্কটি বন্ধ হয়ে যায়। পৃঃ ৪৯

(৫৬) এখানে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত সময়কালের কথা বলা হচ্ছে। এই নামকরণটি হয়েছিল আলেকজেন্ড্রিয়া (ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত) নামক মিশরের এক শহরের নাম থেকে, যেটি তখন আন্তর্জাতিক লেনদেনের এক বিরাট কেন্দ্র ছিল। আলেকজেন্ড্রীয় সময়কালে বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি ঘটে, যার মধ্যে ছিল অঙ্কশাস্ত্র ও প্রযুক্তিবিদ্যা (ইউক্লিড ও আর্কিমিডিস), ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, চিকিৎসাবিদ্যা এবং অন্যান্য আরো। পৃঃ ৫১

(৫৭) এই আবিষ্কারগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল দুটি: ১৪৯২ সালে ক্রিস্টফার কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার এবং ১৪৯৮ সালে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা কর্তৃক ভারতের নৌপথ আবিষ্কার। পৃঃ ৬৬

(৫৮) এখানে বড়ো বড়ো বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মধ্যে ১৭শ ও ১৮শ শতকে যেসমস্ত যুদ্ধ ঘটে, তার কথা বলা হচ্ছে; এগুলি ঘটে ভারত ও আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং ঔপনিবেশিক বাজার হস্তগত করার জন্য। প্রথম প্রথম প্রতিযোগিতারত দেশগুলির মধ্যে প্রধান ছিল ইংলণ্ড এবং হল্যান্ড (ইংলণ্ড-হল্যান্ড বাণিজ্যিক যুদ্ধগুলি ঘটে ১৬৫২-১৬৫৪, ১৬৬৪-১৬৬৭, ১৬৭২-১৬৭৪ সালে)। পরে অবশ্য নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধ দেখা দেয় ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে। এই সমস্ত যুদ্ধে বিজয়ী হয় ইংলণ্ড, যার হাতে ১৮শ শতকের শেষে একত্রিত হয়েছিল প্রায় সমগ্র বিশ্ব বাণিজ্য। পৃঃ ৬৭

(৫৯) Seehandlung ('নৌ-বাণিজ্য')—১৭৭২ সালে প্রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত একটি বাণিজ্য ও অর্থ লেনদেন সমাজ। রাষ্ট্রীয় বহু বিশেষ-বিশেষ সুবিধার অধিকারী ছিল এবং সরকারকে তা বিপুল পরিমাণে কর্জ দিত। পৃঃ ৭৩

(৬০) ১৮৮১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ভ. ই. জাসুলিচ লিখিত পত্রের জবাব হিশেবে এইটিই ছিল মার্কসের প্রথম খসড়া। রাশিয়ায় পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যেসমস্ত তর্ক রুশ সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে চলত, সে ব্যাপারে 'পুঁজি' যে ভূমিকা পালন করেছে, সে প্রসঙ্গে জাসুলিচ সবকিছু এ পত্রের মাধ্যমে মার্কসকে জানান। তিনি তাঁর সহকর্মী তথা রুশ 'বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদের' তরফ থেকে তাঁকে অনুরোধ জানান তিনি যেন এ প্রসঙ্গে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন, বিশেষ করে গ্রাম-সমাজের প্রশ্নে। এ চিঠি যখন মার্কস পান, তখন তিনি 'পুঁজির' তৃতীয় খণ্ডের উপর কাজ করছিলেন। সেসময় তিনি রাশিয়ায় সামাজিক-অর্থনৈতিক

সম্পর্ক প্রসঙ্গে, রুশ গ্রাম-সমাজের অবস্থা ও অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে বহু পড়াশোনা করেন। আলোচ্য আবেদনটিতে যথার্থ সাড়া দিয়ে তিনি বহু অতিরিক্ত কাজ করেন এবং নানান উৎসের গভীর পড়াশোনা চালিয়ে এক সাধারণ মতবাদে আসেন এবং পরিশেষে তিনি এই সিদ্ধান্ত টানেন যে, 'অনিষ্টকর যে প্রভাব' চারিদিক থেকে যেভাবে রুশ সমাজকে গলা টিপে ধরেছে, তার থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র পথ হল পশ্চিম ইউরোপের প্রলেতারীয় বিপ্লব সমর্থিত রুশ গণ-বিপ্লবের পথ। পশ্চিম ইউরোপের প্রলেতারিয়েতদের বিজয়ের জন্য এক সফল পরিস্থিতি গড়ে তুলতে পারে রুশ বিপ্লব, অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপের প্রলেতারিয়েতরা আবার রাশিয়াকে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পথ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে। মার্কসের এ মতবাদের সঙ্গে অবশ্য রুশ সমাজতন্ত্রীদের কল্পনার কোনো মিল ছিল না। তাদের কল্পনা ছিল বৃহৎ শিল্পের বিকাশ না ঘটিয়েই গ্রাম-সমাজের সহায়তায় একেবারে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় লাফ দেওয়া। পৃঃ ৮৩

(৬১) ভূমিদাসপ্রথা রাশিয়ায় ১৮৬১ সালে রদ হয়। পৃঃ ৮৪

(৬২) খ্রীষ্টপূর্ব ৩২১ সালে 'কওদিন ফর্কসে' প্রাচীন রোমক শহর কওদিনের কাছে সামনাইটরা (মধ্য আপেনিজ পর্বতশ্রেণীর বসবাসকারীর এক গোষ্ঠী) রোমের এক সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে এবং 'জোয়াল-কাঁধে' তাদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে বাধ্য করে। পরাজিত সেনাবাহিনীর পক্ষে এ ব্যাপারটিকে সেসময় সর্বাপেক্ষা লজ্জার ঘটনা বলে মনে করা হত। আর ঠিক এখান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে 'কওদিন ফর্কস পরিক্রমা করা' কথাটি, অর্থাৎ কিনা যতদূর সম্ভব মাথা নত করা। পৃঃ ৮৯

(৬৩) *Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe* ('রাজনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত রাইন পত্রিকা') — দৈনিক সংবাদপত্র, কলোনে ১৮৪২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৮৪৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৪২ সালের এপ্রিল থেকে মার্কস এই সংবাদপত্রে লিখতেন, আর সেই বছরেরই অক্টোবর থেকে তার অন্যতম সম্পাদক; এঙ্গেলসও এই সংবাদপত্রে লিখতেন। পৃঃ ৯৭

(৬৪) *Vorwärts!* ('আগুয়ান!') — জার্মান সংবাদপত্র, ১৮৪৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহে দু'দিন করে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হত। এই সংবাদপত্রে লিখতেন মার্কস ও এঙ্গেলস। পৃঃ ৯৭

(৬৫) *Deutsche-Brüsseler-Zeitung* ('জার্মান-ব্রাসেল্‌স্ সংবাদপত্র') — ব্রাসেল্‌সে জার্মান দেশান্তরীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, ১৮৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে ১৮৪৮

সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৪৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে মার্কস ও এঙ্গেলস এর স্থায়ী কর্মী হন এবং তার সঠিক দিক নির্ধারণের ব্যাপারে সরাসরি প্রভাব ফেলেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের পরিচালনায় সংবাদপত্রটি কমিউনিস্ট লীগের মুখপত্রে পরিণত হয়। পৃঃ ৯৭

(৬৬) *New-York Daily Tribune* ('দৈনিক নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন')—প্রগতিশীল বুর্জোয়া সংবাদপত্র, প্রকাশিত হয় ১৮৪১ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। ১৮৫১ সালের আগস্ট থেকে ১৮৬২ সালের মার্চ পর্যন্ত এই সংবাদপত্রে লেখেন মার্কস ও এঙ্গেলস। পৃঃ ৯৭

(৬৭) আলোচ্য প্রবন্ধটি এঙ্গেলস লেখেন মার্কসের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে। এখানে তিনি ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে প্রলেতারীয় বিপ্লবীদের রণকৌশলের বিশেষত্বটির রূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। এঙ্গেলসের এই রচনাটি জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং তাদের ক্রিয়াকলাপের সঠিক রণকৌশলগত আচার-আচরণ সম্পর্কে অনেককিছু আমাদের দেখিয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, সাধারণ গণতান্ত্রিক কর্তব্যের সঙ্গে প্রলেতারীয় কর্তব্যের মিলন ঘটাতে হবে এবং সফলভাবে এ কাজ করা উচিত প্রলেতারীয় পার্টির। মার্কসের ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের রণকৌশলের দৃষ্টান্ত অনুসারে এঙ্গেলস জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের এই শিক্ষা দিয়েছেন: সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকার জন্য সংগ্রাম, প্রলেতারিয়েতদের শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষা করা, এ ব্যাপারে পেটি বুর্জোয়া হাতছানির কাছে মাথা নত করা চলবে না, এবং শাসক মহলের তরফ থেকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির সাহায্যে প্রলেতারিয়েতকে বোকা বানানোর প্রচেষ্টার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে হবে নির্মমভাবে। পৃঃ ৯৯

(৬৮) ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটে, যার ফলে লুই ফিলিপ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে। পৃঃ ১০১

(৬৯) *Kreuz-Zeitung* ('ক্রস সংবাদপত্র')—জার্মান দৈনিক সংবাদপত্র *Neue Preußische Zeitung* ('নতুন প্রুশীয় সংবাদপত্র')-এর এই নাম হয়েছিল এইজন্য যে, এর শিরোনামায় অঙ্কিত ছিল একটি ক্রসচিহ্ন। ১৮৪৮ সালের জুন থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত বার্লিন থেকে প্রকাশিত হয়; এটি ছিল প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত আর প্রুশীয় য়ুঙ্কারদের মুখপত্র। পৃঃ ১০৫

(৭০) প্রুশীয় সরকারের মন্ত্রীবর্গ সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে। ১৮৪৮ সালে মার্চ বিপ্লবের পরে এই সরকার ক্ষমতা পায়। উদারনৈতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর

হান্‌জেমান, কাম্প্‌হাউজেন এবং অন্যান্য নেতারা প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আপস করে বিশ্বাসঘাতক নীতি অনুসরণ করেন। পৃঃ ১০৫

(৭১) **ফ্রাংকফুর্ট পরিষদ**—জার্মানিতে মার্চ বিপ্লবের পর আহূত জাতীয় সভা; ১৮৪৮ সালের ১৮ মে ফ্রাংকফুর্ট অন মাইনে শুরু হয়েছিল এই 'সভার' অধিবেশন। জার্মানির রাজনৈতিক খণ্ড-বিখণ্ডতা ঘোচানো এবং নিখিল জার্মান সংবিধান রচনা করাই ছিল এই 'পরিষদের' প্রধান কর্তব্য। কিন্তু উদারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভীরুতা আর দোদুল্যমানতা এবং বামপন্থী বিভাগের দ্বিধা আর আত্মবিরোধের দরুন এই 'পরিষদ' দেশে সর্বোচ্চ ক্ষমতা হস্তগত করতে অপারগ হয় এবং ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের জার্মান বিপ্লবের প্রধান প্রধান প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট মতাবস্থান নিতে পারে না। ১৮৪৯ সালের ৩০ মে 'পরিষদকে' চলে যেতে হয়েছিল স্টুটগার্টে। ১৮৪৯ সালের ১৮ জুন সৈন্যদল সেটিকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল।

বার্লিন পরিষদ আহূত হয় ১৮৪৮ সালের মে মাসে বার্লিনে; তার উদ্দেশ্য ছিল 'রাজার সম্মতি অনুযায়ী' সংবিধান রচনা করা। নিজ ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি হিশেবে এই সূত্রটিকে গ্রহণ করে 'পরিষদ' জনগণের সার্বভৌমত্বের নীতিটিকে অগ্রাহ্য করে; রাজার নির্দেশানুসারে নভেম্বরে এটিকে স্থানান্তরিত করা হয় ব্রান্ডেনবার্গ শহরে; ১৮৪৮ সালের ডিসেম্বরে প্রাশিয়ায় সংঘটিত রাষ্ট্রীয় কু'দেতার সময় পরিষদটি ভেঙে যায়। পৃঃ ১০৫

(৭২) বুজারের 'Marat, l'Ami du Peuple' ('জনগণের বন্ধু মারাত') নামক গ্রন্থটি প্যারিসে প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে।

L'Ami du Peuple ('জনগণের বন্ধু') — এই সংবাদপত্রটি ১৭৮৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭৯৩ সালের ১৪ জুলাই পর্যন্ত প্রকাশ করেন জ. প. মারাত; এই নামে সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয় ১৭৮৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭৯২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত; সংবাদপত্রে এই স্বাক্ষর থাকত: Marat, l'Ami du Peuple. পৃঃ ১০৭

(৭৩) **১৮৪৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি**—ফ্রান্সে লুই ফিলিপ রাজতন্ত্র উৎখাতের দিন। ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিজয়ের সংবাদ শুনে রুশ জার প্রথম নিকোলাই ইউরোপে বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রস্তুতির জন্য রাশিয়ায় আংশিকভাবে সৈন্য সংযোজনার ব্যাপারে যুদ্ধমন্ত্রীকে নির্দেশ দেন। পৃঃ ১০৮

(৭৪) **জ্যাকোবিন** — ১৮শ শতাব্দীর শেষের দিক্‌কার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে একটি রাজনৈতিক উপদল; ফরাসী বুর্জোয়াদের বামপন্থী পক্ষের প্রতিনিধিরা, সামন্ততন্ত্র আর স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে এবং অবিচলিতভাবে সমর্থন করে। পৃঃ ১০৯

(৭৫) *Kölnische Zeitung* ('কলোনের সংবাদপত্র') — দৈনিক জার্মান সংবাদপত্র, এই নামে কলোনে প্রকাশিত হত ১৮০২ সাল থেকে; ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লব পর্যায়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেওয়া প্রতিক্রিয়ার কালে এটি প্রাশিয়ার লিবারেল বুর্জোয়াদের কাপুরুষতামূলক ও বিশ্বাসঘাতক রাজনীতির প্রতিভূ ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে এটি জাতীয়তাবাদী লিবারেল পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিল। পৃঃ ১১০

(৭৬) **১৮৪৯ সালের ১৩ জুন** — ইতালিতে বিপ্লব দমন করার উদ্দেশ্যে ফরাসী সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য এই দিন প্যারিসে পেটি-বুর্জোয়া পার্টি 'পর্বত' এক শান্তিপূর্ণ মিছিলের আয়োজন করে। সেনাদল মিছিলটিকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। 'পর্বত'-এর বহু নেতা গ্রেপ্তার ও নির্বাসিত হন অথবা ফ্রান্স থেকে দেশান্তরে যেতে বাধ্য হন। পৃঃ ১১০

(৭৭) ভিলিখের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাধারণ সেনা হিশেবে ১৮৪৯ সালে এঙ্গেলস বাডেন-পেলটনেট অভ্যুত্থানে অংশ নেন। পৃঃ ১১০

(৭৮) মার্কসের 'কলোন কমিউনিস্ট মামলার স্বরূপপ্রকাশ' পুস্তিকার জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধ হিশেবে ১৮৮৫ সালে এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট লীগের ইতিহাস প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি রচনা করেন। জার্মানিতে যে বছরগুলিতে জরুরী আইন বলবৎ ছিল, সেসময়ে সেখানকার শ্রমিক শ্রেণীর কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি ছিল ১৮৪৯-১৮৫২ সালের প্রতিক্রিয়ার পর্যায়ের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা পুরোপুরি মনে রাখা। ঠিক এই কারণে মার্কসের এই পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এঙ্গেলস।

'কমিউনিস্ট লীগের ইতিহাস প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটিতে এঙ্গেলস আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন বিকাশে প্রলেতারিয়েতের প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠনের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও তার অর্থের রূপ উদ্ঘাটন করেন, সেই প্রথম নিজ ভাবাদর্শমূলক পতাকা বলে সেই সংগঠন বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের কর্মসূচি ঘোষণা করে। প্রলেতারীয় পার্টি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট লীগ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; ঠিক এই লীগের ইতিহাসের দৃষ্টান্তের সাহায্যেই এঙ্গেলস দেখান যে, সংকীর্ণতাবাদী বিভিন্ন ধারার বিরুদ্ধে মার্কসবাদের বিজয়লাভ সম্ভব হয় এই কারণে যে, জন্মলগ্ন থেকেই এই তত্ত্বটি প্রলেতারিয়েতের ব্যবহারিক বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাকে পুরোপুরিভাবে প্রতিফলিত করে এবং সে তত্ত্ব তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পৃঃ ১১১

(৭৯) এখানে কলোনের প্ররোচনামূলক বিচারের কথা বলা হচ্ছে; কমিউনিস্ট লীগের ১১ জন সদস্যের বিরুদ্ধে প্রুশীয় সরকার কর্তৃক এ মামলাটি খাড়া করা

হয়েছিল (১৮৫২ সালের ৪ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত)। ঝুটা দলিল ও মিথ্যার ভিত্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ তোলা হয়েছিল। বিচারে তাঁদের মধ্যে সাত জনের ৩ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়। পৃঃ ১১১

(৮০) **বাব্যেফবাদ**—ইউটোপীয় ঢালাও সমতাবাদী কমিউনিজমের অন্যতম ধারা; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসী বিপ্লবী গ্রাক্‌স বাব্যেফ ও তাঁর সমর্থকদের দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃঃ ১১২

(৮১) Société des Saisons ('ঋতু সমিতি')—রিপাবলিকান সোশ্যালিস্টদের চক্রান্তকারী গুপ্ত সংগঠন, অ. ব্লাঙ্কি ও আ. বার্বে-র নেতৃত্বে ১৮৩৭ সাল থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত প্যারিসে এটি সক্রিয় ছিল।

১৮৩৯ সালে ১২ মে অভ্যুত্থান—এটি ঘটে প্যারিসে; এতে প্রধান ভূমিকা পালন করে বিপ্লবী শ্রমিকরা। সংগঠিত করে 'ঋতু সমিতি'। অভ্যুত্থানটির পেছনে বিপুল জনগণের সমর্থন ছিল না, ফলে রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী ও জাতীয় রক্ষীবাহিনী কর্তৃক তা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পৃঃ ১১৩

(৮২) এখানে জার্মানিতে চক্রান্তের বিরুদ্ধে জার্মান ডেমোক্রাটদের সংগ্রামের একটি অধ্যায়ের কথা বলা হচ্ছে; এটি ফ্রাঙ্কফুর্টের হত্যাকাণ্ড নামে অভিহিত হয়। ১৮৩৩ সালের ৩ এপ্রিল র‍্যাডিকেল অংশের একটি দল জার্মান লীগের কেন্দ্রীয় সংগঠন তথা ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইন শহরের সেইম লীগের বিরুদ্ধাচারণ করে দেশে কু'দেতা ঘটানোর চেষ্টা চালায় এবং জার্মানিকে তারা অখণ্ড প্রজাতন্ত্র হিশেবে ঘোষণা করে; ভালভাবে প্রস্তুত না থাকার জন্য সেনাদল এ অভ্যুত্থানকে চূর্ণ করে দেয়। পৃঃ ১১৩

(৮৩) ১৮৩১ সালে ইতালির বুর্জোয়া ডেমোক্রাট মাৎসিনি 'তরুণ ইতালি' নামে এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি এই সমাজের সদস্য, এবং তৎসহ সুইজারল্যাণ্ডের একদল বিদেশী বিপ্লবী দেশান্তরীর সহায়তায় স্যাভয় অভিমুখে এক অভিযানের আয়োজন করেন; এর লক্ষ্য ছিল ইতালিকে সংঘবদ্ধ করার জন্য এবং স্বাধীন এক বুর্জোয়া ইতালীয় প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য সেখানে জনবিদ্রোহ সংঘটিত করা। স্যাভয়ে এই দলটিকে পদদলিত করে পিয়েমোঁ-র সেনাবাহিনী। পৃঃ ১১৩

(৮৪) **'ডেমাগগ'** (demagogue) হিশেবে জার্মানিতে ১৮১৯ সাল থেকে জার্মান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধী-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের একটি অংশকে অভিহিত করা হত; এরা জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল কাঠামোর

বিরুদ্ধাচারণ করত এবং দাবি জানাত সংঘবদ্ধ এক জার্মানি গড়ে তোলার। জার্মান রাজ 'ডেমাগগদের' গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখত। পৃঃ ১১৩

(৮৫) এখানে লণ্ডনস্থ **জার্মান শ্রমিকদের শিক্ষা-সমিতির** কথা বলা হচ্ছে; উনিশ শতাব্দীর ৫০-এর বছরগুলিতে এটি গ্রেট উইণ্ডমিল স্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। ১৮৪০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক. শাপার, জ. মল্ ও ন্যায়নিষ্ঠদের লীগের অন্যান্য সদস্যরা এই সমাজটির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৯-১৮৫০ সালে এতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন মার্ক্স ও এঙ্গেলস। ১৮৫০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর মার্ক্স ও এঙ্গেলস এবং তাঁদের বহু সমর্থক এ সমাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন; এর কারণ হল এই যে, এর অধিকাংশ সদস্য ভিলিখ-শাপারের সাম্প্রদায়িক-হঠকারী অংশের পক্ষ নেন। ১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজ লণ্ডনে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির জার্মান শাখায় পরিণত হয়। লণ্ডনস্থ শিক্ষা-সমিতি টিকে ছিল ১৯১৮ সাল পর্যন্ত; সে বছরে ব্রিটিশ সরকার এটিকে বন্ধ করে দেয়। পৃঃ ১১৪

(৮৬) *Deutsch-Französische Jahrbücher* ('জার্মান-ফরাসী বার্ষিকী') — এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হত প্যারিস থেকে জার্মান ভাষায়, ক. মার্ক্স এবং আ. রুগে এর সম্পাদনা করতেন। ১৮৪৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এর শুধু প্রথম, ডবল সংখ্যাটিই প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাবার প্রধান কারণ হল মার্ক্স এবং বুর্জোয়া র‍্যাডিকাল রুগে-র মধ্যে মৌলিক মতবিরোধ। পৃঃ ১১৮

(৮৭) **জার্মান শ্রমিক সমিতি** — ১৮৪৭ সালে আগস্ট মাসের শেষের দিকে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস এটি প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাসেল্সে; বেলজিয়মবাসী জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রসার ঘটানো এবং বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ভাবধারা প্রচার করা ছিল এর উদ্দেশ্য। মার্ক্স, এঙ্গেলস আর তাঁদের সহকর্মীদের নেতৃত্বে এই সমিতি বেলজিয়মবাসী জার্মান বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতদের সংঘবদ্ধ করার এক আইনসঙ্গত কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সমিতির সর্বশ্রেষ্ঠ সদস্যরা কমিউনিস্ট লীগের ব্রাসেল্স্ শাখারও সদস্য ছিলেন। ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া বিপ্লবের স্বল্পকাল পরেই ব্রাসেল্সে জার্মান শ্রমিক সমিতির ক্রিয়াকলাপ শেষ হয়ে যায়, কেননা সমিতির সদস্যদের গ্রেপ্তার এবং নির্বাসিত করেছিল বেলজিয়মের পুলিশ। পৃঃ ১২০

(৮৮) *The Northern Star* ('উত্তরের নক্ষত্র') — সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা, চার্টিস্টদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৭ সালে; প্রকাশিত হয় ১৮৫২ সাল পর্যন্ত, প্রথমে লিড্স-এ এবং ১৮৪৪ সালের নভেম্বর থেকে

লণ্ডনে। ১৮৪৩ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকায় এঙ্গেলসের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১২০

(৮৯) **গণতান্ত্রিক সমিতি** — ১৮৪৭ সালের শরতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রাসেল্‌সে, সাধারণ সদস্য হিশেবে সংঘবদ্ধ করেছিল বিপ্লবী প্রলেতারীয়দের, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল দেশান্তরী জার্মান বিপ্লবীরা, এবং বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া ডেমোক্রাসির অগ্রণী কর্মীরা, এই সমিতি প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশ নেন মার্কস ও এঙ্গেলস। ১৮৪৭ সালের ১৫ নভেম্বর মার্কস তার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন, সভাপতি মনোনীত হন বেলজিয়মের গণতন্ত্রী ল. জোত্‌রাঁ। মার্কসের ক্রিয়াকলাপের কল্যাণে ব্রাসেল্‌সের গণতান্ত্রিক সমিতিটি আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম বৃহৎ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৪৮ সালে মার্চ মাসের গোড়ায় ব্রাসেল্‌স্ থেকে মার্কসের নির্বাসনের পর এবং সমিতির বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মীদের উপর বেলজিয়ম সরকারের নির্যাতনের ফলে এ সমিতির কার্যকলাপ অতি ক্ষীণ রূপ ধারণ করে, তা একেবারে প্রায় আঞ্চলিক রূপ নেয় এবং ১৮৪৯ সালে প্রকৃতপক্ষে তা বন্ধ হয়ে যায়। পৃঃ ১২০

(৯০) *La Réforme* ('সংস্কার') — ফরাসী দৈনিক, পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী আর পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীদের মুখপত্র; প্যারিসে ১৮৪৩ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৪৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৪৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এঙ্গেলস এতে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পৃঃ ১২০

(৯১) *Der Volks-Tribun* ('জন ট্রিবিউন') — সাপ্তাহিক পত্রিকা, 'সাচ্চা সমাজতন্ত্রীদের' দ্বারা নিউ ইয়র্কে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৮৪৬ সালের ৫ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১২১

(৯২) **'জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির দাবি'** — ১৮৪৮ সালের ২১ ও ২৯ মার্চের মধ্যে প্যারিসে এটি লিখিত হয় মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক। এটি ছিল জার্মানিতে বিপ্লব সূচিত করার জন্য কমিউনিস্ট লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচিস্বরূপ। হ্যান্ডবিল হিশেবে ছাপিয়ে নির্দেশমূলক দলিল রূপে এটি বিতরণ করা হত মাতৃভূমিতে ফিরে-আসা কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের মধ্যে। বিপ্লবের সময় মার্কস, এঙ্গেলস ও তাঁদের সমর্থকরা কর্মসূচি রূপ এই দলিলটি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের প্রচেষ্টা করেন। পৃঃ ১২৫

(৯৩) এখানে কমিউনিস্ট লীগের উদ্যোগে ১৮৪৮ সালের ৮-৯ মার্চ প্যারিসে গঠিত জার্মান শ্রমিকদের ক্লাবের কথা বলা হচ্ছে। এ সমিতির নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন

স্বয়ং মার্কস। এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল প্যারিসে দেশান্তরী জার্মান শ্রমিকদের এক করা এবং বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারীয় রণকৌশল তাদের কাছে ব্যাখ্যা করা। পৃঃ ১২৭

(১৪) এখানে ১৮৪৯ সালের **৩-৮ মে মাসের ড্রেসডেন সশস্ত্র** অভ্যুত্থান ও মে-জুলাই মাসের **দক্ষিণ আর পশ্চিম জার্মানির** অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে; এটি সংঘটিত হয়েছিল রাজতন্ত্রী সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য। এ সংবিধানটি গৃহীত হয়েছিল ১৮৪৯ সালের ২৮ মার্চ ফ্রাঙ্কফুর্টের জাতীয় সভা কর্তৃক, তবে জার্মানির বহু সরকারই তা মানতে অস্বীকার করে। এ অভ্যুত্থানের চরিত্র ছিল বিচ্ছিন্ন আর স্বতঃস্ফূর্ত এবং এটিকে ছত্রভঙ্গ করা হয় ১৮৪৯ সালের জুলাইয়ের মাঝামাঝি। পৃঃ ১২৯

(১৫) *Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue* ('নতুন রাইন পত্রিকা। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষা')—মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি পত্রিকা, কমিউনিস্ট লীগের তাত্ত্বিক মুখপত্র। প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৫০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত; বেরিয়েছিল মোট ছ'টি সংখ্যা। পৃঃ ১৩২

(১৬) **আমেরিকান গৃহযুদ্ধ** (১৮৬১-১৮৬৫)—এটি ঘটে উত্তরের শিল্পপ্রধান প্রদেশগুলি আর দক্ষিণের দাসপ্রধান প্রদেশগুলির অভ্যুত্থানকারীদের মধ্যে। শেষোক্তরা সেখানে দাসপ্রথা রক্ষা করার চেষ্টা করছিল এবং ১৮৬১ সালে তারা উত্তরের প্রদেশগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই যুদ্ধটি ছিল দুই সমাজব্যবস্থা তথা দাসপ্রথা ও মজুরি-শ্রমব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের ফল। পৃঃ ১৩৩

(১৭) **জোন্ডেরবুন্ড** (স্বতন্ত্র ইউনিয়ন) — ১৯শ শতকের পঞ্চম দশকে সুইজারল্যান্ডের প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক ক্যান্টনদের স্বতন্ত্র সংগঠনে যেমন ঘটেছিল, সেই ঘটনার সঙ্গে মিল দেখে ভিল্লিখ আর শাপারের সংকীর্ণতাবাদী-হঠকারী উপদলকে বিদ্রূপ করে এই নাম দিয়েছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস; ১৮৫০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কমিউনিস্ট লীগের ভেঙে যাওয়ার পর এ উপদলটি তার নিজস্ব কেন্দ্রীয় কমিটি সহ স্বতন্ত্র এক সংগঠন রূপে গড়ে ওঠে। নিজ ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে এই উপদলটি প্রাশিয়ার পুলিশকে জার্মানির কমিউনিস্ট লীগের অবৈধ সংস্থাটি খুঁজে বের করতে সাহায্য করে এবং কমিউনিস্ট লীগের বিশিষ্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে ১৮৫২ সালে কলোন কমিউনিস্ট মামলাটি সাজিয়ে তোলার বাহানা দেয় (৭৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১৩৩

(৯৮) ফ. এঙ্গেলসের **'ল্যুডভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান'** নামক পুস্তকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভাবন প্রক্রিয়া ও তার মূলকথার রূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে; দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল ভিত্তির প্রণালীবদ্ধ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, এবং তৎসহ মার্কসবাদের সঙ্গে দর্শনের ক্ষেত্রে এর পূর্বসূরীদের সম্পর্কের রূপ উন্মোচন করা হয়েছে। এই পূর্বসূরীদের মধ্যে আছেন হেগেলীয় ও ফয়েরবাখীয় চিরায়ত জার্মান দর্শনের অতি বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ।

আলোচ্য রচনায় এঙ্গেলস দর্শনের ইতিহাসের অস্তিত্বের সমগ্র পর্বের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বের, দুই শিবির তথা বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংগ্রামের চিত্র উন্মোচন করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম এখানে সমগ্র দর্শনের মূল প্রশ্নটির ধ্রুপদী সংজ্ঞা দেন: প্রশ্নটি হল চিন্তার সঙ্গে সত্তার আর আত্মার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কজনিত। এ প্রশ্নের যিনি যেমন উত্তর দিয়েছেন সেই অনুসারে দার্শনিকরা দুটি বৃহৎ শিবিরে বিভক্ত হয়েছেন।

বস্তুবাদ এবং ভাববাদের মধ্যে সন্ধি ঘটাবার প্রয়োজনে অন্তর্বর্তীমূলক দর্শন (দ্বৈতবাদ, অজ্ঞেয়বাদ) সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে এঙ্গেলস জোর গলায় অযৌক্তিক বলে ঘোষণা করেন। অজ্ঞেয়বাদের যে কোনো রূপকেই তিনি অগ্রাহ্য করেন এবং দেখান যে, 'অন্যান্য দার্শনিক উদ্ভটত্বের মতোই এ কথারও চূড়ান্ত খণ্ডন হল প্রয়োগ, অর্থাৎ পরীক্ষা ও শিল্পোৎপাদন' (বর্তমান সংস্করণের ১৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সৃষ্টির ফলে দর্শনের ক্ষেত্রে মার্কস যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছেন এঙ্গেলস এখানে তারই মর্মরূপ উন্মোচন করেছেন। তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রকৃত অর্থটি আমাদের সামনে পুরোপুরি তুলে ধরেছেন, যে বস্তুবাদ মানব-সমাজ বিকাশের সাধারণ নিয়ম-কানুনগুলি আবিষ্কার করেছে। সমস্ত প্রকার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, যা রাজনৈতিক গঠন এবং ধর্ম ও দর্শন সহ সামাজিক চৈতন্যের সমস্ত প্রকার রূপভেদের চরিত্র নির্ধারণ করে — এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করে এঙ্গেলস একই সময়ে ভাবাদর্শমূলক উপরি-কাঠামোর সক্রিয় ভূমিকা, এই কাঠামোর স্বাধীনভাবে বিকাশের ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর তার উল্টো প্রভাবের ব্যাপারেও জোর দিয়ে বলেছেন।

এ ব্যাপারে এঙ্গেলসের সবচেয়ে বড়ো অবদান হল এই যে, পার্টি ও শ্রেণী-সংগ্রাম প্রতিফলনকারী বিভিন্ন দার্শনিক ধারার মধ্যেকার সংগ্রামের সমগ্র ইতিহাসের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে পার্টির দর্শনের মূলনীতি তিনি গড়ে তুলেছেন। পৃঃ ১৩৬

(৯৯) **'ঝড়-ঝাপটা'** — ১৮শ শতকের ৮ম-৯ম দশকের জার্মান বার্গারদের সাহিত্যিক আর সামাজিক আন্দোলন। এই আন্দোলনটি ছিল সামন্ত-স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জার্মানির নবীন লেখকদের একটি স্বকীয় সাহিত্যিক বিদ্রোহ। পৃঃ ১৩৭

(১০০) *Die Neue Zeit* ('নব কাল') — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা; স্টুটগার্টে ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫-১৮৯৪ সালে এঙ্গেলস এতে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পৃঃ ১৩৭

(১০১) ১৮৩৩-১৮৩৪ সালে জার্মানিতে হাইনে তাঁর দুটি গ্রন্থ — 'রোমান্টিক স্কুল' ও 'জার্মানিতে ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাস চর্চা প্রসঙ্গে' — প্রকাশ করেন। পৃঃ ১৪০

(১০২) **পিয়েটিজম** (ল্যাটিন শব্দ pietas — আধ্যাত্মিক ধার্মিকতা) — ১৭শ শতকের শেষে পশ্চিম ইউরোপের প্রটেস্টান্টদের (লুথারপন্থী আর কালভাঁপন্থী) মাঝে উদ্ভূত ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদী একটি মতধারা। পৃঃ ১৪৬

(১০৩) **তরুণ হেগেলপন্থী** — হেগেলের শিক্ষা থেকে উনিশ শতকের চতুর্থ এবং পঞ্চম দশকে উদ্ভূত জার্মান দর্শনের ক্ষেত্রে একটা ভাববাদী মতধারা। পৃঃ ১৪৬

(১০৪) *Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst* ('বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক জার্মান বর্ষপঞ্জি') — তরুণ হেগেলপন্থীদের সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ক পত্রিকা, এই নামে লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত হত ১৮৪১ সালের জুলাই থেকে ১৮৪৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত। পৃঃ ১৪৭

(১০৫) এখানে ১৮৪৫ সালে লাইপজিগে প্রকাশিত ম. স্টির্নারের 'অদ্বিতীয় এবং তার সম্পত্তি' নামক গ্রন্থের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৪৭

(১০৬) **একেশ্বরবাদ** — ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্যতম ধারা, যার মূলে রয়েছে এক এবং একক ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস। এর বিপরীত ধারাটি হল বহু ঈশ্বরবাদ। পৃঃ ১৫০

(১০৭) এখানে ১৮৪৬ সালে জার্মান জ্যোতির্বিদ ই. হাল্লে কর্তৃক আবিষ্কৃত নেপচুন গ্রহের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৫৩

(১০৮) ৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১০৯) **সর্বভূতেশ্বরবাদ** (Pantheism) — ধর্মীয়-দার্শনিক শিক্ষা, যাতে ঈশ্বর ও বিশ্বকে এক ও অখণ্ড রূপে দেখা হয়েছে। পৃঃ ১৫৩

(১১০) **ফ্লজিস্টিক তত্ত্ব** — ১৮শ শতকে রসায়নবিদ্যায় বহুলপ্রচারিত একটি তত্ত্ব, যা অনুসারে দহনপ্রক্রিয়া বস্তুতে নিহিত বিশেষ পদার্থ ফ্লজিস্টনের উপর নির্ভর

করে; এই পদার্থ দহনপ্রক্রিয়ার সময় দেহ থেকে নিঃসৃত হয়। বিখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ আ. ল. লাভুয়াজিয়ে এই তত্ত্বের অমূলকতা প্রমাণ করেন। তিনি দহনপ্রক্রিয়ার যথার্থ ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে দহনপ্রক্রিয়ার মূলে আছে দহনীয় বস্তুর সঙ্গে অক্সিজেনের মিলন। পৃঃ ১৫৫

(১১১) এখানে কান্টের 'নেবুলা প্রকল্পের' কথা বলা হচ্ছে। এই প্রকল্প অনুসারে সৌরজগতের উৎপত্তি কুয়াশা থেকে (ল্যাটিন nebula — কুয়াশা)। পৃঃ ১৫৫

(১১২) ১৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১১৩) এখানে 'ধরা-ছোঁয়ার-বাইরের এক বস্তুর' আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে [illegible] প্রচেষ্টার কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৬৩

(১১৪) সাদোভা শহরের নিকটে প্রাশিয়ার জয়লাভের পর (১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রাশিয়ার যুদ্ধে) জার্মান বুর্জোয়া পত্রপত্রিকার জগতে এ নামটি এক অতি প্রচলিত কথায় পরিণত হয়েছিল; এর অর্থ ছিল এই যে, প্রাশিয়ার যথার্থ জনশিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণেই বুঝি-বা প্রাশিয়ার জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। পৃঃ ১৬৮

(১১৫) এখানে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর ১৮১৫ সালের ২০ নভেম্বরের স্বাক্ষরিত প্যারিস শান্তি চুক্তির কথা বলা হচ্ছে। স্বাক্ষরকারীদের একদিকে ছিল ফরাসী-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট তথা ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া, আর অন্যদিকে ছিল ফ্রান্স। পৃঃ ১৮০

(১১৬) **পুনঃপ্রতিষ্ঠা পর্ব** — ১৮১৪-১৮৩০ সালে ফ্রান্সে বুরবোঁ বংশের দ্বিতীয় বারের রাজত্বের কালপর্যায়, অভিজাতবর্গ এবং যাজকমণ্ডলীর স্বার্থের সমর্থক এই প্রতিক্রিয়াশীল বুরবোঁ রাজত্ব উচ্ছেদ হয়েছিল ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবে। পৃঃ ১৮০

(১১৭) **নিকাই সম্মেলন** — এশিয়া মাইনরের নিকাই শহরে ৩২৫ সালে সম্রাট প্রথম কনস্টানটাইন দ্বারা আহূত রোমক সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টান চার্চের বিশপদের প্রথম বিশ্ব সম্মেলন; এই সম্মেলন সমস্ত খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য বাধ্যতামূলক তথাকথিত এক 'বিশ্বাস-প্রতীক' নির্ধারণ করে। পৃঃ ১৮৬

(১১৮) **আলবিগে'সরা** (আল্‌বি শহরের নাম থেকে) — ১২শ আর ১৩শ শতকে দক্ষিণ ফ্রান্স আর উত্তর ইতালির শহরগুলিতে বহুবিস্তৃত ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। আলবিগে'সরা ক্যাথলিক চার্চের জাঁকজমকের আচার-অনুষ্ঠান এবং চক্রতন্ত্রের

বিরোধিতা করত, আর সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে শহরগুলির ব্যাপারী ও হস্তশিল্পীদের প্রতিবাদ প্রকাশ করত ধর্মীয় রূপে। পৃঃ ১৮৬

(১১৯) এখানে ব্রিটেনের 'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবের' কথা বলা হচ্ছে। ২০ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৮৮

(১২০) ১৭শ শতকের ৩য় দশক থেকে বৃদ্ধি পাওয়া প্রটেস্টান্ট-কালভাঁপন্থীদের (হুগেনটদের) রাজনীতিক আর ধর্মীয় উৎপীড়নের পরিস্থিতিতে ১৬৮৫ সালে চতুর্দশ লুই ১৫৯৮ সালে নান্ত্-এ ঘোষিত অনুশাসন (এডিক্ট) বাতিল করেন, যার ফলে প্রটেস্টান্ট-কালভাঁপন্থীরা ধর্মবিশ্বাস আর ঈশ্বর-সেবার স্বাধীনতা পায়; এই নান্ত্ অনুশাসন বাতিলের পর কয়েক লক্ষ কালভাঁপন্থী ফ্রান্স থেকে দেশান্তরী হয়। পৃঃ ১৮৮

(১২১) এই সংজ্ঞার মাধ্যমে আমরা ১৮৭১ সালে কর্তৃত্ববাদী প্রাশিয়ার ছত্রছায়ার উদ্ভূত জার্মান সাম্রাজ্যের (অস্ট্রিয়া বাদে) কথা বুঝি। পৃঃ ১৮৯

(১২২) **'নাইটস অব লেবার'**— আমেরিকান শ্রমিকদের সংগঠন, ১৮৬৯ সালে ফিলাডেলফিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত এটি ছিল এক গুপ্ত সমিতি। এই সংগঠনটি প্রধানত অশিক্ষিত মজুরদের একত্রিত করত, যাদের মধ্যে নিগ্রোরাও ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল সমবায়-সমিতি আর পারস্পরিক সহায়তা-সংস্থা গড়ে তোলা। রাজনৈতিক সংগ্রামে শ্রমিকদের ভাগ নেওয়াকে এ সমিতি প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করে এবং শ্রেণী-সহযোগিতার অবস্থান নেয়। ১৮৮৬ সালে এর সদস্যদের সর্বাত্মক ধর্মঘটে ভাগ নিতে না দিয়ে এ সমিতির নেতারা ধর্মঘট-বিরোধী অবস্থান নেয়; তা সত্ত্বেও সাধারণ সদস্যরা কিন্তু এতে যোগ দিয়েছিল; এরপর শ্রমিকদের বিপুল অংশের মধ্যে এ সমিতি নিজ প্রভাব হারাতে থাকে এবং ৯০-এর বছরগুলির শেষে এটি ভেঙে যায়।

পৃঃ ১৯১

নামের সূচি

ট

ড

ত

দ

ভ

র

শ

দুনিয়ার মজদুর এক হও!